আলেয়ার আলো

জেমস হেডলী চেস্

বঙ্গানুবাদঃ
জয়ন্ত চৌধুরী

ব্লু-বেল পাবলিশার্স
১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা-২৬

প্রথম বাংলা সংস্করণ :
কার্তিক, ১৩৭২

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীমতী দেবযানী লাহিড়ী
ব্লু-বেল পাবলিশার্স
১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা-২৬

মুদ্রক :
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস,
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৪

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ :
ইম্প্রেশন্ হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট : পরমভট্টারক লাহিড়ী

আলেয়ার আলো

জেমস হেডলী চেস্ এর অন্যান্য বই—

মৃত্যুতিমির : বিষণ্ণ নিষাদ

বিপন্ন নায়ক : একদা শারদ প্রভাতে

ছায়া ছায়া ছবি : স্বর্ণতৃষা

নিশিসঙ্গিনী

১

সার্জেণ্ট বেগ্লার-এর টেবিলের টেলিফোনটা যখন বাজল, দেওয়াল-ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে তিনটে।

বয়স তিরিশের কোঠায়, বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা। মুখ কেঁচকে একবার টেলিফোনটার দিকে তাকালে, দেওয়াল-ঘড়িটা দেখলে, তারপর বিরাট রোমশ হাতের থাবাটা রিসিভারের ওপর খপ করে বসিয়ে, ফোনটা ঘটাং করে তুলে নিয়ে বলে উঠল, 'বেগ্লার। কী চাই?'

ডেস্ক-সার্জেণ্টের গলা শোনা গেল, 'হ্যারি ব্রাউনিং ফোন করছে। তোমাকে চায়। মনে হচ্ছে, খচে ব্যোম।'

বিরক্তিতে আরও কুঁচকে উঠল মুখটা। হ্যারি ব্রাউনিং হলো লা কোকুইল রেস্টুরেণ্টের মালিক—প্যারাডাইস সিটিতে বড় রেস্টুরেণ্ট বলতে তিনটি, তারই একটা লা কোকুইল। হ্যারি আবার মেয়র আর পুলিশ-চীফ, ক্যাপ্টেন টেরেল-এর দোস্ত। তার মানে, বেগ্লার-এর মতো কর্মচারীর পক্ষে তোয়াজ করা ছাড়া উপায় নেই।

'শোনা যাক কী বলেন। লাইনটা দিয়েই দাও, চার্লি।' হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিতে গেল বেগ্লার। টেবিলের ওপর প্যাকেটটা খালি, করুণচোখে সেটা লক্ষ্য করলে। শেষবার কফি খেয়েছে, তাও আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে। 'হ্যাঁ, কাউকে দিয়ে একটু কফি আনাও, চার্লি। শুকনো শুকনো লাগছে।'

'বেশ'। ডেস্ক-সার্জেন্ট চার্লির গলায় পরিপাটি একটা জো-হুকুম ভাব। বেগ্‌লার-এর জন্যে দেখ-না-দেখ কাউকে-না-কাউকে কফি আনতে পাঠাইতেই হয়।

'নাও। ব্রাউনিং-এর সঙ্গে কথা বল।'

লাইনে একটা ক্লিক শব্দ উঠল, তার পরেই একটা ভারি গলার আওয়াজ, 'বেগ্‌লার না কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মিঃ ব্রাউনিং। কী দরকার বলুন।'

'যাচ্ছেতাই কাণ্ড! আমার রেস্টুরেন্টে একটা মেয়ে মরে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি চলে এস দিকিনি, লাশটাকে বিদেয় কর। শোন, বেগলার, তোমার কাছে ব্যাপারটা হয়তো নিয়ম-মাফিক পুলিশি-কর্তব্য, কিন্তু আমার পক্ষে ভীষণ গুরুতর কাণ্ড। কোনও রকম লোক-জানাজানি হোক, তা চাই না। আর আমি যখন বলি, লোক-জানাজানি চাই না, তখন তার প্রত্যেকটি কথার মানে পরিষ্কার। কী বলছি, বুঝেছ? কাগজওয়ালারা যদি টের পায়, তাহলে কোনও একজনের পিঠের ছাল আমি তুলে নেব। আর, আমি যখন বলি পিঠের ছাল তুলে নেব, তার প্রত্যেকটি কথার মানে পরিষ্কার, পিঠের ছাল তুলে নেবই। বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

বেগ্‌লার-এর শিরদাঁড়া একেবারে সোজা হয়ে গেছে, টান-টান হয়ে বসে রয়েছে চেয়ারে। বিরাট আলো-আঁধারি ঘরের ভিতরকার গুমোট গরমটা যেন গায়েই লাগছে না।

'ঠিক আছে, মিঃ ব্রাউনিং। কিছু ভাববেন না। আমি এই এলুম বলে।'

'ব্যাপারটা যাতে ঠিকমতো সামলানো হয়, সেইটাই

আমার একমাত্র ভাবনা। যদি ঠিকমতো সামলাতে পার বেগ্‌লার, তাহলেই কেবল আমার ভাবনা ঘোচে···তোমারও।' লাইন কেটে দিল ব্রাউনিং।

বেগ্‌লার ঠোঁট ওল্টালে, তারপর টেলিফোনের মাথায় টোকা মারলে। ডেস্ক-সার্জেন্ট চার্লির সাড়া পেতে বললে, 'নিচে কাগজের কোনও রিপোর্টার আছে কি, চার্লি ?'

'"সান" কাগজের হ্যামিল্টন আছে। ঘুমচ্ছে···আধ মাতাল। কেন ? ব্যাপার কী ?'

'ঠিক জানি না, তবে ব্যাপার একটা আছে তো বটেই। শোন, চার্লি, আমায় বেরুতে হবে। হ্যামিল্টন যদি জিগ্যেস করে কোথায় গেছি, বোল দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছিল, বাড়ি গেছি। ডিউটিতে কে ?'

একটু উৎকণ্ঠা নিয়েই চার্লি ট্যানার প্রশ্ন করল, 'দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছে নাকি ? আহা, দেখ দিকিনি···আমি···'

বেগ্‌লার বলে উঠল, 'থাক, দরদ দেখাতে হবে না। ডিউটিতে কে আছে ?'

'ম্যানড্রেক গেছে তোমার কফি আনতে।' চার্লির গলায় ক্ষুণ্নতার আভাস। 'জ্যাকসন রয়েছে এখানে, বসে-বসে পাছায় শেকড় গজাচ্ছে আর কি !'

'ওপরে পাঠিয়ে দাও, আমার জায়গায় বসুক। হেস্ আছে এখনও ?'

'এই গেল বলে।'

'আটকাও। বল, আমার জন্যে যেন দাঁড়ায়। এক্ষুনি নিচে যাচ্ছি।'

হাঁচড়-পাচড় করে কোটটা গায়ে চড়ালে বেগ্‌লার, প্যাণ্টের পিছন দিকটায় চাপড় মেরে যাচাই করে নিলে যে, বন্দুকটা আছে। তারপর এক প্যাকেট সিগারেট বার করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

নিচের ঘরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ফ্রেড হেস, হোমিসাইড, অর্থাৎ হত্যা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ-কর্মচারী। গোলগাল মুখে তার নাচার-নাচার ভাব।

বেগ্‌লার কাছে আসতেই বলে উঠল, 'আর দুটো মিনিট, তার পরেই এই শালার মুর্গির খাঁচা থেকে উধাও হতুম। তা, ব্যাপার কী?'

কোনও কথা না-বলে বেগ্‌লার সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে পুলিশের গাড়ির কাছে গেল। চড়ে বসে স্টার্ট দিলে। হেস গুঁড়ি মেরে তার পাশে উঠে বসল।

'লা কোকুইল-এ একটি মহিলা মরে পড়ে আছে। ব্রাউনিং-এর অবস্থা মারাত্মক।' জনহীন মেন স্ট্রীট বরাবর গাড়ি হাঁকালে বেগ্‌লার।

হেস ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল। 'খুন?'

'কিছু বলেনি। জিগ্যেস করিনি। গিয়ে পৌঁছে দেখা যাবে। যা মেজাজ, জিগ্যেস করব কী!'

হো-হো করে হেসে উঠল হেস। 'ওরে ব্বাবা! লা কোকুইল-এ লাশ! ওখানকার ব্যাপার-স্যাপার যতটুকু জানি, ওখানে লাশ থাকা মানে সব্বনাশ ব্যাপার। ভেতরে ঢুকেছ কখনও?'

'এই মাইনের রেস্ত নিয়ে?' বেগ্‌লার এখন প্রমিনেড দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। সমুদ্রের বালুবেলার ধারে খুব সামান্য কয়েকখানি গাড়ি দাঁড়িয়ে। রাস্তায় কোনও গাড়ি চলছে না। 'সামলে-সুমলে চলতে হবে, ফ্রেড। এ শহরে ব্রাউনিং-এর ভীষণ প্রতিপত্তি।'

'যদি খুন হয়, ব্রাউনিং-এর যত প্রতিপত্তিই থাকুক, চাপা যাবে না। খবর বেরুবেই।'

'তা বটে···তবে খুন যে, তা তো এখনও বলা যাচ্ছে না। আমাকেই সামলাতে দাও। অনেক রাঘব-বোয়াল ব্রাউনিং-এর বন্ধু।'

'নাও, ভাই, সবটাই তোমার ভাগে দিয়ে দিচ্ছি।'

প্রমিনেড-এর একেবারে শেষপ্রান্তে লা কোকুইল রেস্টুরেণ্ট। চারিদিকে সবুজ ঘাসের বাগান, ফুলের কেয়ারি আর আলোয় উদ্ভাসিত পাম গাছের সারি। তিন ধাপ শ্বেত পাথরের সিঁড়ির মাথায় বিরাট সদর। রাত আড়াইটেয় রেস্টুরেণ্ট বন্ধ হয়ে গেছে, তাই আলো কম; চলন-পথে একটিমাত্র ঝাড়বাতি আর দেওয়ালে লাগানো প্রচ্ছন্ন আলো, পুরু লাল রঙের কার্পেটের ওপর তারই লম্বা টানা টানা আলো আর ছায়ার রেখা পড়েছে।

বেগ্‌লার আর হেস গাড়ি থেকে নেমে, সিঁড়ি পার হয়ে ঘোরানো দরজা ঠেলে জমকালো চলন-পথে যখন এসে পৌঁছল, তখন সেখানে রেস্টুরেণ্টের প্রধান পরিচারক লুই দাঁড়িয়ে, ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

লুই কিঞ্চিৎ উন্নাসিক, বনেদি গাম্ভীর্য তার অভ্যাসগত,

সহজে বিচলিত হয় না। বেগ্‌লার দেখলে, এখন কিন্তু সেই লুইকেও বেশ বিচলিত মনে হচ্ছে।

'এই দিকে'। দৃঢ়, প্রলম্বিত পদক্ষেপে লুই ডিটেকটিভ দুজনকে নিয়ে আরও একটা চলন পার হয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিরাট একটা ঘরে এনে পৌঁছে দিলে। সেটা রেস্টুরেণ্টের পানশালা।

হ্যারি ব্রাউনিং এইখানেই অপেক্ষা করছে। বার-এর লম্বা টেবিলের পাশে একটা উঁচু টুলের ওপর বসে আছে, হাতে একগ্লাস ব্র্যাণ্ডি, দাঁতের ফাঁকে একটা সিগার কামড়ে ধরা।

ব্রাউনিং-এর বয়স পঞ্চান্ন, ভারী-গড়ন, মাথায় টাক পড়েছে। নিখুঁত-কামানো মুখের রঙ রোদে তামাটে। ঘোর রঙের ডোরাদার একটা সান্ধ্য স্যুট পরেছে, বাটন হোল-এ একটা সাদা কার্নেশন ফুল। চেহারা আর সাজ-পোশাকেই তার পরিচয় প্রকট—করিৎকর্মা, ধনী, শক্তিশালী এবং বদমেজাজি।

হাত নেড়ে ঘরের শেষপ্রান্তের দিকে নির্দেশ করলে। 'ঐখানে আছে'। ঘরের একটা দিকে পর-পর কাঠের পার্টিশান দেওয়া কয়েকটা কামরা। প্রত্যেক ঘরের প্রবেশ-পথে লাল ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে। 'একদম শেষেরটা।'

ঘরের শেষপ্রান্তে গিয়ে ওরা কামরার ভিতর উঁকি মারল।

ক্ষীণ-আলোয় দেখতে পেলে, টেবিলের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন মহিলা, সোনালি চুলের গোছা অবিন্যস্ত, টেবিলের কালো ওক কাঠের ওপর সোনার তারের মতো

জ্বলজ্বল করছে। সাদা পিঠ-খোলা একটা সান্ধ্য পোশাক তাঁর পরনে।

ব্রাউনিং-এর দিকে ফিরে তাকাল বেগ্‌লার। 'এখানে একটু জোর আলো পাওয়া যেতে পারে, মিঃ ব্রাউনিং?'

বার-এর পিছনে গিয়ে লুই কয়েকটা সুইচ টিপে দিলে।

ঘরের সেই দিকটা হঠাৎ এমন তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যে, দুজনেরই চোখ কুঁচকে গেল।

কামরার ভিতর ঢুকল বেগ্‌লার। মেয়েটির অনাবৃত কাঁধটা ছুঁয়ে দেখলে। কনকনে ঠাণ্ডা, ব্রাউনিং যে বলেছে, মারা গেছে, কথাটা ঠিকই। তবু, নিশ্চিৎ হবার জন্যে গলার পাশে আঙুলের ডগা চেপে ধরল, কোনও স্পন্দন নেই।

হেস বল্লে, 'ফোটো তোলার ব্যবস্থা না করে বেশি ছোঁওয়া-ছুঁয়ি করাটা ঠিক হবে না।'

কচমচ করে সিগার চিবতে চিবতে ব্রাউনিং এগিয়ে এল। 'এক্ষুনি লাশটাকে সরাও দিকিনি! হাত লাগাও, হাত লাগাও! মর্গে গিয়ে যত খুশি ক্যার্দানি দেখিও। কাগজ-ওলারা যদি টের পায়, এ মরসুমের মতো ব্যাবসার দফা গয়া! সরাও, সরাও, পাচার কর!'

হেস বললে, 'ফোটো তোলার আগে সরানো যাবে না। ব্যাপারটা খুনও হতে পারে।'

কটমটিয়ে তাকাল ব্রাউনিং। 'তুমি কে হে?'

বেগ্‌লার মনে-মনে শাপ-শাপান্ত করতে লাগল হেসকে—কেন যে মুখ খুলতে গেল! সামলে নেবার জন্যে বললে, 'ও

হলো হোমিসাইড-এর ইন-চার্জ, মিঃ ব্রাউনিং। কথাটা কিন্তু ঠিকই। খুন হওয়াটাও অসম্ভব নয়। আমি…'

পাথরের মতো কঠিনমুখে ব্রাউনিং বললে, 'এটা আত্মহত্যা! মেঝেতে ইঞ্জেক্‌শনের সিরিঞ্জ পড়ে রয়েছে, সারা মুখটা নীল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, গাদাগুচ্ছের হেরয়েন ঠুসে কাবার হয়েছে। এটা বুঝতে কোনও শালার টিকটিকির দরকার হয় না। যাক গে, এবার বিদায় কর!'

টেবিলের তলায় উঁকি দিল বেগ্‌লার। কার্পেটের ওপর একটা খালি হাইপোডার্‌মিক সিরিঞ্জ। উঠে দাঁড়িয়ে মহিলার মাথার দুপাশ আলতো করে ধরে একটু উঁচু করলে, মুখখানা দেখলে ভালো করে। চামড়ার নীল রঙ আর চোখের তারারন্ধ্রের নিরাবরণ বিস্তৃতি দেখে মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল। আস্তে-আস্তে মাথাটা আবার টেবিলে নামিয়ে রাখলে।

খুব শান্তগলায় বললে, 'তবু, খুন হওয়াটাও কিছু বিচিত্র নয়, মিঃ ব্রাউনিং। কেউ হয়ত ফুঁড়ে দিয়েছে।'

খুব উত্যক্ত হয়ে উঠে ব্রাউনিং বললে, 'এখানে ঢোকার পর থেকে ওর ধারে-কাছে কেউ যায়নি। নাও, নাও, বিদেয় কর!'

'যতক্ষণ না আত্মহত্যা বলে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ আত্মহত্যার ঘটনাকেও হত্যা বলেই ধরে নিতে হয়, মিঃ ব্রাউনিং! আমি দুঃখিত, কিন্তু এক্ষেত্রেও কোনও ব্যাতিক্রম করা সম্ভব নয়।'

ব্রাউনিং-এর চোখদুটো রাগে দপদপ করে উঠল।

'দেখ বেগ্‌লার, যে-সব পুলিশ বেগড়বাঁই করে, তাদের

আমি চক্ষে দেখতে পারি না। আগেও অনেককে দেখতে পারিনি। তাদের কী গতি হয়েছিল, আজও বেশ মনে আছে আমার।' লুই-এর দিকে ফিরে বললে, 'ফোনে ক্যাপ্টেন টেরেল-কে ডাক।'

লুই টেলিফোনের দিকে চলে যেতেই বেগ্‌লার বললে, 'আমি নাচার, মিঃ ব্রাউনিং; এক চীফ যদি নিয়ম ভাঙতে বলেন, আলাদা কথা। নইলে এইটাই রীতি। আচ্ছা, আর কোনও ফোন আছে? ব্যবহার করতুম একটু।'

'টেরেল-এর সঙ্গে কথা বলার আগে কোনও শালার টেলিফোন ব্যবহার করতে পাচ্ছ না।' তড়বড় করে কথাকটা বলে বার-এর লম্বা টেবিলের দিকে চলে গেল ব্রাউনিং।

বেগ্‌লার আর হেস মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। হেস একটু মুচকি হাসলে। জানে, খাঁড়া যদি ঝুলে থাকে, সেটা তার নিজের মাথায় নয়। বেগ্‌লারকে পাশ কাটিয়ে কামরার মধ্যে গেল। মৃতদেহের পাশে সাদা কাপড়ের ওপর জরির কাজ-করা একটা হাতব্যাগ। তুলে নিয়ে খুললে, ভেতরে তাকাল। একটা খাম টেনে বার করলে, উল্টেপাল্টে দেখলে, তারপর বেগ্‌লার-এর দিকে বাড়িয়ে দিলে। 'এটা একটু দেখলে হতো না? আমাদেরই জন্যে রাখা ছিল।'

খামটা নিলে বেগ্‌লার। কানে এল, টেলিফোনে ব্রাউনিং নিচুগলায় কথা বলছে। খামের ওপর ত্যাড়াব্যাঁকা লেখাটা নজরে পড়ল: পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট। পকেট থেকে ছুরি বার করে সন্তর্পণে মুখটা চিরলে, ভাঁজ-করা একটা কাগজ বেরুল। ভাঁজ খুলে সমান করে ধরলে। তেমনি ত্যাড়াব্যাঁকা অক্ষরের

লেখা। যখন পড়ছে, তখন ঘাড়ের কাছে হেস-এর নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেল। লেখা আছে :

২৪৭ নম্বর সীভিউ বুলেভার্ড-এ খোঁজ করুন। ওর মরণদশা ঘনিয়েই এসেছিল। যেতই। আমার হাতেই গেল। ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যে নিজের ব্যবস্থাও নিজেই করেছি—কয়েক সেকেণ্ডেই সকলের হাতের বাইরে।

মিউরিয়েল মার্শ ডিভন।

পুনশ্চ : চাবি আছে পাপোশের তলায়।

ব্রাউনিং-এর আওয়াজ পাওয়া গেল, 'ওহে বেগ্‌লার, টেরেল ডাকছে।'

কাগজটা হাতে নিয়েই টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল বেগ্‌লার, তারপর টেলিফোনটা তুলে নিলে। ব্রাউনিং কয়েক পা সরে দাঁড়াল।

'চীফ কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। ব্যাপার কী, জো?'

'মিঃ ব্রাউনিং খবর দিলেন, রেস্টুরেণ্টে একজন মহিলা মারা গেছেন। আমি এই সবে এসেছি। মনে হচ্ছে আত্মহত্যা: কড়া মাত্রায় হেরয়েন। একটা খালি সিরিঞ্জ পাওয়া গেছে, মহিলার মুখও নীল। মহিলার ব্যাগের ভেতর থেকে একটা চিঠিও পেয়েছি—স্বীকারোক্তি। পড়ে শোনাচ্ছি।' কাগজটা খুলে ধরে পড়ে শোনাল, তবে বেশ নিচু গলায়, ব্রাউনিং যাতে শুনতে না-পায়। 'মনে হচ্ছে, কাউকে খুন করে এসেছে। মিঃ ব্রাউনিং চান, আমরা লাশ তুলে নিয়ে যাই। আমার তো

মনে হয়, আমরা তা করতে পারি না। আপনার কি মনে হয়, পারি চীফ? এখানে আমাদের দলের সবাইকার আসা দরকার এবার।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তার পর টেরেল-এর গলা শোনা গেল, 'তোমার সঙ্গে কে আছে, জো?'

'হেস।'

'ও লাশের কাছেই থাকুক। তুমি বরং সীভিউ বুলেভার্ড-এ গিয়ে দেখে এস। লেপ্‌স্কিকে খবর দিচ্ছি, ওখানে তোমার সঙ্গে দেখা করবে। মিনিট কুড়ির মধ্যে রেস্টুরেন্টে পৌঁছে যাচ্ছি। হেসকে বলে দাও, সাঙ্গপাঙ্গদের আসতে খবর দিক।'

ব্রাউনিং অস্থিরচরণে পায়চারি করে যাচ্ছিল, সেই দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বেগ্‌লার বললে, 'ব্রাউনিং কিন্তু অসন্তুষ্ট হবে, স্যার।'

'সে, আমি কথা বলব এখন ওর সঙ্গে। তুমি বেরিয়ে পড়, জো।'

'এই বেরলুম বলে।' টেলিফোন নামিয়ে রেখে ব্রাউনিং-এর দিকে এগিয়ে গেল বেগ্‌লার। ব্রাউনিং পায়চারি থামিয়ে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'চীফ আপনার সঙ্গে কথা বলবেন, মিঃ ব্রাউনিং।'

ব্রাউনিং ব্যস্তসমস্ত হয়ে টেলিফোনের দিকে ছুটল, বেগ্‌লার গেল হেস-এর কাছে।

'দলের সবাইকে জড়ো কর, ফ্রেড। নিয়ম-অনুযায়ী যা-যা করণীয়, সবই করতে হবে। চীফ আসছেন।' একটু মুচকি

হাসল বেগ্‌লার। 'আমি চললুম সীভিউ বুলেভার্ড-এ। চলি তাহলে, ব্রাউনিং-এর সঙ্গে মানিয়ে চোল।'

'এখন, ব্রাউনিং আমার সঙ্গে মানিয়ে চললে, তবে তো!' হেস-এর গলায় অস্বস্তি।

বাইরের হাওয়া বেরিয়ে এল বেগ্‌লার। গাড়ির দিকে যখন এগুচ্ছে, আলো-আঁধারির মধ্যে থেকে লিক্‌পিকে লম্বা একটি লোক এগিয়ে এল ওর দিকে। "প্যারাডাইস সান" পত্রিকার বার্ট হ্যামিল্টন।

বেগ্‌লার-এর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে হ্যামিল্টন বললে, 'তোমার দাঁতের ব্যথাটা এখন কেমন হে, জো? আমি তো জানতুমই না যে, ব্যথা করবার মতো দাঁত তোমার এখনও আছে দু-একটা।'

ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল বেগ্‌লার। বললে, 'একটা উপদেশ নেবে বার্ট? ওদিকে ভিড়তে যেও না। ল্যাজে-গোবরে করে ছাড়বে।'

'ল্যাজ থাকলে তো!'

হ্যামিল্টন সিঁড়ি বেয়ে রেস্টুরেণ্টে ঢুকছে, বেগ্‌লার তখন সীভিউ বুলেভার্ড-এর দিকে গাড়ি হাঁকিয়ে দিয়েছে।

টিকি এড্রিস-এর মাথাটা যেমন গোল তেমনি বড়, হাত-পাগুলো কেটো-কেটো, লম্বায় সাড়ে-তিন ফুট। টিকি এড্রিস বামন, ডাক্তারি-শাস্ত্রে যাকে বলে একনড্রোপ্ল্যাস্টিক ডোয়ার্ফ।

লা কোকুইল রেস্টুরেণ্টে পরিচারকের কাজ করছে গত আট বছর হলো। ব্রাউনিং-এর ফুর্তিবাজ খদ্দেররা এড্রিসকে নিয়ে মজা পায়; তার মিষ্টি স্বভাব, তার ম্লান চোখ, তার তড়বড়ে খুটখুটে চলন দেখে তারা অবজ্ঞা-মেশানো একরকমের আমোদ পায়। একটা বামন তাদের তদারক করছে—এটা তাদের কাছে অভিনবত্বের আনন্দ আনে। এই কয় বছরে এড্রিস ভাঁড়ের ভূমিকায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, রাজ-বয়স্যের মতোই বড় বড় খদ্দেরদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যে, স্বয়ং ব্রাউনিং পর্যন্ত তাঁদের তেমন অন্তরঙ্গের মতো আপ্যায়ন করতে সাহস করে না।

বাসন রাখার ঘরে প্রধান পরিচারক লুই যখন এসে ঢুকল, এড্রিস তখন নিজের দেহের মাপসই একটা এপ্রন পরে ঘষে-ঘষে গেলাস মুছছে। এই গেলাসটা হলেই কাজ চুকে যায়।

'ওরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, টিকি। যা জিগ্যেস করবে, জবাব দিও। কথা কম বলাই ভালো, মিঃ ব্রাউনিং না-হলে অসুবিধেয় পড়তে পারেন।'

গেলাস-মোছা ন্যাকড়াটা টাঙিয়ে রেখে এপ্রন খুলে ফেললে এড্রিস। তার কিম্ভুত মুখখানা থমথমে, চোখের নিচে কালো ছায়া। সন্ধ্যা ছটা থেকে নাগাড়ে কাজ করছে; বড় শ্রান্ত।

সাদা কোটটা গায়ে গলাতে গলাতে বললে, 'ঠিক আছে, মিঃ লুই। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

খুটখুট করে ঘর থেকে বেরিয়ে বার-এ এল। বার-এর শেষপ্রান্তে ফোটোগ্রাফাররা মহিলার মৃতদেহের ছবি নিচ্ছে।

পুলিশের চীফ, টেরেল কথা বলছেন ব্রাউনিং-এর সঙ্গে। বিরাট দেহ, খয়েরি চুলে সাদার ছোপ ধরেছে, উঁচু চৌকো চোয়াল। বেগলার-এর টেলিফোন পেয়ে সদ্য-সদ্য যে বিছানা থেকে উঠে এসেছেন, মুখে সামান্য একটু খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ছাড়া, দেখে বোঝবার উপায় নেই।

বেঁটে-খাটো মোটা-সোটা মানুষ, মেডিকেল অফিসার ডাক্তার লোয়িস অপেক্ষা করতে-করতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন। ফোটোগ্রাফারের কাজ শেষ না-হলে তিনি শুরু করতে পারছেন না। বার-এর লম্বা টেবিলের ধারে উঁচু টুলের ওপর বসে অপেক্ষা করছে ফিঙ্গারপ্রিণ্ট এক্সপার্ট দুজন—আঙুলের ছাপ নেবে। জুলজুল করে তাকাচ্ছে সারি-সারি বোতলগুলোর দিকে।

একটা কামরার মধ্যে বসে রয়েছে ফ্রেড হেস আর নিম্ন-পদস্থ একজন ডিটেক্‌টিভ, ম্যাক্স জ্যাকবি। হাতে নোটবই আর পেন্সিল। মুখ তুলে এড্রিসকে দেখতে পেল হেস, ইশারায় কাছে ডাকল।

এড্রিস খুটখুট করে এগিয়ে গেল।

জেরার ভঙ্গীতে হেস জিগ্যেস করলে, 'যে মহিলাটি মারা গেছেন, তুমিই তাঁকে পরিবেশন করেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

বামনটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল হেস। মুখ দেখে বোঝা গেল, লক্ষণীয় বিশেষ কিছুই ধরা পড়ল না। এড্রিস সোজা হেস-এর দিকে চেয়ে রইল, মুখ অভিব্যক্তিহীন, খেঁটে হাতদুটো তলপেটের কাছে জড়ো করে ধরা।

'নাম কী ?'

'টিকি এড্‌ওয়ার্ড এড্রিস।'

'ঠিকানা ?'

'২৪ নম্বর ইস্ট স্ট্রীট, সীকম্ব।'

সীকম্ব বলতে গেলে বিস্তরমান প্যারাডাইস সিটিরই একটা অংশ ; স্বল্প আয়ের চাকরেদের বাস।

হেস প্রশ্ন করছে, জ্যাকবি দরকারি কথাগুলো টুকে রাখছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হেস জিগ্যেস করলে, 'মহিলা এসেছিলেন কখন ?'

'এগারোটার কিছু পরে : ঘড়ি ধরে বলতে গেলে, এগারোটা বেজে আট মিনিটে।'

বামনটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল হেস।

'অত নিশ্চয় করে বলছ কী করে ?'

'আমার ঘড়ি আছে···ব্যবহারও করি।'

'একা ছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ কামরাটাই আগে থেকে ঠিক করা ছিল ওঁর জন্যে ?'

'না, আগে থেকে ঠিক করা ছিল না। তখন বেশ রাত, প্রায় সবাই তখন বার ছেড়ে খানা-কামরায় চলে গেছেন। বার প্রায় ফাঁকা।'

'যখন এলেন, বেশ সুস্থ স্বাভাবিক ?'

হেস টের পেল, ব্রাউনিং আর টেরেল কাছে এসে দাঁড়িয়ে ওদের কথা-বার্তা শুনছে। এড্রিস আড়চোখে দেখে নিলে,

ব্রাউনিং ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সুস্থ-স্বাভাবিকই ছিলেন।'

'এসে কী করলেন?'

'কামরার মধ্যে ঢুকে বসে পড়লেন। জিগ্যেস করলুম, আর কারও আসার কথা আছে কি না; বললেন, না। হুইস্কি চাইলেন। এনে দিলাম।'

'তার পর কী হলো?'

'কয়েকজন খদ্দেরকে পানীয় দিতে খাবার ঘরে যেতে হয়েছিল। বার-এ ফিরে এসে দেখলুম, কামরার পর্দা ফেলা। বারম্যানকে জিগ্যেস করলুম, আর কেউ এসেছে কি না ওঁর কামরায়। বললে, একাই আছেন। মনে হলো, নিরালায় থাকতে চাইছেন, তাই ওদিকে আর গেলাম না।'

'নিরালায় যে থাকতে চাইছিলেন, তাতে আর সন্দেহ কী! যাক, তারপর কী হলো, বল।'

'আমাদের বার বন্ধ হয় রাত আড়াইটে নাগাদ। বেশির ভাগ খদ্দেরই তখন চলে গেছেন। তখনও ওঁর কামরার পর্দা ফেলা রয়েছে দেখে, দাম নিতে গেলুম। কাঠে ঠকঠক করে আওয়াজ করলুম পর্দা সরাবার আগে, সাড়া পেলুম না। উঁকি মারলুম, দেখলুম পড়ে আছেন।'

'তার মানে সাড়ে-তিন ঘণ্টা ওঁর ধারে-কাছে যাওনি?'

'না, যাইনি। অনেক কাজ ছিল। বাসন রাখার ঘরে ধোয়াধুয়ির কাজও তো করি। খদ্দেরের ভীড় ছিল খুব। অনেক গেলাস-পত্তর জমে গিয়েছিল।'

হঠাৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠে টেরেন্স-এর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে

ব্রাউনিং বলে উঠল, আমি বাড়ি চললুম। লুই বন্ধ-সন্ধ করে দেবে। যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে গেল। ব্যাবসার বারোটা বাজিয়ে দেবে দেখছি। তোমার চেলা-চামুণ্ডাদের যত তাড়াতাড়ি পার বিদেয় কর, ফ্র্যাঙ্ক। লুই বেচারিকে একটু দুচোখের পাতা এক করতে দাও।'

'আর বেশিক্ষণ লাগবে না, হ্যারি।' ব্রাউনিং-এর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন টেরেল; ব্রাউনিং সিঁড়ি দিয়ে নেমে চোখের আড়ালে চলে গেল, তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন। ডাক্তার লোয়িস লাশ পরীক্ষা করছিলেন, সেই দিকে এগিয়ে গেলেন।

এড্রিস তখন বলছে, 'আমায় তখন জিগ্যেস করলেন না, গোড়ায় উনি সুস্থ-স্বাভাবিক ছিলেন কি না—তখন আমি সত্যি কথা বলিনি। আবার নতুন করে জবাব দিতে চাই।'

কটমট করে তাকাল হেস।

'দেখ, ওসব চালাকি মামার বাড়িতে চালিয়ো। আগেরবার মিথ্যে বলেছিলে বলতে চাও?'

'চাকরি যাবার ভয় ছিল।' রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছলে এড্রিস। 'ভালো চাকরি। মালিক শুনছিলেন আমি কী বলি। যদি সত্যি কথা বলতুম, উনি শুনতে পেতেন, লাথি মেরে দূর করে দিতেন আমায়।'

'এখন সত্যি কথাটা ফাঁস করলে যে লাথি খাবে না, জানছ কী করে?'

'আপনি না-বললে টের পাবেন না। ঠিক না?'

বামনটার দিকে ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল হেস। তারপর কাঁধ ঝাঁকালে।

'বেশ। তা হলে উনি সুস্থ-স্বাভাবিক ছিলেন না?'

'না। প্রথম দেখেই টের পেয়েছিলুম, গণ্ডগোল আছে। ওকে সাদা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল, কাঁপছিল। ঐ রকম যখন হয়, তখন বিদিকিচ্ছিরি সব কাণ্ড করে, এ আমি জানতুম। তাই যেই বুঝলুম যে, এবার একটা কেচ্ছা হবে, সঙ্গে-সঙ্গে কামরার ভেতরে নিয়ে বসিয়ে দিয়ে হুইস্কি এনে দিলুম। পর্দাটা টেনে দিলুম। একটা কেচ্ছা হোক, তা চাইনি। মালিক আবার ওসব একদম সইতে পারেন না।'

হেস আর জ্যকবি একবার মুখ চাওয়া-চায়ি করে নিলে। হেস বললে, 'তার মানে, ওঁকে আগে থেকেই চিনতে?'

লুই তখন একধারে দাঁড়িয়ে বার্ট-এর সঙ্গে কথা বলছে। আড়চোখে সেই দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে নিচু গলায় এড্রিস জবাব দিলে, 'হ্যাঁ, চিনতুম। পরিচয় ছিল। আমার ঠিক সামনের ফ্ল্যাটে থাকে।'

দাঁত কড়মড়িয়ে হেস বলে উঠল, 'তা, সেটা আগে বলতে কী হয়েছিল?'

'আপনি তো জিগ্যেস করেননি, তা ছাড়া, আগেই তো বললুম, মিঃ ব্রাউনিং শুনছিলেন, আমি কী বলি। যদি জানতে পারেন যে, আমার চেনা লোক, আমিই কামরায় বসিয়েছি, লাথি মেরে দূর করে দেবেন।'

'ওঁর সম্বন্ধে কী জান?'

'বদ্ধ নেশাড়ে, বাজারের মেয়েছেলে। আট বছর ধরে চিনি।'

ওর দিকে একটু ঝুঁকে বসল হেস।

'তোমার রক্ষিতা না কি, টিকি ?'

এড্রিস সোজাসুজি তাকাল হেস-এর দিকে; দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা। বললে, 'কোনও মেয়েমানুষ আমার কাছে থাকতে চাইবে ? আপনার বিশ্বাস হয় ?'

'তা হলে, মালদার লোচ্চা লোক দেখে ওর কাছে জুটিয়ে দিতে, আর তার বদলে দালালি নিতে ? তাই না টিকি ?'

অবিচলিত শান্ত গলায় এড্রিস জবাব দিলে, 'ঘটনাক্রমে আমার সামনের ফ্ল্যাটে থাকত। মাঝে-মধ্যে এসে কথা বলত। আপনি আমায় যে-চোখে দেখেন, সবাই যে-চোখে দেখে, সেও সেই চোখেই দেখত নিশ্চয়ই: একটা হাস্যকর কিম্ভুত জীব। কথা বললেই কেউ কিছু তার দালাল হয়ে যায় না। যায় কি ?'

চোখে-চোখে চেয়ে রইল দুজনে। হেস-ই আগে চোখ সরালে।

'কী নিয়ে কথা বলত ?'

'নানান কথা। স্বামীর কথা, মেয়ের কথা, নিজের জীবনের কথা, ভালোবাসার মানুষদের কথা।'

'বিয়ে ছিল ?'

'ছিল।'

লুই এগিয়ে এল।

'আপনিই মিঃ হেস ?'

'তাতে হলোটা কী ?' হেস তড়পে উঠল। 'এখন ব্যস্ত আছি।'

'টেলিফোনে ডাকছে।'

হেস উঠে দাঁড়াল।

এড্রিসকে বললে, 'কাছাকাছি থেক হে, বাঁটলো। আরও কথা আছে।'

বার-টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরল।

'বলুন ?'

বেগ্‌লার-এর গলা পাওয়া গেল। 'জো বলছি। খুনের কেস ঘাড়ে চাপল এবার। চীফ আছেন ওখানে ?'

'হ্যাঁ।'

'বল, মহিলার চিঠিতে যার কথা লেখা আছে, তাকে পেয়েছি। গোটাপাঁচেক গুলি খেয়েছে। তোমাকে এখানে দরকার।'

'ঠিক আছে, বলছি। চমৎকার হলো। ঘুম-টুমের দফা গয়া হলো আর কি।'

'বিলকুল। কিন্তু ঝটপট কর, ফ্রেড।' কানেক্‌শান কেটে দিল বেগ্‌লার।

হেস যখন টেলিফোন নামিয়ে রাখছে, সাদা কোট-পরা দুজন লোক স্ট্রেচার নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে তখন।

ওদেরই একজন বললে, 'লাশ তৈরি ?'

'প্রায়। একটু রোখো। দেখছি।' ঘরের ওদিকে যেতে যেতে এড্রিস-এর কাছাকাছি এসে বল্লে, 'ঠিক আছে, টিকি, আপাতত রেহাই দিলুম। কাল আবার কথা বলব। বেলা এগারোটা নাগাদ হেড কোয়ার্টারে গিয়ে আমার নাম কোর ···আমার নাম হেস।' টেরেল আর ডাক্তার লোয়িস-এর দিকে এগিয়ে গেল।

ব্যাগ গোছানো শেষ করে টেরেলকে ডাক্তার লোয়িস তখন বলছেন, 'হ্যাঁ, এবার লাশ সরাতে পারেন। কাল সকাল দশটায় দপ্তরে রিপোর্ট পাবেন। এবার শুতে যাই।'

ওর দিকে চেয়ে মুচকি হাসল হেস।

বেশ রস দিয়ে বললে, 'আপনার তাই ধারণা বুঝি? আপনার জন্যে আরও একটা লাশ যোগাড় করে ফেলেছি যে! এইমাত্র বেগ্‌লার-এর ফোন পেলুম। ২৪৭ নম্বর সীভিউ বুলেভার্ড-এ অপেক্ষা করে রয়েছে আপনার জন্যে।'

ডাক্তার লোয়িস-এর পুরুষ্টু মুখখানা তখন দেখবার মতন।

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'তার মানে, আজ রাত্তিরে আর ঘুমতে পাচ্ছি না!'

'আমাদের মতো জীবদের আবার ঘুমের দরকার হয় না কি?' হেস-এর মুখের হাসিটা আরও একটু বড় হলো। 'আমরা হচ্ছি সব অতিমানুষ!'

লোয়িস হন্তদন্ত হয়ে চলে যেতেই টেরেল জিগ্যেস করলেন, 'কী হলো, ফ্রেড?'

'এইমাত্র জো টেলিফোন করলে, চীফ। গুলি মেরে খুন। আমাদের সবাইকে ওখানে যেতে বলছে, স্যার।'

মেঝেয় মৃতদেহটা শোয়ানো। সেই দিকে তাকিয়ে দেখলেন টেরেল। বছর-চল্লিশেক বয়স; পাৎলা গড়ন, সুদর্শনা।

'লক্কড়মার্কা নেশাড়ে মেয়েমানুষ, ফ্রেড। উরুতদুটো ফুঁড়ে ফুঁড়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।'

'বাঁটকুলটা মুখ খুলেছে, স্যার। একে চেনে। বললে, সুধু

হেস উঠে দাঁড়াল।

এড্রিসকে বললে, 'কাছাকাছি থেক হে, বাঁটলো। আরও কথা আছে।'

বার-টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরল।

'বলুন ?'

বেগ্‌লার-এর গলা পাওয়া গেল। 'জো বলছি। খুনের কেস ঘাড়ে চাপল এবার। চীফ আছেন ওখানে ?'

'হ্যাঁ।'

'বল, মহিলার চিঠিতে যার কথা লেখা আছে, তাকে পেয়েছি। গোটাপাঁচেক গুলি খেয়েছে। তোমাকে এখানে দরকার।'

'ঠিক আছে, বলছি। চমৎকার হলো। ঘুম-টুমের দফা গয়া হলো আর কি।'

'বিলকুল। কিন্তু ঝটপট কর, ফ্রেড।' কানেক্‌শান কেটে দিল বেগ্‌লার।

হেস যখন টেলিফোন নামিয়ে রাখছে, সাদা কোট-পরা দুজন লোক স্ট্রেচার নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে তখন।

ওদেরই একজন বললে, 'লাশ তৈরি ?'

'প্রায়। একটু রোখো। দেখছি।' ঘরের ওদিকে যেতে যেতে এড্রিস-এর কাছাকাছি এসে বল্লে, 'ঠিক আছে, টিকি, আপাতত রেহাই দিলুম। কাল আবার কথা বলব। বেলা এগারোটা নাগাদ হেড কোয়ার্টারে গিয়ে আমার নাম কোর …আমার নাম হেস।' টেরেল আর ডাক্তার লোয়িস-এর দিকে এগিয়ে গেল।

ব্যাগ গোছানো শেষ করে টেরেলকে ডাক্তার লোয়িস তখন বলছেন, 'হ্যাঁ, এবার লাশ সরাতে পারেন। কাল সকাল দশটায় দপ্তরে রিপোর্ট পাবেন। এবার শুতে যাই।'

ওর দিকে চেয়ে মুচকি হাসল হেস।

বেশ রস দিয়ে বললে, 'আপনার তাই ধারণা বুঝি? আপনার জন্যে আরও একটা লাশ যোগাড় করে ফেলেছি যে। এইমাত্র বেগ্‌লার-এর ফোন পেলুম। ২৪৭ নম্বর সীভিউ বুলেভার্ড-এ অপেক্ষা করে রয়েছে আপনার জন্যে।'

ডাক্তার লোয়িস-এর পুরুষ্টু মুখখানা তখন দেখবার মতন।

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'তার মানে, আজ রাত্তিরে আর ঘুমতে পাচ্ছি না!'

'আমাদের মতো জীবদের আবার ঘুমের দরকার হয় না কি?' হেস-এর মুখের হাসিটা আরও একটু বড় হলো। 'আমরা হচ্ছি সব অতিমানুষ!'

লোয়িস হন্তদন্ত হয়ে চলে যেতেই টেরেল জিগ্যেস করলেন, 'কী হলো, ফ্রেড?'

'এইমাত্র জো টেলিফোন করলে, চীফ। গুলি মেরে খুন। আমাদের সবাইকে ওখানে যেতে বলছে, স্যার।'

মেঝেয় মৃতদেহটা শোয়ানো। সেই দিকে তাকিয়ে দেখলেন টেরেল। বছর-চল্লিশেক বয়স; পাৎলা গড়ন, সুদর্শনা।

'লক্কড়মার্কা নেশাড়ে মেয়েমানুষ, ফ্রেড। উরুতদুটো ফুঁড়ে ফুঁড়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।'

'বাঁটকুলটা মুখ খুলেছে, স্যার। একে চেনে। বললে, সুধু

লক্কড় নয়, দেহও বেচত। জানতে পারলে ব্রাউনিং যা খুশি হবে না!'

শকুন যেমন মড়ার গন্ধ পায়, তেমনি করে হ্যামিল্টন পায়ে-পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল।

টেরেল বললেন, 'এদিকের ব্যবস্থা ম্যাক্স করুক। আমরা, চলো, জো-র কাছে যাই।'

হ্যামিল্টন এসে দাঁড়িয়েছে। লম্বা, চল্লিশের কোঠায় বয়স। কবে যেন কে বলেছিল, ওকে জেম্‌স স্টুয়ার্ট-এর মতো দেখতে। সেই থেকে তারই মতো মুখে সুপুরি রাখার ঢঙে চিবিয়ে-চিবিয়ে কথাবলা অভ্যাস করেছে। তার ফলে বিখ্যাত অভিনেতা জেম্‌স স্টুয়ার্ট-এর সঙ্গে মিলটা আরও বেশি কায়েম হয়েছে।

'কদ্দূর গড়ালো?'

টেরেল তখন ঘরের বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন।

মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কাছাকাছি ঘুরঘুর কর, দেখতে পাবে।'

হেস-এর পাশাপাশি চলতে চলতে হ্যামিল্টন আবার প্রশ্ন করলে, 'ব্যাপারখানা কী?'

'আর একটা লাশ। একজনকে সাবাড় করে নিজেকে সাবড়েছে। তোমার মনের মতো খোরাক।'

ওরা দুজন পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল, সরে এসে সেই দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখলে এড্রিস। চেয়ে দেখলে, সাদা কোটা-পরা লোক-দুটো লাশটাকে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

খুটখুট করে বাসন রাখবার ঘরে গিয়ে পৌঁছে যখন দরজা বন্ধ করলে, মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার—শয়তানি মাখানো

একচিলতে মুচকি হাসি ছড়িয়ে পড়ল সারামুখে। বিপুল উল্লাসে ঘরময় ঘুরে-ঘুরে নাচতে শুরু করে দিলে ; খেঁটে-খেঁটে হাতদুটো বাতাসে দোলাতে লাগল তালে তালে।

প্যারাডাইস সিটি থেকে সীকম্ব যাবার রাস্তা হলো সীভিউ বুলেভার্ড। বুলেভার্ড-এর যেদিকে প্যারাডাইস সিটির শেষ, সেদিকটায় বড়-বড় দামি বাড়ি। বাড়ির চারদিকে সুন্দর সুন্দর বাগান, সুইমিং পুল, খানতিনেক গাড়ি রাখবার মতো গ্যারাজ, স্বয়ংক্রিয় গেট। সীকম্ব-এর দিকটায় বাড়িগুলো ছোট-ছোট, দীন-হীন। বাড়ির আশে-পাশে জমি কম, ফুটপাথে খড়ির আঁচড়—ছোটরা ঘর কেটে খেলাধুলো করে। দুই প্রান্তে মার্কিন জীবনযাত্রার উঁচু আর নিচু তলার দুই নিদর্শন মেলে রেখেছে সীভিউ বুলেভার্ড—একদিকে সঞ্চয়ের আস্ফালন, আর একদিকে বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস।

২৪৭ নম্বরের সামনে যখন গাড়ি নিয়ে পৌঁছল বেগ্‌লার, রাতের আকাশে তখন ভোরের ফ্যাকাসে আলোর প্রথম ছোঁয়া লাগছে। ২৪৭ নম্বর একটা বাংলোর মতো বাড়ি, উঁচু-উঁচু ঝোপের বেড়ায় ঘেরা।

গাড়ির খুপরি থেকে টর্চ বার করলে বেগ্‌লার, ফুটপাথ পেরুল, ঠ্যালা মেরে কাঠের গেটটা খুলে টর্চের আলোয় পথ দেখে-দেখে সদর-দরজায় গিয়ে পৌঁছল। ক্ষয়ে-যাওয়া পাপোশটা তুলে তার তলা থেকে চাবিটা কুড়িয়ে নিল—চিঠিতে সেই কথাই লেখা ছিল।

একটু দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারের বাংলোটার দিকে একবার দেখলে—অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। খাপের মধ্যে বন্দুকটার বাঁধন আল্‌গা করে রাখলে। তারপর কলিং বেলটা চেপে ধরল। ধরেই রইল। কেউ দরজা খুলতে আসবে, সেরকম প্রত্যাশা অবশ্য করেনি, তবে সতর্ক হওয়া দরকার। যখন পরিষ্কার বোঝা গেল জীবিত কেউ নেই, তখন দরজায় চাবি গলালে।

দুমিনিট অপেক্ষা করলে, তারপর চাবি ঘোরালে। দরজা খুলল। ছোটখাট একটা হলঘর। ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলে। টর্চ ফেলে ফেলে আলোর সুইচ খুঁজে বার করলে। সুইচ জ্বালতেই আলোয় ভরে গেল ঘরটা। দেখতে পেলে একটা চলন-পথ, দুপাশে সারি সারি ঘরের দরজা।

সামনের দুটো ঘরে নোংরা নাইলনের পর্দা ছাড়া আসবাব-পত্র বলতে একেবারে কিছুই নেই, দেখে অবাক লাগল। পরের তিন নম্বর ঘরটা বাথরুম। আলনায় তোয়ালে আর তাকে স্পঞ্জ দেখে বুঝলে, চানের ঘরটা কেউ ব্যবহার করেছে। তারই সামনের দরজাটা খুলে দেখা গেল, রান্নাঘর। ফাঁকা ধুলো-ভরা তাক আর আলমারি দেখে বুঝলে, বাংলোয় যে-ই থাকুক, বাড়িতে খায় না।

চলন-পথের শেষ দুখানা সামনা-সামনি ঘরের দিকে এগোল বেগ্‌লার। বাঁ দিকের দরজা খুলে সুইচ জ্বালতেই দেখা গেল, শোবার ঘর। এক দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, সাধারণ শোবার ঘর নয়।

ঘরের মাঝখানে পেল্লায় একটা খাট। বিছানার চাদর

আর বালিসের ওয়াড় একেবারে নিখুঁত, পরিষ্কার—তখনও কেউ শোয়নি। খাটের পায়ের দিকের দেওয়ালে বিরাট একটা আয়না, আরও একটা আয়না ঠিক মাথার ওপরকার ছাদের তলায়। ঘরের মেঝেয় খুব পুরু কার্পেট, ঘোর লাল। ঘন সবুজ রঙের দেওয়ালময় বাঁধানো ছবির মেলা—হাস্যমুখী বিবসনা বিদ্যাধরীদের ফোটোগ্রাফ। ঘরের একদিকে বিরাট একটা দেওয়াল-আলমারি। এগিয়ে গিয়ে পাল্লা খুলে ধরলে বেগ্‌লার। যে সব মেয়েরা ডাকলে বাড়ি বয়ে দেহদান করতে আসে, তাদের বিকৃত যৌন-রুচির উপযুক্ত সব রকম মাল-মশলাই মজুদ—অশ্লীল ছবির অ্যালবাম থেকে আরম্ভ করে মায় চাবুক আর বেত পর্যন্ত। পাল্লা ভেজিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বেগ্‌লার। চলন-পথে এসে বিপরতমুখী শেষ ঘরটার সামনে একটু থমকে দাঁড়াল। এগিয়ে এসে হাতলে মোচড় দিয়ে দরজা ফাঁক করল। আস্তে-আস্তে খুলে হাট হয়ে গেল পাল্লাদুটো। ঘরে আলো জ্বলছে। সামনে একটা একানে খাট। একটা লোক এলিয়ে পড়ে রয়েছে, একপাশে খোলা খবরের কাগজ। সন্ধে বেলার খবরের কাগজ পড়ছিল—সেই নির্দোষ অলস মুহূর্তে মৃত্যু এসে হানা দিয়েছে। পরনে নীল-সাদা পাজামা স্যুট। জামার বুকের কাছে রক্তের ছাপ। মুঠো করা হাতে রক্তের দাগ, রোদে-পোড়া তামাটে গালে লাল আঁচড়।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বেগ্‌লার, তারপর ভেতরে ঢুকল।

বেশ জোয়ান চেহারা লোকটার, কাঁধদুটো বক্সারদের

মতো। কদমছাঁটা চুলের রঙ কুচকুচে কালো। সরু একজোড়া বাঁকানো গোঁফের দৌলতে মুখে একটা দাম্ভিক লম্পটের ছাপ পড়েছে। প্যারাডাইস সিটির সমুদ্রতীরে যে-সব মাগীবাজ খেলুড়ে পুরুষদের ভীড় হয়, এ তাদেরই একজন ; মাস্‌ল নাচায়, পুরুষত্ব জাহির করে, তাকত দেখিয়ে বেড়ায়। সেটাই ওদের একমাত্র পুঁজি, আর সেই পুঁজি ভাঙিয়েই ওদের রোজগার।

খাটের পাশে টেবিলের ওপর টেলিফোন রয়েছে দেখতে পেল বেগ্‌লার। লা কোকুইল-এর নম্বর ঘোরাল। হেস-এর সঙ্গে সবে কথা শেষ করেছে, সদর দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল। দরজা খুলতে দেখা গেল, ডিটেক্‌টিভ টম লেপ্‌স্কি পাপোশের ওপর দাঁড়িয়ে।

হলঘরে ঢুকতে-ঢুকতে লেপ্‌স্কি বললে, 'চীফের কাছ থেকে খবর পেলুম, এখানে কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে।' লেপ্‌স্কি বেশ ছিপছিপে লম্বা, শক্ত-সমর্থ, তামাটে কোঁচকানো মুখ, পরিষ্কার বরফ-নীল চোখ।

'হ্যাঁ·· একটা লাশ। দেখে যাও।'

শোবার ঘরে নিয়ে গেলে বেগ্‌লার। একবার দেখে নিয়ে নিজের মাথার টুপিটাকে পিছন দিকে ঠেলে সরিয়ে দিলে লেপ্‌স্কি। বললে, 'এ হচ্ছে জনি উইলিয়াম্‌স। বেশ, বেশ, শেষ পর্যন্ত গতি হলো তা হলে।'

'চেন ?'

'খুব চিনি। অনেকবার দেখেছি। প্যালেস হোটেলে থাকত। মেয়ে চরিয়ে বেশ পয়সা কামাত। এই আঁস্তাকুড়ে করছিলটা কী ?'

দেওয়াল-ঘেঁষে একটা দেরাজ ছিল, তারই টানা খুলে খুলে দেখছিল বেগ্‌লার। চামড়ার একটা পকেট-ব্যাগ পেল। তার ভিতরে একটা ডাইনার ক্লাব-এর কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স আর চেক-বই। সবকটাই জনি উইলিয়াম্‌স-এর নামে। চেক-বই থেকে জানা গেল, ব্যাঙ্কে উইলিয়াম্‌স-এর ৩,৭৫৬ ডলার জমা আছে।

বেগ্‌লার বললে, 'আমার মনে হয়, ও এখানে থাকত। ওদিকের ঘরটায় একবার চোখ বুলিয়ে এস।'

লেপ্‌স্কি ওঘরে গেল, বেগ্‌লার আরও কিছু ক্ষণ খোঁজা-খুঁজি করলে। একটা দেওয়াল-আলমারি দেখলে, উইলিয়াম্‌স-এর পোশাক-আসাকে ঠাসা।

লেপ্‌স্কি ফিরে এল। বললে, 'ভাড়াটে বাসর-ঘর। তা, বিচ্ছেধরীটি কে?'

'নাম তো বলেছে, মিউরিয়েল মার্শ ডিভন। আজ রাত্তিরে লা কোকুইল রেস্টুরেণ্ট একগাদা হেরয়েন ঠুসে সাবাড় হয়ে গেছে। আত্মহত্যার একটা স্বীকারোক্তিও লিখে গেছে। তাতে কবুল করেছে যে, আমাদের এই কাত্তিকটিকেও সাবড়েছেন তিনিই।'

কাছে গিয়ে উইলিয়াম্‌স-এর বুকের দিকে লক্ষ্য করলে লেপ্‌স্কি। অস্ফুট একটা শব্দ করে পিছিয়ে এল।

'কোনও সন্দেহ রাখতে চায়নি। দেখে মনে হচ্ছে, হৃৎ-পিণ্ডটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।'

হেঁট হয়ে খাটের তলায় উঁকি দিলে বেগ্‌লার। ·৩৮ মিলি-মিটারের একটা আটোমেটিক পিস্তল টেনে বার করলে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে তার ওপর ফেলে দিলে, তার-পর রুমালে মুড়ে তুলে নিলে।

বল্লে, 'জলের মতো সোজা ব্যাপার। এখনই ফয়সালা হয়ে যাবে, বুঝতে পারছি। দু-একঘণ্টার ঘুমও বোধ হয় কপালে নেই।'

বাংলোর সামনে গাড়ি থামার শব্দ পাওয়া গেল। লেপ্‌স্কি গেল দরজা খুলতে। ফিরে এল ডাক্তার লোয়িসকে নিয়ে।

মৃতদেহের দিকে হাত বাড়িয়ে বেগ্‌লার বললে, 'আপাতত সম্পূর্ণ আপনার এক্তিয়ারে।'

লোয়িস চট করে জবাব দিলেন, 'কৃতার্থ হলুম। এখন, তার মানে, দু-খানা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে!'

লেপ্‌স্কির দিকে চোখের ইশারা করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল বেগ্‌লার।

'মন খারাপ করবেন না, ডাক্তার। দুর্ভোগ একা আপনারই নয়।' লেপ্‌স্কিকে বললে, 'চল, একটু ফাঁকায় যাওয়া যাক।'

চলন-পথ পার হয়ে সদর দরজায় এল দুজনে। বাগানে এসে সিগারেট ধরাল।

সামনের বাংলোর দিকে ইশারা করে লেপ্‌স্কি মন্তব্য করলে, 'আশ্চর্য, কেউ গুলির শব্দের কথা রিপোর্ট করেনি!'

'হয়ত ছুটিতে গেছে কোথাও, কেউ নেই। তা ছাড়া সীকম্ব-এর এদিককার বাসিন্দারা ভারি চাপা। আশ্চর্যের কথা জান'? দশ বছর হলো পুলিশে চাকরি করছি, সীকম্ব থেকে কখনও কোনও গণ্ডগোলের খবর আসেনি!'

'একটা কথা মাথায় ঢুকছে না, মাগীটা জনির ওপর ঝাল

ঝাড়তে গেল কেন? আর জনি-ই বা একটা পেঁচি বেশ্যার সঙ্গে ভিড়ল কী করে?'

'ঠিক পেঁচি বেশ্যা নয়। আমি তো দেখেছি। সাজ-গোজ ভালো; সাফ-সুতরো পরিচ্ছন্ন চেহারা। যারা বাজারের মেয়েমানুষের পেছনে ছোটে, তারা অধিকাংশই খুব নোংরা পরিবেশে কারবার চালাতে চায়। কেন চায়, জিগ্যেস কোর না।'

উদ্গত একটা হাই চেপে লেপ্স্কি বললে, 'তা হলে জিগ্যেস করব না। চীফ কেন যে আমায় বিছানা থেকে টেনে তুললেন!'

'ঐ ওরা এল।' রাস্তার দিকে চেয়ে বেগ্লার দেখতে পেলে হেডলাইট জ্বেলে দুটো গাড়ি আসছে। আশেপাশের বাড়িগুলো একের পর এক উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

আরও আধ ঘণ্টা পরে বাংলো থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার লোয়িস। পুলিশ চীফ টেরেল নিজের গাড়িতে বসে আছেন, পাইপ মুখে দিয়ে সাঙ্গপাঙ্গদের রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

লোয়িস বললেন, 'আমার মতে গুলি বিঁধেছে রাত দশটা নাগাদ। হৃৎপিণ্ডে পাঁচটা বুলেট। মোক্ষম টিপ, তবে ফস্কাবার কিছু ছিল না। খাটের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে ছুঁড়েছে। বেলা এগারোটার মধ্যে রিপোর্ট দেব; চলবে তো?'

ঘাড় নাড়লে টেরেল। 'না-চলে উপায় কি, ডক। ঠিক আছে, বেড়িয়ে পড়, একটু ঘুমিয়ে নাও গিয়ে।'

ডাক্তার লোয়িস চলে যাবার পর, বার্ট হ্যামিল্টনকে

বেরিয়ে আসতে দেখা গেল বাংলো থেকে। টেলিফোনে কাগজের আপিসে ঘটনার বিবরণ পাঠাচ্ছিল এতক্ষণ।

টেরেলকে বললে, 'বেশ জমাটি ব্যাপার। কে গুলি করেছে, সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা করতে পারলেন ?'

গাড়ি থেকে নামতে নামতে টেরেল বললেন, 'সেইটাই তো খুঁজে বার করতে হবে। পরে দেখা হবে বার্ট।' তাকে পাশ-কাটিয়ে বাংলোর ভিতরে ঢুকে গেলেন।

হল-ঘরে বেগ্‌লার আর হেস কথা বলছিল।

হেস বললে, 'সব জলের মতো পরিষ্কার স্যার। সাফ কাজ।'

'তাই তো দেখছি। তবে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। তোমরা দুজনে ইস্ট স্ট্রীটে গিয়ে মহিলার বাড়িতে একটু সন্ধান নাও। স্বীকারোক্তিটা তারই হাতের লেখা কি না, মিলিয়ে দেখে নিও। কোনও গণ্ডগোল নেই বলেই মনে হচ্ছে, তবু কোনও সন্দেহ রাখা ঠিক নয়। বাঁটকুলটার সঙ্গে কথা-বার্তা বল। পেটে অনেক খবর আছে। ও-ই হয়তো বলতে পারবে, উইলিয়াম্‌সকে গুলি করে মারার কারণটা কী। বেলা দশটার মধ্যে রিপোর্ট চাই। কাজেই, বেরিয়ে পড় তোমরা।'

গলা দিয়ে একটা কাৎরানি বেরিয়ে আসতে চাইছিল, অতিকষ্টে চেপে রাখলো হেস। 'তাই হবে, চীফ।'

টেরেল শোবার ঘরে ঢুকলেন। দেওয়ালে হেলান দিয়ে লেপ্‌স্কি দুজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে তারা বাক্স গোছাচ্ছে তখন।

টেরেল বললেন, 'টম, খোঁজ করে দেখ, কেউ গুলির শব্দ

শুনেছে কি না। বুলেভার্ড-এর ওপর আশপাশের সমস্ত বাড়িতে খোঁজ! আর উইলিয়াম্‌স-এর সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবরও চাই!'

লেপ্‌স্কি বললে, 'আপনি কি এক্ষুনি যেতে বলছেন, চীফ? তাতে তো কোনও লাভ হবে না। সবে ছটা বেজেছে। পড়শিদের বিছানা থেকে টেনে তোলাটা কি ঠিক হবে?'

মুচকি হাসলেন টেরেল। 'আচ্ছা, আর আধঘণ্টা। এপাড়ার লোকেরা সকাল সকাল ওঠে।' গাড়ির আওয়াজের দিকে কান পেতে বললেন, 'অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়েছে। নাও, যা ব্যবস্থা করবার, কর!' ফিঙ্গারপ্রিণ্ট-এর লোকদের দিকে ফিরে বললেন, 'কিছু পাওয়া গেল?'

একজন বললে, 'গাদা-গাদা ছাপ। কতদিন যে ঘরে ঝাড়-পোঁছ হয়নি, কে জানে। বেশির ভাগই ঐ লোকটার হাতের ছাপ, অন্য ছাপও কিছু কিছু। সবকটাই যাচিয়ে দেখে নেব।'

সদর দরজায় ফিরে গেলেন টেরেল। অ্যাম্বুলেন্স থেকে লোক নামল। কোন্‌ ঘরে লাশ আছে, তার নির্দেশ দিলেন ওদের, তারপর গাড়িতে উঠে রওনা দিলেন পুলিশ হেড্‌-কোয়ার্টারের দিকে।

২

টেরেল যখন সদলবলে লা কোকুইল রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে সীভিউ বুলেভার্ড-এর দিকে রওনা দিলেন, ওদিকে বাসন রাখার ঘরে টিকি এড্রিস তখন পোশাক বদলাচ্ছিল—কাজের সাদা কোটটা খুলে রেখে নিজের ছাইরঙা আলপাকার কোটটা গায়ে চড়াচ্ছিল।

খুটখুট করে দরজার কাছে এগিয়ে এল, একটু ফাঁক করে বার-এর ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিলে।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে লুই আর জ্যাকবি কথা বলছে।

'বাড়ি যাচ্ছি, মিঃ লুই। যাব তো?' এড্রিস-এর আওয়াজ অনেকটা সানাইয়ের মতো।

জ্যাকবির সঙ্গে কথা বলতে-বলতে একবার শুধু হাতের ইসারায় সম্মতি জানাল লুই। বাসন-ঘরে ফিরে এল এড্রিস। খুব তৎপর আর ব্যস্ত এখন সে। কর্মচারীদের জন্যে আলাদা যে দরজা আছে, সিঁড়ি আছে, তাই দিয়ে চটপট নিচে নেমে গেল। যেখানে পৌঁছল, সেটা কর্মচারীদের গাড়ি রাখবার জায়গা। দুটো গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল, প্রায় লাফাতে লাফাতে, দৌড়তে দৌড়তে এগিয়ে গেল সেই দিকে। একটা গাড়ি ছোট—কুপার মিনি; অন্যটা হুড-ওলা বিউইক রোড্-মাস্টার—মাথাটা খোলা।

বিউইক-এর চালকের আসনে বৃষস্কন্ধ একটা লোক

সিগারেট ফুঁকছিল বসে-বসে। মাথায় খয়েরি রঙের স্ট্র-হ্যাট, পরনে ফিকে খয়েরি স্যুট! সাদা সার্টটা নতুনের মতো ঝকঝকে, দামি টাইটা বনেদি। তামাটে মুখে সোনালি চুলের রাশ মানিয়েছে ভালো।

সুদর্শন: বছর আটত্রিশ বয়স হবে। থুৎনির খাঁজটা একটু বেশি গভীর, তাতে ব্যক্তিত্ব বাড়ে, মেয়েদের চোখে পড়ে।

দেখে উঁচুদরের কোনও প্রশাসনিক কর্মচারী, ব্যাঙ্কের কর্তাব্যক্তি, এমন কি উঠতি-রাজনীতিক বলেও ভুল হতে পারে, কিন্তু আসলে ও কোনোটাই নয়। ফিল অ্যাল্‌জার-এর কাজ হলো, তার সম্ভ্রান্ত চেহারা, অসাধারণ বুদ্ধি আর অদ্ভুত আকর্ষণের ফাঁদে ফেলে হ্যাংলা জাতের মানুষদের বোকা বানিয়ে পয়সা রোজগার করা। অ্যাল্‌জার দাগি আসামী, চোদ্দ বছর জেল খেটেছে; একটা গ্রেপ্তারি পরওয়ানা মাথায় নিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে ছুটে এসেছে ফ্লরিডায়। প্যারাডাইস সিটিতে চুপচাপ আছে ও, জাল-জচ্চুরির চেষ্টা করেনি, কারণ জানে, এবার ধরা পড়লে, আবার চোদ্দ বছর ঘানি ঘোরাতে হবে। কাজ নেই, তাই পয়সার টান ধরেছে।

বাইরের ঐ মোলায়েম ভদ্র মুখোশের নিচে একটা প্রচণ্ড নির্দয়তা লুকিয়ে থাকে অ্যাল্‌জারের মধ্যে। আজকের এই রাত অবধি কোনো রকম খুন-জখমের কাজে হাত দিতে হয়নি অবশ্য, দরকার মতো পয়সা কামিয়ে এসেছে। এবার কিন্তু মুখোশ খোলবার সময় এল। বাঁটকুলটার সঙ্গে যে মতলবটা ফেঁদেছে, সেটা যদি ফেঁসে যায়, তা হলে চোদ্দ বছরের কয়েদে

রেহাই পাবে না ; গ্যাস চেম্বারে চেয়ার পাতা থাকবে তার জন্যে। তবে, এড্রিস-এর ওপর, নিজের ওপর ভরসা রাখে ও। কাজটা হাসিল হবেই···হাসিল হতেই হবে।

এড্রিস কাছে আসতেই সিগারেটটা টুসকি মেরে ছুঁড়ে ফেলে বললে, 'তার পর ?'

গাড়ির দরজায় বেঁটে বেঁটে আঙুলের ভর রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে এড্রিস বললে, 'স্বপ্নের মতো তর-তর করে এগিয়ে যাচ্ছে। কোনও হুজ্জুৎ নেই···একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট। তোমার দিকের সব ঠিক আছে তো ?'

'হুঁ।'

'ওরা সব বাংলোয় গেছে। তারপর ইস্ট স্ট্রীটে যাবে। তোমার বরং বেরিয়ে পড়াই উচিত, ফিল। কী করতে হবে, জানই তো।'

'হুঁ।' এঞ্জিনে স্টার্ট দিল অ্যাল্‌জার। 'ও যে আত্মহত্যা করেছে, সেটা নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করেছে তো ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। টেরেল-এর দিকে নজর রেখে যাব। লোকটা বড় চালাক। সাড়ে-সাতটার আগে স্কুলে যেয়ো না যেন।'

'জানি রে, বাবা, জানি। হাজার বার তো পাখি-পড়া করেছি। তুমি তোমার দিক সামলাও, আমার দিকের ভার আমার।'

একটু সরে দাঁড়াল এড্রিস। সামান্য একটু ঘাড় নেড়ে বিউইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অ্যাল্‌জার।

বিউইকের পিছনকার লাল আলোদুটো যখন আর দেখা

গেল না, এড্রিস তখন তার মিনি-তে গিয়ে উঠে বসল। ক্লাচ, ব্রেক আর অ্যাক্সিলেটরের ওপর বেশ পুরু করে কর্ক-এর প্যাড লাগানো, যাতে খেঁটে-খেঁটে পায়ে নাগাল মেলে। পাকা ড্রাইভার এড্রিস, জোরে গাড়ি হাঁকায়। সতেরো বছর গাড়ি চালাচ্ছে, একবারও অ্যাক্সিডেন্ট করেনি।

তাড়াতাড়ি প্যারাডাইস সিটি পার হয়ে এল, হাইওয়ের চওড়া রাস্তায় ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে গাড়ি ছোটালে। কিন্তু ২৪৭ নম্বর সীভিউ বুলেভার্ড-এর কাছাকাছি এসে গতি মন্থর করলে, বাংলোর সামনে-রাখা পুলিশের গাড়িগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে। ইস্ট স্ট্রীট-এ পৌঁছতে আরও দশ মিনিট লাগল। ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে গাড়ি রাখলে, লিফ্‌ট-এ চড়ে একেবারে ওপরতলায় গিয়ে পৌঁছল, তারপর ঢুকে পড়ল তার দু-কামরার ফ্ল্যাটে। গত আট বছরের বাসা তার।

বড় একটা বসবার ঘর, ছোট একটা শোবার ঘর, রান্নার খুপরি আর চানের ঘর। বসবার ঘরটা খুব যত্ন করে সাজিয়েছে, বেছে-বুছে একটি-একটি করে আসবাবপত্র কিনে পরিপাটি ফিট-ফাট একটি বাসা বানিয়ে তুলেছে। একটা চায়ের টেবিলকে খাবার টেবিল হিসাবে ব্যবহার করে; নিজের সুবিধার জন্য তৈরি করিয়ে নিয়েছে ছোট্ট মাপের একটা চেয়ার আর আরাম কেদারা। বাকি আসবাব সব সাধারণ মাপের, কারণ এড্রিস মাঝে-মাঝে বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন করতে ভালোবাসে।

ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় খুলে চান করতে গেল এড্রিস। কিম্ভুত নিরাবরণ দেহটাকে হেলিয়ে-দুলিয়ে ঘুরে-ঘুরে নেচে

ফিরতে লাগল সে চানের ঘরে জলধারার নিচে; গুন-গুন করে গান গাইতে-গাইতে হাতে তাল দিতে লাগল। চান শেষ করে গা মুছল, সোনালি আর নীল ডোরাকাটা পাজামা পরলে, গায়ে চাপালে নীল একটা ড্রেসিং গাউন। বসবার ঘরে গিয়ে ছোট্ট দেরাজটা খুলে মদের বোতল বার করলে। একপাত্তর হুইস্কি ঢাললে, সোডা মেশালে, তারপর গেলাস নিয়ে নিজস্ব আরাম-কেদারায় গিয়ে বসল। ছোট্ট পা-দানিটার ওপর পা তুলে দিলে। একচুমুক খেয়ে গেলাসটা নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরালে। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুধু আয়েস করে লম্বা-লম্বা টান মেরে ধোঁয়া গিলতে লাগল, আর নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। হাতের ছোট্ট মেয়েলি রিস্ট ওয়াচটার দিকে চেয়ে দেখল একবার। ভোর সাড়ে-ছটা। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গ্রেটার মায়ামিতে পৌঁছে যাবে ফিল। যদি কোনও গোলমাল না-হয়, সাড়ে-আটটার মধ্যেই প্যারাডাইস সিটিতে ফিরে আসতে পারবে। সাড়ে-নটার আগে ফিল-এর কাছ থেকে কোনও খবর পাওয়া যাবে না, দশটাও হতে পারে।

হুইস্কির গেলাসটা খালি করে হাই তুললে এড্রিস, সিগারেট দুমড়ে নিবিয়ে দিলে। বিছানায় যেতে পারলে ভালো হয়, কিন্তু গেলেই ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমলে চলবে না। পুলিশ যখন আসবে, তখন ঘুমের আমেজে থাকা ঠিক নয়, বুদ্ধি সাফ রাখা দরকার।

চেয়ার থেকে উঠে দেরাজের কাছে গেল, আর একপাত্তর হুইস্কি নিলে। এড্রিস পাঁড় মদখোর, কিন্তু গেলাস-গেলাস

গিলেও মাতাল হয় না। তবে আজ রাতটায় বড় ধকল গেছে, ক্লান্ত লাগছে। মনে-মনে নিজেকে সাবধান করে নিলে—একসঙ্গে গুচ্ছের খাওয়া ঠিক হবে না। বেশি নিশ্চিন্ত থাকাটা কোনও কাজের কথা নয়।

ধীরে-ধীরে চুমুক মারতে লাগল। গেলাস খালি হতে তখনও বাকি, নিচে সদর দরজায় গাড়ি থামার আওয়াজ পেলে। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখবার আগ্রহটা চেপে রাখলে। পুলিশের চোখে পড়তে পারে। ও যে তাদের জন্যেই অপেক্ষা করে আছে, সেটা গোপন রাখাই দরকার। রান্নাঘরে গিয়ে গেলাসটা ধুয়ে রাখলে। তারপর ফ্ল্যাটের দরজার পাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল।

ফ্ল্যাটবাড়ির জ্যানিটার-এর (দারোয়ান জাতের তত্ত্বাবধায়ক) কাছ থেকে মৃত মহিলার ঘরের চাবিটা যোগাড় করে নিয়েছে বেগ্‌লার। জ্যানিটারকে মহিলার মৃত্যুসংবাদ দিতে, বিশেষ গায়ে মাখেনি সে, কেবল নিস্পৃহভাবে দুবার কাঁধ ঝাঁকিয়েছে। বেগ্‌লার-এর প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছে, মহিলার নাম হলো মার্শ, এ ছাড়া তার সম্বন্ধে আর কিছু জানে না। ভাড়া নিয়মিতই পাওয়া যেত; সকালের দিকে কখনও বাইরে আসত না; বিকেলের দিকে বেরুত, ফিরত অনেক রাত করে। চিঠি-পত্র বিশেষ আসত না, লোকজন আরও কম।

বিরাট একটা হাই তুলে বেগ্‌লার-এর সঙ্গে লিফ্‌টে গিয়ে চড়েছে হেস, ওপরে এসে হাজির হয়েছে।

মহিলার দুকামরার ফ্ল্যাটে ঢুকে ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল

দুজনে। বসবার ঘরটা বেশ আয়েসি ধাঁচের, এক কোণে টেলিভিশন। শোবার ঘরে দুজনের শোবার খাট, জামা-কাপড়ের আলমারি। ড্রেসিং টেবিলের ওপর রুপোলি ফ্রেমে বাঁধানো দুটো ফোটোগ্রাফ : একটা তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের এক সুদর্শন ভদ্রলোকের; অন্যটা ষোল-সতেরো বছরের একটি মেয়ের—সোনালি চুলগুলো সুন্দর করে ছাঁটা। পাৎলা, চোখা গড়ন, খাড়া নাক আর বিস্তৃত ঠোঁটজোড়া মিলিয়ে বেশ চোখে পড়বার মতো চেহারা।

ফ্ল্যাটের দেরাজ আর টানা ঘেঁটে দরকারি বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। কিছু শোধ-না-করা বিল পাওয়া গেল, আর পাওয়া গেল বেশ কিছু চিঠি, যার আরম্ভ : "আদরের মা" আর শেষ : "ভালোবাসা নিয়ো। তোমার নোরিনা।" প্রত্যেক চিঠিরই মাথায় ঠিকানা আছে, গ্র্যাহাম কো-এড কলেজ, গ্রেটার মায়ামি। মৃত মহিলার হাতের লেখার নমুনাও কিছু যোগাড় করেছে হেস, স্বীকারোক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে। এক হাতেরই লেখা।

নোরিনার লেখা কয়েকটা চিঠি পড়ে দেখছিল বেগ্‌লার। মুখ তুলে হেস-এর দিকে চেয়ে বল্লে, 'মহিলার মেয়ে বলে মনে হচ্ছে।' ড্রেসিং টেবিলের ফোটোটার দিকে ইশারা করলে। 'ভারি ফুটফুটে মেয়েটি। বাবা কে, তাই ভাবছি।'

'বাঁটকুলটা বলতে পারে হয়তো। চল না যাই। সামনেই তো ওঁর ফ্ল্যাট।'

বাইরে এসে বারান্দার এপারে এড্রিস-এর ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়াল ওরা। হেস কলিং বেল টিপলে।

একটু পরে দরজা খুলে গেল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উঁকি মারল এড্রিস।

'ও!' একটু সরে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভেতরে আসুন। আমি এই কফি বানাচ্ছিলুম। খাবেন?'

'সে আর বলতে!' জবাব দিয়ে হেসকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল বেগ্‌লার।

হেস বললে, 'শোওনি যে, টিকি?'

'কফি না-খেলে ঘুম আসবে না।' লাফাতে-লাফাতে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল এড্রিস।

'ব্যাটা বেশ সপ্রতিভ, তাই না?' ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল হেস। 'আরে সাবাস! নিজের জন্যে একটা আলাদা আরাম-কেদারা যোগাড় করেছে দেখ!'

'করবে না-ই বা কেন?' সোফার ওপর বসল বেগ্‌লার। 'নিজে যদি বামন হতে? ভেবে দেখছ?'

চুপ করে রইল হেস। ভাবতে লাগল। তারপর কাঁধ ঝাকিয়ে বসে পড়ল।

'ভাববার দরকারটা কী? বামন তো নই।'

কফির সরঞ্জাম সাজিয়ে ট্রে নিয়ে ঘরে এল এড্রিস। তিন কাপ কফি বানালে, হাতে-হাতে তুলে দিলে, তারপর আরাম কেদারায় বসে পা-দানিতে পা রাখলে।

তিনজনেই কফিতে চুমুক দিলে। কফি-রসিক বলে বেগ্‌লারের গর্ব আছে, তাকেও তারিফের ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে হলো।

'চমৎকার বানিয়েছ। একেবারে নিখুঁত।'

এড্রিস হাসল। 'কফির আর কীই বা জানি তবে…'

হেস কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'কফির কথা থাক। ঐ মহিলাটির সম্বন্ধে কী জান, বল তো শুনি। শোবার ঘরে যে ফোটোটা রয়েছে, সে-ই কি ওর স্বামী?'

প্যাঁচটা বড় প্রকট। ধরা দিলে না এড্রিস। 'কী করে বলব। ওর শোবার ঘরে কখনও তো যাইনি।'

খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল হেস। বারান্দা পেরিয়ে ওদিকের ফ্ল্যাট থেকে ফোটো দুখানা নিয়ে এল। এড্রিসকে দিলে।

'লোকটা কে?'

'ওর স্বামী নয়। কয়েক বছর আগে একজনের সঙ্গে পালিয়েছিল, এ সেই লোক। নাম হলো হ্যারি লিউইস। বছর পনের আগে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়।'

'আর, এই ওর মেয়ে?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'কোথায় সে?'

'গ্র্যাহাম কো-এড কলেজ, গ্রেটার মায়ামি।'

'মহিলার স্বামী বেঁচে আছেন?'

'বেঁচে আছেন।'

'কে তিনি।'

'মেলভিল ডিভন।'

'কোথায় থাকেন, জান?'

'প্যারাডাইস সিটিতেই কোথাও। ঠিকানা বলতে পারব না।'

'এই লিউইস লোকটার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল বল্লে না? এরই জন্যে কি স্বামীকে ত্যাগ করেছিল?'

'হ্যাঁ। আমাকে যা বলেছিল, ডিভন-এর সঙ্গে কিছুতেই বনছিল না। ডিভন ভারি গোমড়া লোক, সব সময়ে কাজ নিয়ে পড়ে থাকত। বিয়ের পর তখনও দুবছরও হয়নি, লিউইস-এর সঙ্গে আলাপ হলো ওর। লিউইস-এর টাকা ছিল। তারই সঙ্গে পালিয়ে গেল। সে পনেরো বছর আগেকার কথা। বাচ্চা মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। বাচ্চা-কাচ্চা ভালোবাসত লিউইস। বছরখানেক বেশ সুখেই ছিল ওরা, তারপর লিউইস মারা পড়ল।'

এড্রিস-এর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল হেস। 'ওর মুখ থেকেই শুনেছ এসব?'

'হ্যাঁ। একসঙ্গে, একটানা শুনিনি। যখন খুব মুষড়ে পড়ত, আমার কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসে বসে থাকত। কখনও একটি কথাও বলত না। আবার কখনও কখনও এই হয়তো কথা বলছে, এই চুপ হয়ে যাচ্ছে। লিউইস যখন মরল, একদম টাকা-কড়ি ছিল না ওর হাতে। মিউরিয়েল ডিভোর্স পেলেই ওরা বিয়ে করবে, এই রকম ছকে রেখেছিল। লিউইস মরে যেতে, মেয়েকে একজনের কাছে পুষ্যি রেখে হোটেল রিসেপ্-সনিস্ট-এর চাকরি নিল।' কফিটা শেষ করবার জন্য একটু থামল এড্রিস। কাপে আরও খানিকটা কফি ঢেলে নিয়ে জাগটা বেগ্‌লার-এর দিকে ঠেলে দিলে। 'তারপর কুসংসর্গে গিয়ে পড়ল। একটু-একটু করে নেশায় ধরল, ইঞ্জেক্‌শন নিতে লাগল। হোটেল থেকে দূর করে দিলে। ঘর ভাড়া করবার

পয়সা জোটেনি, তাই রাস্তায়-রাস্তায় খদ্দের জোটাতে লাগল। পুরনো একজন খদ্দের নিজের পয়সায় একটা বাসা করে দিলে। বছর পাঁচেক বেশ ভালোই চলল এই ভাবে। তারপর লোকটা মরে যেতে, আবার মুশকিলে পড়ে গেল। নোরিনাকে··· ওর মেয়ের নাম নোরিনা··· বোর্ডিং স্কুলে দিয়েছিল। ছুটির সময় ছাড়া দেখা হতো না। ঐ হেরয়েনের নেশটা আরও বাড়ল, ওকে পেড়ে ফেললে একেবারে। নিউ ইয়র্ক ছেড়ে এখানে চলে এল। তারপর এল জনি উইলিয়াম্‌স।' একটু থেমে হেস-এর দিকে তাকাল এড্রিস। 'ওকেই বরং জিগ্যেস-পত্তর করে দেখুন, আমার চেয়ে বেশি খবর রাখে।'

আর এক কাপ কফি ঢেলে নিলে হেস। 'উইলিয়াম্‌স বেঁচে নেই। মিউরিয়েল-ই খুন করেছে। তোমাকে বলেনি কেন, টিকি? এত সব কথা তো তোমার কাছে বলত, তাই না? আর, এ কথাটা বললে না যে, লা কোকুইল-এ আসার আগে উইলিয়াম্‌স-এর বুকে পাঁচ-পাঁচটা গুলি ফুঁড়ে দিয়ে এসেছে?'

পাথরের মতো বসে রইল এড্রিস। বড় বড় চোখদুটো ঘোলাটে দেখাতে লাগল। গোরুর মতো ভাসা-ভাসা।

'আমায় বলেনি। বুঝতে পেরেছিলুম, খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু তখন মদে চুর। মাথার ঠিক ছিল না, কিছু বলার মতো অবস্থাও নয়। যাক, ও-ই মারল উইলিয়াম্‌সকে। তা, কাল ঘনিয়েই এসেছিল—বদমাইস, নেমকহারাম শুয়োরের বাচ্চা!'

'ঘনিয়েই এসেছিল কেন টিকি?' বেগলার প্রশ্ন করলে।

'হারামজাদার জন্যে কী করেনি মিউরিয়েল! খরচা দিয়ে রেখেছে, জামাকাপড় কিনে দিয়েছে, বিনা ভাড়ায় থাকতে দিয়েছে। লোকটার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল বেচারি। আর ও ব্যাটা কেবল নিঙ্ড়ে নিঙ্ড়ে দুয়েছে। গত মাস দুয়েক ধরে প্যালেস হোটেলের বুড়িদের পেছনে ঘুর-ঘুর করতে লাগল। বেশ পয়সাওলা একজনকে পটালে। এদিকে মিউ-রিয়েল তখন সর্বস্বান্ত। নেশার মাত্রা এত চড়ে গেছে যে, খদ্দেরও জোটে না। মেয়ের স্কুলের খরচা মেটাতে হয়, তার ওপর নিজের ব্যাবসার ডেরাগুলোর ভাড়া বাকি। জনির হাতে তখন অনেক পয়সা। তার কাছ থেকে টাকা ধার করতে গেল, হেসে উড়িয়ে দিলে।—বড্ড বেশি হেসেছিল বোধ হয়।'

'মেয়েটির খবর কী? মার কীর্তি-কলাপের কথা জানে?'

'না, ছুটিতে দুজনে এখানে থাকত না, বাইরে বেড়াতে চলে যেত। নিজের ফ্ল্যাটে নোরিনাকে আনতে চাইত না। এই ছুটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যাবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু খরচের টাকা ছিল না। জনিও ধার দিলে না।'

'তুমিই তো ওর সবচেয়ে বড় বন্ধু··· তুমি ধার দাওনি, টিকি?'

'নিলে না। দিতে চেয়েছিলুম, নিতে পারলে না।'

'কেন পারলে না? তুমিই তো তার সবচেয়ে আপন জন ছিলে, টিকি?···তোমার কাছেই তো মনের কথা খুলে বলত সব?'

হেস-এর দিকে তাকিয়ে রইল এড্রিস। চোখদুটো পাথরের মতো নিশ্চল। 'বোধ হয় ভাবত, আমিই বেশি করুণার পাত্র।

'আমাকে মানুষ বলে তো ভাবত না। ওর কাছে আমি ছিলুম ...এমন একজন...এমন একটা কিছু...যার সামনে প্রাণ খুলে কথা বলা চলে।'

মুখ মচকালে হেস।

'তোমায় করুণা করত, বলেছে তোমায়?'

'হ্যাঁ।

'আচ্ছা, তুমি তো টাকা জমিয়েছ, টিকি? জমাওনি?'

'জমাবার মতো টাকা তো রোজগার করি না।'

'কেন গুল মারছ? এত ফিচ্লেমি জান, আর বাড়তি বক্শিস জোটে না বলতে চাও?'

বেগ্লার থামিয়ে দিলে। 'ও প্রসঙ্গ বাদ দাও, ফ্রেড। কোনও সুবিধে হবে না।'

'তা হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে মালটি একটি বাস্তু ঘুঘু।' এবার এড্রিস-এর দিকে চেয়ে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'মিউরিয়েল তোমায় এমন কোনও আভাসও দেয়নি, যাতে বোঝা যায় যে, উইলিয়াম্সকে ও-ই খুন করেছে?'

'না।'

চিউয়িংগামের মোড়ক খুলতে লাগল হেস। 'মিউরিয়েল-এর বন্দুক ছিল?'

'মনে হয় না। ও-ই হয়ত খুন করেছে। বলতে পারি না।'

'যে ওকে ঘর ভাড়া করে দিয়েছিল, সে কে?'

'জানি না।'

'তুমি নও তো?'

'না।'

চিউয়িংগামটা মুখে ফেললে হেস, খানিকক্ষণ নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর উঠে দাঁড়াল। 'যথেষ্ট হয়েছে। তোমার মাথায় কিছু আসছে, জো?'

বেগ্‌লারও উঠে দাঁড়িয়েছে। 'না।'

'তবে চল, যাওয়া যাক।'

দুজনে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। আরাম-কেদারাতেই বসে রইল এড্রিস, পা দুটো পা-দানির ওপর তোলা, চোখ-দুটো ওদের দিকে ফেরানো।

দরজার গোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে বেগ্‌লার বললে, 'কফির জন্যে ধন্যবাদ।'

হেস বললে, 'ঝঞ্ঝাট পাকাতে যেও না, টিকি!

দরজা বন্ধ করে চলে গেল দুজনে।

বেশ খানিকক্ষণ চুপটি করে বসে রইল এড্রিস। মাথায় রক্ত চড়ে গিয়ে মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। চোখদুটো চকচক করছে। চাপা রাগের তাড়নায় আরাম-কেদারার হাতলের গায়ে অনবরত আঁচড় কেটে চলেছে কাঠি-কাঠি আঙুলের ডগা দিয়ে।

আরও পরে, হাতঘড়ির কাঁটা যখন সাতটা-পনেরোর ঘরে, তখন উঠে টেলিফোনের কাছে গেল। নম্বর ঘোরালে। সাড়া পাবার আগে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে।

মেয়ে-গলায় আওয়াজ এল, 'গ্র্যাহাম কো-এডুকেশনাল কলেজ থেকে বলছি।

'ডক্টর গ্র্যাহামের সঙ্গে কথা বলতে চাই। জরুরি।'

'কে কথা বলছেন?'

'আমার নাম এড্ওয়ার্ড এড্রিস। নোরিনা ডিভন-এর ব্যাপারে কিছু কথা আছে···নোরিনা আপনাদের ওখানকার ছাত্রী। ভীষণ জরুরি ব্যাপার।'

'ধরুন দয়া করে।'

সিগারেটে লম্বা একটা টান মেরে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লে এড্রিস। একটু সময় গেল। তারপর পুরুষ-কণ্ঠের আওয়াজ এল, 'ডক্টর গ্র্যাহাম কথা বলছি।'

'ডক্টর, আমি হচ্ছি এড্ওয়ার্ড এড্রিস। ডিভন-পরিবারের বন্ধু। নোরিনা আমায় চেনে। একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ওর মা খুব গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন।'

'খুব দুঃখের কথা। আপনি আমায় কী করতে বলেন, মিঃ এড্রিস?'

'দয়া করে নোরিনাকে খবরটা জানিয়ে দেবেন? কতটা গুরুতর, সে কথা না-হয় না-ই বললেন। শুধু বলবেন, অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। শুনুন, ডক্টর গ্র্যাহাম, আরও একটা ব্যাপার হলো, মিঃ ডিভন-এর অ্যাটর্নি, মিঃ স্ট্যান্লি টেবেল ঠিক এই মুহূর্তে গ্রেটার মায়ামিতেই রয়েছেন, মানে আপনাদের কাছাকাছি। ওঁর সঙ্গে আগেই কথা বলেছি। উনি এক্ষুনি প্যারাডাইস সিটিতে ফিরে আসছেন। তাই, আসবার সময়ে নোরিনাকে তুলে আনতে রাজিও হয়েছেন। এতে সময় বাঁচবে। ওর মা কেবলই ওকে দেখতে চাইছেন।' একটু থামল এড্রিস। বুঝলে, ভেতরে-ভেতরে বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কথার আসল প্যাঁচটা ঝাড়া হয়ে গেল। গ্র্যাহাম কাৎ হবে, না বেগড়বাঁই করবে?

'মিঃ···কী নাম বললেন?' বেশ খানিকটা বাদে কথা বললেন ডক্টর গ্র্যাহাম।

'স্ট্যান্‌লি টেবেল।'

'নোরিনা কি ভদ্রলোককে চেনে?'

'জানে নিশ্চয়ই। তবে কখনও দেখেছে কিনা বলা শক্ত। দেখুন, ডক্টর গ্র্যাহাম, আপনি কী ভাবছেন, বুঝতে পারছি। অচেনা লোকের সঙ্গে সতেরো বছরের একটা মেয়েকে পাঠাতে মন চায় না, ঠিকই। আপনি নোরিনার ব্যাপারে যে এতটা সাবধান হতে চাইছেন, সেটা তো স্বস্তির কথা। কিন্তু ব্যাপারটা এতই গুরুতর যে কী বলব, ভেবে পাচ্ছি না। খোলাখুলি বলতে গেলে, নোরিনার মা মৃত্যুশয্যায়। দেখুন, আমি বলি কি, নোরিনাকে খবরটা দিন, বলুন, আমি টেলিফোন করেছিলুম···আমায় খুব চেনে। আমায় টেলিফোন করুক ও, তখন মিঃ টেবেল-এর ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে বলে দেব। আমার টেলিফোন নম্বর হলো, সীকম্ব ৫৫৬।'

আবার খানিকক্ষণ বিরতি। তারপর ডক্টর গ্র্যাহাম-এর কথা ভেসে এল, 'তার আর দরকার নেই, মিঃ এড্রিস। মিঃ টেবেল এলেই নোরিনা যাতে তাড়াতাড়ি ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারে, সেই ব্যবস্থা করছি। খুব দুঃখ পেলাম খবরটা শুনে।'

'ধন্যবাদ ডক্টর।'

'আধ ঘণ্টার মধ্যেই নোরিনা তৈরি থাকবে। শুভেচ্ছা নিন, মিঃ এড্রিস।' লাইন কেটে দিলেন ডক্টর গ্র্যাহাম।

টেলিফোন নামিয়ে রাখলে এড্রিস। বদমাইসি-মাখানো'

একটা ধূর্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। তারপর হঠাৎ উদ্দাম-উল্লাসে নাচতে শুরু করে দিলে—খেঁটে-খেঁটে পাদুটো প্রবল আবেগে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে লাগল, তালে-তালে চাপড় মারতে লাগল দুহাতে।

ডক্টর উইলবার গ্র্যাহাম বেশ লম্বা, মাথার চুল পাৎলা হয়ে এসেছে, সর্বদা একটা ব্যস্ত-সমস্ত-বিপর্যস্ত ভাব। পিছনে হাত রেখে অফিস-ঘরে অস্থির চরণে পায়চারি করছিলেন। কলেজের এই মরসুমটা শেষ হতে আর তিনটে দিন মাত্র বাকি, হাতে অনেক কাজ, কিন্তু নোরিনার এই শোচনীয় ব্যাপারটার একটা গতি না-করে নিশ্চিন্ত মনে কাজেও বসা যাচ্ছে না।

নোরিনার সঙ্গে দেখা করে খবরটা দেওয়া হয়ে গেছে। তার মার অ্যাটর্নি এক্ষুনি এসে পড়বেন, এবং তাকে মার কাছে নিয়ে যাবেন সে কথাও জানিয়ে দিয়েছেন।

নোরিনা খুব যে একটা সুন্দরী, তা নয়। নীল প্ল্যাস্টিক-ফ্রেমের চশমা পরে, রঙটাও একটু চাপা। তবে, গড়ন-পেটন ভালো, একমাথা সোনালি চুল—যত্নও নেয়।

'মা কি—মা কি, বাঁচবে না?' নোরিনা জিগ্যেস করেছিল।

'খুবই জখম হয়েছেন, নোরিনা। মুষড়ে পোড় না। প্রাণের আশঙ্কা থাকলে মিঃ এড্রিস কি আর বলতেন না, তবে অবস্থা খুব ভালো নয়, ঠিকই।' পুরো সত্যি কথাটা বলতে পারেননি ডক্টর গ্র্যাহাম।

মিঃ টেবেল-এর আসার খবর দিলে পরিচারিকা। পায়চারি করতে করতেই গ্র্যাহাম বললেন, 'সোজা এখানে নিয়ে এস।'

খড়ের টুপিটা হাতে ধরে ঘরে ঢুকল অ্যাল্‌জার। দুঃখ, সমবেদনা, হৃদ্যতা আর আশ্বাসের নিখুঁত অভিব্যক্তি তার মুখে···ডক্টর গ্র্যাহামের বড় ভালো লাগল। অ্যাল্‌জার-এর পোশাক-পরিচ্ছদও বেশ রুচিসম্মত লাগল তাঁর কাছে। হ্যাঁ, সত্যিকারে দায়িত্বশীল লোক, মুখ দেখলেই বোঝা যায়, বিশ্বাস করা চলে।

উদাত্ত পুরুষালি গলায় অ্যাল্‌জার বললে, 'এত সকালে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি, তার জন্যে ক্ষমা করবেন।' মুখে ঈষৎ একটা ম্লান হাসি ফুটিয়ে তুললে। 'কলেজ বন্ধ হতে মাত্র কয়েক দিন বাকি, বুঝতেই পারছি, কাজের কত চাপ এখন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের কথা, এমন একটা জরুরি ব্যাপার যে, সঙ্গে-সঙ্গে চলে আসাটাই, মনে হলো, উচিত।'

চেয়ারের দিকে হাত দেখালেন ডক্টর গ্র্যাহাম। 'তা তো বটেই। বসুন। মিসেস ডিভন-এর অবস্থা কেমন?'

চেয়ারে বসে মাথা নাড়লে অ্যাল্‌জার।

'খুবই খারাপ। খবরটা কি দিয়েছেন নোরিনাকে?'

'হ্যাঁ, দেওয়া হয়ে গেছে। বুঝতেই পারছেন, খুব আঘাত পেয়েছে। তবে, একেবারে চরম অবস্থাটার কথা এখনও জানাইনি।'

'চরম খারাপটাই হবার সম্ভাবনা বেশি। আমাদের কিন্তু তাড়াতাড়ি করা দরকার। এমনিতেই দেরি হয়ে গেল বোধ হয়।'

'এতক্ষণে নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে গেছে।' ডক্টর গ্র্যাহাম বেল বাজালেন। মিসেস ডিভন আছেন কোন্ হাসপাতালে?'

এ প্রশ্ন উঠবে, জানত অ্যাল্‌জার। বিনা দ্বিধায় বলে উঠল, 'জানি না। এত তাড়াহুড়া হলো। বলতে ভুলেই গেলেন মিঃ এড্রিস। আমি ভাবছি আগে সোজা ওর বাসাতেই যাব, সেখান থেকে হাসপাতালে। আপনি যাতে খবর পান, আমি নিশ্চয়ই দেখব ডক্টর।'

দরজায় পরিচারিকা এসে দাঁড়াল।

গ্র্যাহাম বললেন, 'নোরিনাকে খবর দাও, আমরা তৈরি।'

পরিচারিকা চলে যেতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে বিরাট জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল অ্যাল্‌জার। গ্র্যাহাম-এর মনটাকে অন্য দিকে ফেরাতে হবে, যাতে মুশকিলে ফেলার মতো আর কোনও প্রশ্ন করে না-বসেন। জানলা দিয়ে বাইরের বাগানের দিকে তাকালে।

'চমৎকার জায়গাটি আপনাদের ডক্টর। ভারি আনন্দ হলো দেখে। প্রায়ই মক্কেলরা ভালো কোনও ইস্কুলের খোঁজ করে আমার কাছে, মেয়েদের ভর্তি করবে। আপনার এই কলেজের কথা বলব এবার থেকে। খুশি হয়েই বলব।'

উদ্ভাসিত হলেন ডক্টর গ্র্যাহাম। 'ধন্যবাদ, মিঃ টেবেল্স, ভারি আনন্দের কথা। কয়েক কপি প্রস্‌পেক্টাস দেব না কি, সঙ্গে রাখবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

ছাপা কয়েকটি পুস্তিকা তুলে দিলেন গ্র্যাহাম তার হাতে, অ্যাল্‌জার নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগল।

খানিক বাদে দরজায় টোকা পড়ল। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন গ্র্যাহাম।

'এস নোরিনা। মিঃ টেবেল এসে গেছেন।'

সতেরো বছরের মেয়ে নোরিনা ঘরের ভিতর ঢুকে এসে দাঁড়াল। চশমার কাচের মধ্যে দিয়ে তার চোখদুটো দেখা যাচ্ছে লাল আর ফোলা। বড় ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে, তবে একেবারে ভেঙে পড়েনি। অ্যাল্‌জার যখন তার দিকে এগিয়ে এল, কোনও রকমে একটু হাসি টেনে আনলে ঠোঁটে।

হাত বাড়িয়ে অ্যাল্‌জার বললে, 'আগে কখনও আমাদের দেখা হয়নি, নোরিনা। বেশ কিছু দিন ধরেই তো তোমার মায়ের বৈষয়িক ব্যাপার দেখা-শোনা করে আসছি; প্রায়ই তোমার কথা বলেন। এই রকম একটা দুর্ঘটনার সূত্রে প্রথম দেখাটা না-হলেই ভালো হতো।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মিঃ টেবেল।' নোরিনা মুখ ফেরালে, প্রাণপণে মনের আবেগ ঢাকা দিতে চেষ্টা করলে।

গ্র্যাহাম-এর দিকে ফিরে অ্যাল্‌জার বললে, 'আমরা তা হলে বেরিয়ে পড়ি। খবর পেলেই আপনাকে ফোন করব।' নোরিনার দিকে ফিরে বললে, 'বাইরে গাড়ি রেখে এসেছি। তুমি এগোও।'

নোরিনার হাতদুটো ধরলেন গ্র্যাহাম।

'এস, নোরিনা। চিন্তা কোর না। সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখ। অমন কতই তো হয়।'

'বিদায়, ডক্টর। ধন্যবাদ···' ঘুরে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল নোরিনা।

অ্যাল্‌জার জিগ্যেস করলে, 'জিনিসপত্তর সব বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেছে? আর তো আসবে বলে মনে হয় না। এইটাই তো ওর শেষ বছর?'

'এটাই শেষ বছর। সুধু একটা ব্যাগ নিয়েছে। বাকি যা আছে, বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব।'

'খুব ভালো। আমি চলি। ভগবান করুন…'

দুজনে করমর্দন করলেন। অ্যাল্‌জার বাইরে বেরিয়ে তার বিউইক-এ চড়ে বসল নোরিনার পাশে। কলেজের চৌহদ্দি পেরিয়ে গাড়ি এসে পড়ল মেন স্ট্রীটে।

গ্রেটার মায়ামির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালাল খুব সাবধানে, খুব সতর্কতার সঙ্গে। পা নিশপিশ করছে অ্যাক্সিলেটরের ওপর, কিন্তু তা করলে চলবে না। হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বা বে-আইনি হলেই এত সাধের মতলবটা, এত বিরাট ঝুঁকির ফন্দিটা, এত প্রচুর টাকার কাজটা ভেস্তে যেতে পারে।

ফ্লরিডা কী-এর রাস্তায় ছুটে চলেছে বিউইক ট্রাকের ভিড় কাটিয়ে, নোরিনা তখন প্রথম কথা বললে। আমতা-আমতা করে জিগ্যেস করলে, 'মিঃ টেবেল, মার কি সত্যিই খুব বেশি লেগেছে?'

'অবস্থা মোটেই ভালো নয়, নোরিনা। ভেবে লাভ কী? আমাদের তো এখন করবার কিছু নেই।'

'গাড়ি চাপা পড়েছেন, তাই না?'

'ঠিক বলেছ। ফুটপাথ থেকে রাস্তায় পা দিতে-না-দিতেই…। ড্রাইভার গাড়ি থামাবার সময়ই পায়নি।'

'মা কি…তখন নেশা করেছিলেন?'

'নেশা ? এ কী কথা ? নিজের মা সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বলা উচিত নয়, নোরিনা।'

'মা আমার কতখানি, তা অপনি বুঝবেন না, মিঃ টেবেল।' নোরিনার কথার সুরে কুঁকড়ে গেল অ্যাল্‌জার। 'ওঁর অবস্থা আমি বুঝি। ওঁকে যে কত দুঃখ সইতে হয়েছে, সব জানি। আমার জন্যেই নিজেকে ফতুর করে দিয়েছেন। আমি জানি, উনি মদ খেতেন। বলুন, মা-কি তখন নেশা করেছিলেন ?'

অস্বস্তিতে নড়ে বসল অ্যাল্‌জার। শেষ পর্যন্ত কোনও রকমে বললে, 'না। শোন, নোরিনা, আমার মাথায় এখন অনেক ভাবনা। একটা কেস নিয়ে বড্ড ভাবনায় পড়েছি। চুপচাপ বসে থাক তো। সুধু-সুধু চিন্তা কোর না। যত তাড়াতাড়ি হয়, তোমায় মার কাছে পৌঁছে দেব···ঠিক আছে ?'

'আচ্ছা। আমাকে নিয়ে মুশকিলে পড়তে হচ্ছে আপনাকে, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি।'

আবার চমকে উঠল অ্যাল্‌জার। বড়-বড় হাতের থাবায় স্টিয়ারিংটা আরও শক্ত করে চেপে ধরল। মেয়েটার কিছু জানতে চায় না সে—তার প্রকৃতি, তার মন, কিছু নয়। অপরিচয়ের ব্যবধান থাক। জনি উইলিয়াম্‌স-এর মতন অপরিচিত, দূরের মানুষ হয়ে থাক। জনি উইলিয়াম্‌স অপরিচিত দূরের মানুষ ছিল, তাই শোবার ঘরে ঢুকে তার বুকে পর পর পাঁচটা গুলি মারতে কোনও দ্বিধা হয়নি। একটা খড়ের পুতুলের বুকে গুলি মারার মতোই সোজা হয়েছিল কাজটা। মেয়েটার বেলায়ও যেন তাই হয়। যদি প্রাণ খুলে

কথা বলে, যদি মনে কোনও আঁচড় কাটে, হাঁত কাঁপবে। দু-একটা কথা যা বলেছে, তাতেই কেমন কেমন লাগছে। মুখের ওপর ঠাণ্ডা একটা ঘামের আস্তরণ জমে উঠেছে বুঝতে পারছে অ্যাল্‌জার, বুঝতে পারছে, বুকের ভিতরটায় গুড়গুড় করে উঠল।

মায়ামি ছাড়িয়ে 4A-র চওড়া হাইওয়েতে এসে পড়েছে এবার। সামনের ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে, ঝুঁকে বসে গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে।

রাতের প্লেনটা নিউ ইয়র্ক থেকে মায়ামি এয়ারপোর্টে নামল একেবারে ঘড়ি ধরে। যাত্রীরা যখন বিশ্রামকক্ষে এসে জড়ো হলো, সেখানকার দেওয়াল-ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাড়ে-সাতটা।

যাত্রীদের মধ্যে আছে সতেরো বছরের একটি ছিপছিপে মেয়ে। মুখটা বেশ পাৎলা, চোখা গড়নের, খাড়া নাক, বিস্তৃত ঠোঁট—চোখে পড়ার মতো। মাথায় সাদা স্কার্ফ, কালচে সবুজ সোয়েডের জ্যাকেট গায়ে, টান-টান কালো প্যাণ্টের পাদুটো জুতোর ভিতর অবধি চলে গেছে, গলায় আর একটা সাদা স্কার্ফ গেরো দিয়ে বাঁধা। বক্ষবন্ধনীর দৌলতে বুকের ডৌলটা উদ্ধত। অনুশীলিত গতিছন্দের তাড়নায় তার নিটোল, সুসংবদ্ধ শ্রোণীপিণ্ডদুটোর উত্থান-পতন বিশ্রামকক্ষের সকলকেই চকিত করে তুলেছে।

নিজের সম্বন্ধে ভারি সজাগ। লাল পুরুষ্টু ঠোঁটের ফাঁকে

একটা সিগারেট ঝুলিয়ে রেখেছে, নীল চোখে ইস্পাতের দৃঢ়তা, পুরুষদের লুব্ধ দৃষ্টির জবাবে অবজ্ঞা মেশানো একটা নির্মম আস্ফালন ঝিলিক দিয়ে উঠছে সে চোখের দৃষ্টিতে।

মিউরিয়েল মার্শ ডিভন-এর সবচেয়ে ছোট বোন, ইরা মার্শ মানুষ হয়েছে ব্রুকলিন-এর বস্তিতে। মিউরিয়েল ওর চেয়ে বাইশ বছরের বড়। ইরা জন্মাবার আগেই বাড়ি থেকে চলে যায়, সেই থেকে কোনও সম্পর্ক নেই। ইরার মা এগারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, ইরাই শেষ। নেশায় বুঁদ হয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে মারা পড়েছে, চারটি ছেলে। ব্যাঙ্ক-ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাবজ্জীবন জেল খাটছে আর দুজন। মিউরিয়েল-এর মতো আরও তিনটি মেয়ে সোজা বস্তি ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে—একদম দেখাশোনা নেই, খবরও রাখে না কেউ।

টিকি এড্রিস-এর সঙ্গে মোলকাৎ না-হলে ইরা জানতেই পারত না যে, তার বড় বোন বেশ্যাবৃত্তি আর হেরয়েন-এর নেশা নিয়ে এখনও বেঁচে আছে। দিদির বেঁচে থাকা না-থাকায় যে তার কিছু যায়-আসে, তা নয় অবশ্য। ভাই-বোনদের জন্য তার আর কীই বা মাথাব্যথা। বাবারই বা কী ধার ধারে। এমন লোচ্চা লোক যে, ইরাকেও তার ভয়ে দরজায় খিল দিয়ে রাখতে হয়।

মাস চারেক হবে, ওদের বস্তিবাড়ির সামনে সন্ধ্যার দিকে লাল রঙের কুপার মিনি গাড়ির ভিতর একটা বামন চুপচাপ বসে ছিল।

পাবলিক বাথ-এ প্রসাধন সেরে ফিরছিল তখন ইরা। গরম জলে ঘণ্টাখানেক তার সুকুমার দেহটিকে ডুবিয়ে তাজা করে নিয়েছে, মাথা ঘষেছে, রবিবারের রাত্তিরের হুল্লোড়ের জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ তৈরি করে নিয়েছে।

ইরাকে দেখেই বামনটা সুড়ুৎ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে খয়েরি রঙের একটা স্পোর্টস জ্যাকেট, ছাইরঙা ফ্লানেলের প্যান্ট, মাথার ক্যাপটা কায়দা করে ডান চোখের ওপর নামানো।

'তুমি যদি ইরা মার্শ হও, একটু কথা বলতে চাই।' মুখে উজ্জ্বল হাসি, চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি।

ভুরু কুঁচকে দৃষ্টি নামিয়ে বামনটার দিকে তাকাল ইরা। 'রাস্তা ছাড়, বুড়ো আঙলা কোথাকার। যার-তার সঙ্গে কথা বলা আমার ধাতে নেই।'

খিলখিল করে হেসে উঠল এড্রিস। 'তোমার বোন, মিউরিয়েল-এর কথা বলব। সবেতে অমন মুখ ফ্যাঁচকাতে নেই, সোনামণি। মিউরিয়েল আমার বিশেষ বন্ধু।'

বস্তিবাড়ির বারান্দা থেকে ইতিমধ্যেই মেয়েরা 'উঁকি মারতে আরম্ভ করেছে। বাচ্চারা খেলা ফেলে ওদের চারি-দিকে ভীড় জমাতে শুরু করেছে, বামনটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ফোড়ন কাটছে।

ভাবতে সময় লাগল না। বড় বোনের নামটাই জানা আছে কেবল। হঠাৎ আরও কিছু জানবার ইচ্ছা হলো। গাড়িতে উঠে পড়ল ইরা, পিছনের আসনে গিয়ে বসল।

এড্রিস খুটখুট করে এগিয়ে এল সামনের দরজার দিকে, স্টিয়ারিং হাতে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে। ছেলেপিলেদের হৈ-হল্লা ক্ষীণ হতে-হতে মিলিয়ে গেল এক সময়ে।

'আমার নাম টিকি এড্রিস। একটা কাজের মতলব ছকেছি, তাতে তোমার আমার দুজনেরই কিছু অর্থাগম হতে পারে।' গাড়ি চালাতে চালাতে বলে উঠল এড্রিস।

'তা, আমায় কেন?' পিছনের আসনে ঝুঁকে বসল ইরা। 'আমার সম্বন্ধে কিছুই তো জান না। আমায় কেন?'

'তোমার সব জানি, কিছু বাকি নেই।' ঘাড় ঘুরিয়ে বললে এড্রিস। একটা ফাঁকা জায়গা দেখে গাড়ি থামালে।

মাসখানেক আগে, দুঃখের পাঁচালি শোনাবার সময়ে মিউরিয়েল তার এই সবছোট বোনটির কথা পেড়েছিল। 'ভাবতে পার, চোখে পর্যন্ত দিখিনি! আমাদের আগেকার বাসার এক পুরনো পড়শির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তাই, না হলে জানতেই পারতুম না যে, আরও একটা বোন জন্মেছে আমার! ভাবতে পার! আমার মেয়ের বয়সী একটা বোন রয়েছে, অথচ জীবনে চোখে দেখিনি!'

এই অসংলগ্ন কথাটাতেই কাজ হয়েছিল। যে মতলবটা হাসিল হওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল এতদিন, তা সম্ভব বলে মনে হয়েছিল এড্রিস-এর কাছে। নিউইয়র্ক-এর এক সন্ধানী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে। ইরা মার্শ নামে সতেরো বছরের একটি মেয়ে সম্বন্ধে যাবতীয় খোঁজ খবর নিতে বললে। দুশো ডলারের বিনিময়ে সেখান থেকে যে পাঁচ পাতার রিপোর্ট পেলে এড্রিস, তাতেই প্রয়োজনীয় সব খবরই পেয়ে

গেল সে ; নির্দ্বিধায় বুঝতে পারলে, মেয়েটিকে হাতে পেলে, সামলে-সুমলে চালাতে পারলে, কোনও সমস্যাই আর থাকে না।

রিপোর্ট থেকে আরও জেনেছে এড্রিস যে, ইরা মার্শ বেশ ডানপিটে জাতের মেয়ে। পুলিশের খাতায় অপরাধী বলে চিহ্নিত, কিন্তু বরাবরই বুদ্ধি করে আইনের হাত এড়িয়ে এসেছে। ক্রেতা সেজে দোকান থেকে মাল হাতাতে এক নম্বরের ওস্তাদ। মোকাসিন বলে মস্তানদের একটা দল আছে, তাদের সঙ্গে আঁতাত। পনের-কুড়ি বছরের দাঙ্গাবাজ ছোকরাদের এই দলটার অত্যাচারে পাড়ায় টেঁকা দায়, প্রতিদ্বন্দী অন্য দল বা পুলিশের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। মোকাসিন-এর সর্দারের নাম হেস ফার, আঠারো বছরের একটা বদমাইস ছোঁড়া, অনেক রক্তগঙ্গা বইয়ে দলের অবিসম্বাদিত নেতার পদে কায়েম হয়েছে। রিপোর্টে বলছে, মাস ছয়েক আগে ফার-এর সঙ্গে লেয়া ফেল্চার বলে একটা মেয়েকে সব সময়েই লেপটে থাকতে দেখা যেত। ফার-এরই সমবয়সী, ডাঁটো, পুরুষ্টু, জোয়ান চেহারার চটকদার মেয়ে ; ফার-এর বাঁধা মেয়েমানুষ হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দী বলে মনে করত নিজেকে। ইরা ভেবে দেখলে, ফারকে ওর চাই, ফেল্চার-এর জায়গাটা দখল করতে হবে। একটা বিরাট গুদোমের মাটির নিচের ঘরে ওদের লড়াই হয়েছিল। দলের যত ব্যাটাছেলের সামনে কোমর পর্য্যন্ত অনাবৃত করে, ফারকে বাজি রেখে লড়াই করেছিল ইরা আর ফেল্চার। নোখ, দাঁত আর ঘুষির ঝড় বইয়ে দিয়ে যে নির্মম কাণ্ডটা ঘটেছিল

সেদিন, তেমন রক্তারক্তি ব্যাপার দলের ছেলেরাও আগে কখনও দেখেনি।

ইরা জানত, ফারকে পেতে হলে লড়ে যেতে হবে, তাই আগে থেকে তালিম নিয়ে রেখেছিল। সপ্তাহ তিনেক নিয়মে থেকেছে, ঘড়ি ধরে মুলিগান-এর আখড়ায় গেছে, সেখানকার ওস্তাদ এক পুরনো মুষ্টিযোদ্ধার কাছে নানান রকমের সব চোরাগোপ্তা মারের প্যাঁচ শিখে নিয়েছে। জিতে যে যাবেই, আগে থেকেই জানত।

ফার-এর সঙ্গিনী হিসাবে ক্রমেই দলের কাজে-কর্মে সামিল হয়ে যেতে লাগল ইরা। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ে কাছে-কাছে থাকত, ছেলেদের চেতিয়ে তুলত। অন্য দলের সঙ্গে খুব বেশি দিন গোলমাল না-বাধলে, ঝগড়া পাকাবার জন্য টোপের কাজ করত।

রিপোর্টের শেষে লেখা ছিল :

"মেয়েটি অতি ধূর্ত, বুদ্ধিমতী, দুশ্চরিত্র, স্বার্থপর, আর বিবেকহীন। আমাদের চরের মতে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কোনও কাজেই সে পেছপা নয়।

গুণের মধ্যে, মেয়েটির সাহস আছে, মনের জোর আছে, আর হিসাবের মাথাটা বেশ সাফ। যখনই পয়সার টানাটানি পড়ে—খুব কমই পড়ে—তখনই জো স্লেসার বলে একজন পেশাদার হিসেব-লিখিয়ের কাছে ঠিকে কাজ করে। স্লেসার তার কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। স্লেসার-এর কাজ থেকে নানান ধরণের গণনাযন্ত্র আর কম্পিউটার চালাতে শিখেছে ইরা।"

ইরাকে দিয়ে যে-কাজ হাসিল করতে চায় এড্রিস, কাগজে কলমে তার পক্ষে আদর্শ বলেই মনে হয়েছে তাকে রিপোর্ট পড়ে। মিনি কুপার-এ বসে বসে মেয়েটার চটকদার মুখের দিকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে আরও নিশ্চিত হলো এড্রিস।

বল্‌লে, 'তোমার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়েছি, সোনামণি। খবর যা পেয়েছি, খুশি হবার মতো। কিছু পয়সা কামাতে চাও ?'

এড্রিস যেমন ইরাকে লক্ষ্য করেছে, ইরাও তেমনি সারাক্ষণ খুঁটিয়ে যাচাই করেছে এড্রিসকে—যখন গাড়ি চালাচ্ছিল, তখন, আর এখন যে বসে কথা বলছে, এখনও। লোকটার কথার দাম আছে বলে মনে হলো।

বললে, 'সেটা নির্ভর করছে দুটো ব্যাপারের ওপর : কত পাব, আর পেতে গেলে কী করতে হবে।'

স্টিয়ারিং-এর গায়ে বেঁটে-বেঁটে আঙুলের টোকা মারতে-মারতে মুচকি হাসলে এড্রিস। 'ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া খেলতে আপত্তি আছে ?'

'হয়তো নেই।'

'কত টাকা চাও ?'

'যত পাওয়া যায়।'

'তা বলিনি। কখনও টাকার স্বপ্ন দেখছ ? আমি দেখি। সব সময়ে টাকার স্বপ্ন দেখি। তুমি দেখ না ?'

'তা দেখি হয়তো।'

'কত টাকার স্বপ্ন দেখ।'

'তুমি যা দিতে পারবে, তার চেয়ে ঢের বেশি।'

'তবু, কত?'

'দশ লক্ষ ডলার।'

'ব্যাস? ওতেই শেষ?' খিলখিলিয়ে উঠল এড্রিস। 'এক কোটি নয় কেন…, দু কোটি নয় কেন?'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিলে ইরা। 'ইয়ার্কি থাক। দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ি ফেরা দরকার। বেরুতে হবে।'

খুব শান্ত গলায় এড্রিস বললে, 'ধর, তোমায় এমন একটা রাস্তা দেখিয়ে দিলুম, যাতে পঞ্চাশ হাজার ডলার হাতে আসে। ঝুঁকি নিয়ে নামতে সাহস হয়?'

'কিসের ঝুঁকি। কী আছে আমার, যে খোয়া যাবে?'

'আছে। আমারও যা খোয়া যাবার আছে, তোমারও তাই আছে। আমি ঝুঁকি নেব। তুমি নেবে কি না, সেটা নির্ভর করছে, তোমার ঝুঁকির দরটা কত। পঞ্চাশ হাজার ডলার দরটা মন্দ কী? ঝুঁকিটাও মারাত্মক কিছু নয়, তবে, আছে। ঝুঁকিটা তোমার স্বাধীনতার, সোনামণি, তোমার স্বাধীন জীবনের। আমারও ঝুঁকি সেইটাই।'

'আমার স্বাধীন জীবনের মুল্য যে পঞ্চাশ হাজার, সে হিসেবটা পেলে কোথা থেকে? আমার স্বাধীনতা?' হেসে উঠল ইরা। 'অত টাকার জন্যে সব কিছু করতে পারি।'

হাসির আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়ার পরেও এক চিলতে তিক্ত বঙ্কিম রেখায় কুঁচকে রইল ইরার ঠোঁটের কোণদুটো। ভালো করে লক্ষ্য করলে এড্রিস, খুশি হলো।

'টাকাটা তোমায় রোজগার করে নিতে হবে সোনামণি, ফালতু পেয়ে যাবে, ভুলেও ভেব না যেন। বিশেষ একটা কাজ

ঠিক করে রেখেছি তোমার জন্যে, কিন্তু টাকাটা যেন সত্যিই তোমার পাওনা হয়।'

'কী করলে পাওনা হবে?'

'সেটা ভাঙবার আগে, পেছনের কথা একটু বলে নেওয়া দরকার।'

সেই সূত্রেই ইরা প্রথম শুনেছে তার দিদির কথা, দিদির বিয়ের কথা ; জেনেছে বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার কথা, আর, শেষ পর্যন্ত রাস্তায়-রাস্তায় খদ্দের ধরে বেড়ানোর কথা।

এড্রিন বলেছে, 'তোমার দিদি হেরয়েন-এর গোলাম হয়ে পড়েছে। ওকে আর ফেরানো যাবে না। কিচ্ছু করবার নেই। আর মাস চারেকের মেয়াদ···তার বেশি নয়। টুপ করে মরে যাবে।'

সামনে ঝুঁকে হাঁটুর ওপর কনুয়ের ভর দিয়ে দুহাতের ওপর থুঁৎনি রেখে শুনছিল ইরা। নীল চোখের আচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে একাগ্রমনে শুনেছিল। হেস ফার-এর কথা ভুলে গিয়েছিল, ভুলে গিয়েছিল রবিবারের এই সন্ধ্যার হুল্লোড়ের কথা। সব ভুলে গিয়েছিল, সুধু টের পাচ্ছিল একটা সরু গলার ফিসফিসে আওয়াজ তার কানে কী এক ভীষণ মন্ত্র শুনিয়ে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত ইরাকে কী করতে হবে, সেই প্রসঙ্গে ফিরে এল এড্রিন। প্রথমে মনে হলো সিনেমার গল্পের মতোই অবাস্তব, মনে-মনে ভেবে নিলে, লোকটা পাগল। কিন্তু যতই আলোচনা করতে লাগল, বুঝতে পারলে, মতলবটা নেহাৎ

অসম্ভব নয়, আর হাসিল করতে পারলে, সত্যিই টাকা আছে।

এড্রিস বলেছিল, 'মেয়েকে কখনও চোখে দেখেনি সে। কোনও খবরও পায়নি গত ষোল বছর। বংশের ছাপ আছে তোমার চেহারায়। দেখেই ধরতে পেরেছি। মিউরিয়েল-এর সঙ্গে অসাধারণ মিল। মিলটা তারও চোখে পড়বে। সেদিক থেকে ভাবনার কোনও কারণ থাকছে না। বিনা দ্বিধায় মেয়ে বলে মেনে নেবে তোমায়। নিজেও তো বুঝতে পারছ, পারছ না?'

হ্যাঁ, বুঝতে পারছে ইরা। বুঝতে পারছে, মনে পড়ছে, মা প্রায়ই বলত, মিউরিয়েলকে ছোট বেলায় ঠিক তারই মতো দেখতে ছিল। মনে পড়ছে, বুঝতে পারছে ইরা।

'কিন্তু, আসল মেয়েটা? সে যদি জানাতে পারে?'

'জানতে পারবে না,' দুটো হাত জোরে-জোরে ঘষতে লাগল এড্রিস, 'সে মরে গেছে। গত সপ্তাহে মরে গেছে। সেই জন্যেই এসেছি। বেঁচে থাকলে কাজ হতো না। মিউ-রিয়েল-এর কাছ থেকে শুনলুম মেয়েটা মরেছে, তাইতেই মতলবটা মাথায় এল।'

খুঁটিয়ে ওর মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগল এড্রিস, মিথ্যেটা বিশ্বাস করছে কি না, আন্দাজ করতে লাগল। 'অবশ্য এখনও, মানে মিউরিয়েল বেঁচে থাকতে কাজে হাত দেওয়া যাবে না। তবে তার তো বেশি দেরি নেই···তিন মাস, বড় জোর চার মাস।'

অস্বস্তিতে নড়ে বসল ইরা। 'কী হয়েছিল মেয়েটির?'

'সাঁতার কাটছিল। হাত-পায়ে খিল ধরে গেল, সাঁৎরাতে পারলে না, ডুবে গেল।' অনায়াসে বলে গেল এড্রিস।

'মিউরিয়েল-এর জন্যে কিছুই কি করবার নেই?'

'না। ওর আর কিছু নেই।'

গাড়ির কাচের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল ইরা।

এড্রিস আর অপেক্ষা করতে পারলে না। 'তা হলে? করবে? ঝুঁকি খুবই কম।'

'ভেবে দেখি। বেশ ভেবে চিন্তে দেখা দরকার। আসছে রোববার এইখানে এস। হ্যাঁ বা না, যা হোক বলে দেব।'

এড্রিস বলেছে, 'প্যারাডাইস সিটি থেকে আবার অ্যান্দ র আসতে তো পারবো না, সোনামণি। চাইলেই ছুটি পাওয়া যায় না। আমায় খেটে খেতে হয়।' একটা কার্ড বার করে দিয়েছে। 'ঠিকানা রইল। ভাবা শেষ হলে একটা টেলিগ্রাম করে দিও। বেশি কিছু লিখতে যেও না: হ্যাঁ, কিম্বা না। খুব তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই। মিউরিয়েল মারা না-গেলে তো কিছু করা যাচ্ছে না। অঢেল সময় পাচ্ছি আমরা সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে।'

এয়ারপোর্টের বিশ্রাম-কক্ষ পার হয়ে বাসের দিকে যেতে-যেতে এড্রিস-এর সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়েছিল ইরার। তারপর আরও দুবার দেখা হয়েছে। যে চার মাস সময় ছিল, তার মধ্যে মতলবটাকে আরও নিখুঁত করে তুলেছিল এড্রিস। তখন আর কোনও সন্দেহ থাকেনি ইরার; কাজটা যে নির্বিবাদে সারা যাবে, সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হয়েছে। বাবাকে বলে এসেছে, নিউ ইয়র্ক যাচ্ছে

চাকরি পেয়ে, আর ফিরবে না। একটামাত্র আফশোশ, হেস ফারকে ছেড়ে আসতে হলো। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কিচ্ছু বলেনি তাকে। বললে অনেক জবাবদিহি করতে হতো। মনকে প্রবোধ দিয়েছে, হাতে পঞ্চাশ হাজার ডলার থাকলে আরও অনেক তাজা-তাজা পুরুষ জোটানো যাবে। প্রবোধ দিয়েছে, কিন্তু সান্ত্বনা পায়নি। হঠাৎ টের পেয়েছে, যতটা ভাবত, আসলে ফারকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে। ফার-এর জন্য মন কেমন করবে। ফার-এর অভাবটা বড় বাজবে।

অনেক ব্যাটাছেলের লুব্ধ দৃষ্টিকে মাড়িয়ে এয়ারপোর্টের ছায়া-পড়া চত্বরটা ছাড়িয়ে এক ঝলক রোদের মধ্যে এসে পড়ল ইরা। সামান্য কয়েক পা। তারপরই সীকম্ব-এর বাসে চেপে বসল।

৩

'প্যারাডাইস সিটির রাস্তা তো এ নয়!'

প্রায় আধ ঘণ্টাটাক গাড়িতে বসে কেউ কোনও কথা বলেনি। এখন হঠাৎ হাইওয়ের বড় রাস্তা থেকে ঘুরিয়ে পাশের একটা মেটো রাস্তায় গাড়ি ঢুকিয়েছে অ্যাল্‌জার।

'ঠিকই যাচ্ছি'। চট করে জবাব দিয়ে গাড়ির গতিটা একটু বাড়িয়ে দিলে সে।

'না, ঠিক নয়!' নোরিনার গলা আশঙ্কায় তীক্ষ্ণ শোনাচ্ছে। 'এ রাস্তা আমি চিনি···একেবারে সুমুদ্দুরের ধার পর্যন্ত চলে গেছে! আপনি ভুল করছেন, মিঃ টেবেল।'

'সুমুদ্দুর, তা হয়েছেটা কী?' সামনের দিকে চেয়েই জবাব দিলে অ্যাল্‌জার। মেয়েটার দিকে তাকাতে সঙ্কোচ লাগছে। 'কেন, সুমুদ্দুর ভালো লাগে না?'

মেয়েটাকে মেরে লুকিয়ে রাখা যায়, এমন একটা জায়গার সন্ধানে গত সপ্তাহে এই রাস্তায় ঘুরে গেছে অ্যাল্‌জার। জায়গা খুঁজে রেখে গেছে। পর-পর পাঁচদিন একই সময়ে এই রাস্তা দিয়ে এসেছে—গেছে, একদিনও কোনো লোকজন চোখে পড়েনি—না-রাস্তায়, না-সমুদ্রের কিনারে। শনি-রবিবার ছাড়া বেড়াতে বা চড়ুইভাতি করতে কেউ আসে না। বাকি পাঁচটা দিন এদিকটা মাড়ায় না কেউ—চান করতেও নয়।

ত্রস্তকণ্ঠে নোরিনা বললে, 'তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে

যাওয়া দরকার। স্থধু-স্থধু সময় নষ্ট করছেন কেন, মিঃ টেবেল্। এ রাস্তায় গেলে দেরি হয়ে যাবে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিন।'

'এ রাস্তায় গেলে পৌঁছনো যাবে না, জানছ কী করে। তোমার মা প্যারাডাইস সিটিতেই আছেন, এমন কথা তো বলিনি।'

'নেই? তা হলে কোথায় আছেন?'

'কাল্ভার হাসপাতালে। এই রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি কাল্ভার-এ পৌঁছে যাব।'

'তা কী করে হবে! এ রাস্তা তো আমি চিনি। স্থমুদ্দুরের পাড়ে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। সামনে স্থধু জল; আর দুপাশে বালিয়াড়ি।'

অ্যাল্জারের দিকে ভালো করে তাকাল নোরিনা। ডক্টর গ্র্যাহাম-এর ঘরে যাকে দেখেছিল, এ যেন সে লোক নয়। সমবেদনায় স্নিগ্ধ, প্রীতিতে প্রসন্ন ছিল সে মুখ। কিন্তু এখন যাকে দেখছে···ভয়ে শিউরে উঠল নোরিনা। এত তাড়াতাড়ি এমন সাঙ্ঘাতিক রকমের বদলে যেতে পারে কেউ? দুঃস্বপ্নের মধ্যেও কি এত তাড়াতাড়ি বদলায়?

গাড়ির আওয়াজে একটা বক গাছের ওপর থেকে উঠে পড়ল পাখা ঝটপটিয়ে। সামনে সমুদ্র দেখতে পেলে নোরিনা।

মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'ঐ তো স্থমুদ্দুর। এ রাস্তা দিয়ে আর কোথাও তো যাওয়া যায় না।'

রাস্তার ধারে-ধারে এখন আর ঝোপ-ঝাড় নেই; তার বদলে লম্বা-লম্বা খাগড়ার জঙ্গল বাতাসে দুলে-দুলে যেন লক্ষ লক্ষ আঙুলের ইশারায় কাকে ডাকছে।

'গাড়ি থামান। গাড়ি থামান দয়া করে।'

শখানেক গজ দূরে একটা গোল চক্কর খেয়ে রাস্তাটা শেষ হয়ে গেছে।

অ্যাল্‌জার যখন গাড়ি থামাচ্ছে, তখন আরও একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে নোরিনা। থমথমে, ঘামে চক-চক করছে। চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। ঠোঁটদুটো অদ্ভুত এক নিষ্ঠুরতায় দৃঢ়সম্বদ্ধ। আতঙ্কে শিউরে উঠল নোরিনা।

কাগজে মাঝে-মধ্যে ধর্ষণ আর খুনের খবর বেরোয়। নোরিনা পড়েছে। মাথা ঘামায়নি, ভাবেনি নিজের জীবনেও এমন ঘটতে পারে। ভেবেছে দোষটা ঐ সব মেয়েদেরই। ভেবেছে, অশালীন সাজ-গোজ আর ঠাট-ঠমকে নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনে ওরা। কিন্তু, এ লোকটা ওকে নিয়ে পড়ল কেন? কী করেছে সে? এক ধরনের লোক আছে অবশ্য, যাদের স্বভাবই এই রকম। ধর্ষণ আর খুনের নেশায় পেয়ে বসে। কিন্তু এ তো তা নয়। তার মায়ের অ্যাটর্নি। মায়ের কি কোনও অ্যাটর্নি সত্যিই ছিল? কখনও তো বলেননি। আবার একবার অ্যাল্‌জার-এর দিকে দেখল নোরিনা। অ্যাল্‌জার তখন গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিনের সুইচ থেকে চাবি খুলে রাখছে।

চারিদিক এখন শান্ত, নির্জন। এখন ভাঁটার সময়। বেলাভূমি তাই অনেক চওড়া, অনেক মসৃণ, মাইলের পর মাইল দীর্ঘপ্রলম্বিত। উদ্দাম বাতাসের তাড়নায় শুকনো বালি ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমনি করে জায়গায়-জায়গায় তৈরি হয়েছে

উঁচু-নিচু বালিয়াড়ি, সমুদ্রতীরের সমতল বিস্তারকে তরঙ্গায়িত করে তুলেছে।

পিছনের দরজার হাতলটা বুঝি নিজের অজান্তেই কখন ঘুরিয়ে দিয়েছে নোরিনা। দরজাটা এক ঝটকায় খুলে ফেলে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে।

প্রসারিত হাতের আঙুলগুলো ঠিক সময়ে বাড়াতে পারেনি অ্যাল্‌জার। মুঠোটা টের পেয়েছে নোরিনা, কিন্তু ছাড়িয়ে নিতে পেরেছে, নরম বালির ওপর প্রাণপণে দৌড়তে শুরু করেছে।

নোরিনা দৌড়তে পারে। হকি আর বাস্কেট বল খেলাটা বিফল হয়নি। কলেজ স্পোর্টস্‌-এ একশ গজ দৌড়ে জেতাটা বৃথা যায়নি। তবু, সে সব তো বাহাদুরির পারিতোষ, আর এখন জীবনের তাগিদ। নোরিনা দৌড়তে পারে। এখন আরও বেশি জোরে দৌড়চ্ছে।

থতিয়ে গেল অ্যাল্‌জার। মেয়েটা এত জোরে দৌড়তে পারে দেখে ভয় পেয়ে গেল।

যদি পালাতে পারে! যদি মুখ খোলে!

পিছু ধাওয়া করল অ্যাল্‌জার। ব্যবধান হবে প্রায় একশো গজ; বাড়ছে বই কমছে না। হারামজাদি ছুঁড়িটা এমন করে দৌড়তে পারে, কে ভেবেছিল? লম্বা-লম্বা পাগুলো যেন উড়ে চলেছে বালির ওপর দিয়ে। এর মধ্যেই হাঁফিয়ে পড়েছে অ্যাল্‌জার। গল্‌ফ খেলা ছাড়া কখনও খেলাধুলো করেনি। দম বেরিয়ে গেছে এতক্ষণে। তবু, থামল না, বুঝতে পারলে ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত বিরাট একটা

বালিয়াড়ির পিছনে চোখের আড়াল হয়ে গেল নোরিনা।

বালিয়াড়িটার গোড়ায় এসে থেমে গেল অ্যাল্‌জার। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, বুকের মধ্যে দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। কোনও রকমে বালিয়াড়ির মাথায় চড়ে থেমে পড়ল। চোখের মধ্যে ঘাম গিয়ে জ্বালা করে উঠল।

নোরিনাকে দেখা গেল, তবে অনেক দূরে, তুঁতে-নীল আকাশের পশ্চাৎ-পটে একটা কালো অবয়ব। লম্বা-লম্বা পা ফেলে সচ্ছন্দ গতিতে দৌড়চ্ছে এখনও, সুধু দিক পরিবর্তন করেছে। দীর্ঘপ্রলম্বিত বেলুবেলার সোজাসুজি জলা জায়গাটার ঘন জঙ্গলের দিকে আগের মতো এলোপাথাড়ি ছুট নয়; এবার জলের উল্টো দিকে ছুটে চলেছে, পাড়ের দিকে, রাস্তার দিকে। যেদিকে ছোট-ছোট ওক আর উইলো গাছের জটলা, আর তারই মাঝে মাঝে উদ্ধত কয়েকটা মেপ্‌ল গাছের আস্ফালন।

কয়েক দিন আগে এই জঙ্গলের মতো জায়গাটা চিনে রেখে গেছে অ্যাল্‌জার। ছোট-ছোট ঝুপড়ি গাছ-পালার মধ্যে দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ আছে, ধনুকের মতো বেঁকে ঐ মেটো রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। ঐ মেটো রাস্তা দিয়েই হাইওয়ে 4A থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছে ওরা একটু আগে।

ঐ পায়ে-চলা পথটার কথা কি জানে নোরিনা? জানে, যে শেষ পর্যন্ত হাইওয়েতে গিয়ে পড়া যাবে? আশার আলো দেখতে পেলে অ্যাল্‌জার। এইটাই একমাত্র সম্ভাবনার সুযোগ।

বালিয়াড়ি থেকে হড়কে নেমে পড়ে বালির ওপর দিয়ে টলতে-টলতে এগিয়ে গাড়ির কাছে পৌছল সে। চালকের আসনে গিয়ে বসল। কাঁপা-কাঁপা হাতে ইঞ্জিন চালু করে এক ঝটকায় গাড়িটাকে মেটো রাস্তা দিয়ে উল্টো দিকে ছুটিয়ে দিলে।

পায়ে-চলা রাস্তাটা যেখানে মেটো রাস্তার সঙ্গে এসে মিলেছে, সেখানে পৌছতে ছু-এক মিনিটের বেশি লাগল না। খানিক দূরেই ঝোপ-ঝাড় শেষ হয়ে গেছে। একটা উইলো গাছের নিচে রাখল গাড়িটা। কোটটা খুলে ফেলে গাড়িতে রেখে দিলে, প্রাণপণ দৌড়বার চেষ্টায় কোনও রকমে এগিয়ে গেল। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে পায়ে-চলা পথটা যেখানে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে, সেইখানে এসে পৌছল। পিছন ফিরে গাড়িটাকে দেখবার চেষ্টা করলে। লম্বা লম্বা খাগড়ার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে—নিশ্চিন্ত। ঝোপ-ঝাড়ের ছু-এক গজ ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর বেশ ঘন একটা ঝোপ দেখে, তার আড়ালে গিয়ে বসল। সেখান থেকে পায়ে-চলা রাস্তাটার কুড়ি গজটাক চোখে পড়ে।

এখন অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।

নতুন কিছু ভাববার নেই, তাই পুরনো কথা মনে পড়ল। টিকি এড্রিস ; আর ইরা মার্শ—এড্রিস যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ঐ মেয়েটার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। যদি কিছু ভুল করে বসে, তা হলে জনি উইলিয়াম্‌স, মিউরিয়েল মার্শ আর তার মেয়েকে খুন করাটা ফালতু হয়ে যাবে। এই রকম একটা

ব্যাপারে টিকির সঙ্গে জোট-বাঁধাটা বোধ হয় বোকামি হয়ে গেছে, কিন্তু টিকি যেভাবে বুঝিয়ে দিলে···

এড্রিস বলেছে, 'তুমি তাকে দেখনি, আমি দেখেছি। একেবারে এই কাজের জন্যেই যেন তৈরি। ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ নেই, ফিল। টাকার জন্যে চিড়িয়াটি সব কিছু করতে রাজি।'

একটা সতেরো বছরের মেয়েকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে রাজি হয়েছে টিকি। অ্যাল্‌জার বলেছিল, 'পাগলামি। নিজেদের ভাগ কমে যাবে না? দশ হাজার দিলেই তো হতো?'

উত্তরে টিকি একটু মুচকি হেসেছিল। সেই শয়তানি হাসি।

'তাতে কী এল-গেল? টাকাটা যে আদৌ পাবে, বললে কে তোমায়? মাথা খারাপ কোর না ইয়ার। তিনটে লাশই যদি পড়ল, চারটে হতে বাধা কী?'

কপালের ঘাম মুছল অ্যালজার। টিকির কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। লক্ষ্য রাখতে হবে, অ্যাল্‌জারের সম্বন্ধেও টিকির কোনও মতলব আছে কি না। চারটে লাশই যদি পড়ল, পাঁচটায় বাধা কী?

অ্যাল্‌জারের মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, টিকির বোধ হয় মাথার গণ্ডগোল আছে। হাসি-মুখে রাগ পুষে রাখতে পারে, শান্ত মনে প্রতিশোধের মওকা খোঁজে। অ্যাল্‌জারকে নিজের মুখেই বলেছে, লা কোকুইল-এ চাকরিতে ঢুকে ইস্তক বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে ও, বড়লোকদের সামিল হতে চায়।

টিকির ফ্ল্যাটে একদিন সন্ধ্যায় আসর জমিয়েছিল দুজনে।

তখনই কথাটা তুলেছিল টিকি। বৃহস্পতিবার, মনে আছে অ্যাল্‌জার-এর, টিকির ছুটির দিন। গেলাসের পর গেলাস খালি করেছে তুজনে, টিকি বেশ চুর। মুখটা লাল, চোখ-তুটো চকচকে, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। বলেছিল, 'একটা কী ব্যাপার জান, এইসব পয়সাগুলা কুত্তার বাচ্চাদের ওপর ঝাল ঝাড়বার ইচ্ছেটা আমার বহুদিনের, কিন্তু রাস্তা পাই না। ওদের নাগাল পেতে হলে, ওদেরই মতন টাকা হাতে পাওয়া দরকার···ওদের চেয়ে বেশি টাকা। কিন্তু কী করে তা হবে, ভেবে পাচ্ছিলাম না। তারপর একদিন মিসেস ফরেস্টার-এর বাড়িতে গিয়ে রাস্তা পেলাম। আসলে আমার ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সদ্দারের অবস্থা, কী নিয়ে লড়ব ? একদিকে বেজম্মা ঐ বড় লোকের দল, আর একদিকে আমি, একটা তুর্ভাগা বামন—ওদের কুচ্ছিত হাসি আর অবজ্ঞাভরা চোখের সামনে ভাঁড়ের মতোন দাঁত বার করে হাসি, ওদের ঘৃণা আর জঘন্য রসিকতার খোরাক যোগাই। আমি একা। তারপর একদিন ঐ বুড়ির বাড়িতে গিয়ে সব পাল্টে গেল ! এখন আর আমি একা নই। একজন বন্ধু পেয়ে গেছি, তার সঙ্গে পরামর্শ করি ; আমার চেয়ে অনেক চালাক, অনেক বুদ্ধিমান একজন। কী ভীষণ চালাক, ভাবতেও পারবে না তুমি।'

অ্যাল্‌জার-এরও অল্প নেশা ধরেছিল। একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বামনটার দিকে। 'তার মানে ? কে লোকটা ?'

এড্রিস-এর মুখে গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত। গাল ফুলিয়ে খানিকটা হাওয়া ছেড়ে হাত নেড়ে নেড়ে মুখে বাতাস করতে লাগল।

'কে, তা জানি না। কখনও দেখিনি, তবে তার কথা শুনতে পাই, তার নির্দেশ বুঝতে পারি। থাকে কোথায় জান? —এইখানে!' নিজের চওড়া কপালে টোকা মেরেছিল এড্রিস। 'আমার সঙ্গে কথা বলে, ফিল। মতলবটা ওরই। কী করতে হবে, না-হবে, সবই বলে দেয়। বুদ্ধিটা ওরই···আমার নয়।'

এসব ধাষ্টামো ভালো লাগেনি অ্যাল্‌জার-এর। ভেবেছিল, হয় পাগলামি করছে, না হয় রসিকতা। যা-ই হোক, অ্যাল্‌-জার-এর ভালো ঠেকেনি।

'এই মিসেস ফরেস্টারটি কে?'

'প্ল্যানচেট করে, প্রত্যেক বেস্পতিবার চক্রে বসে। জনাদশেক জমা হয়। এক ডলার করে দেয় সবাই। ওইটাই ওর রোজগার। এক বেস্পতিবার মজা দেখতে গিয়েছিলুম। হাতে কাজ ছিল না, কিছু করার না-পেয়ে চলে গেলুম। গেলুম, এক ডলার দিলুম।' বলতে-বলতে এড্রিস-এর মুখখানা কেমন স্বপ্নালু হয়ে উঠেছিল। 'ডলারের দাম পেয়েছি' ফিল, উশুল হয়ে গেছে, হাজার-হাজার গুণ উশুল হয়ে গেছে।'

'কী হয়েছিল?'

'বিরাট একটা টেবিল ঘিরে বসেছিলুম সবাই, মাঝখানে টিমটিমে একটা লাল আলো। রেকর্ডে স্তব-টব গোছের কী একটা বাজছিল। টেবিলে হাত রাখলুম সবাই, আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁয়ে রইলুম। বুড়ির ভর হলো, সবাই প্রশ্ন করতে লাগল। মৃত আত্মীয়-স্বজনদের কথা জিগ্যেস করতে লাগল একে-একে। টেবিল যদি একবার নড়ে, তার মানে "হ্যাঁ",

দুবার নড়লে "না"। ছেলেভোলানো কাণ্ড। নেহাৎ একটা ডলার খসিয়েছি, নইলে কেটে পরতুম।

'যাই হোক, আমার প্রশ্ন করার পালা এল। জিগ্যেস করলুম, শিগগিরই বেশ কিছু টাকা পাবার আশা আছে কি না। সবাই খুব হতভম্ব হয়ে গেল শুনে। তাদের মতে, এ ধরনের প্রশ্ন করা ঠিক নয়। শালার টেবিলটা পর্যন্ত ঘাবড়ে গেল বোধ হয়, নড়েও না, চড়েও না। বুড়িটা কী রকম অজ্ঞান মতোন হয়ে গেল। পড়ে গেল চেয়ার থেকে। সবাই উঠেপড়ে শুশ্রূষা করতে লাগল। আমাকে তো যাচ্ছে-তাই করলে সকলে। চলে আসব বলে হল-ঘরে গেলুম টুপিটা নিতে। মাথায় পরতে যাচ্ছি, এমন সময়ে কার যেন গলা শুনতে পেলুম। পরিষ্কার—যেমন তোমার কথা শুনছি, তেমনি পরিষ্কার। বলছে, "টিকি, তুমি অনেক টাকা পাবে, তবে ধৈর্য ধরতে হবে। হয়তো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে, তবে পাবে নিশ্চয়ই।" অবাক হয়ে গেলুম, হল-ঘরে কেউ কোথাও নেই। ভাবলুম, মনের ভুল। কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে আবার সেই গলা শুনতে পেলুম, বুঝলুম, মনের ভুল নয়, একেবারে খাঁটি।' কথা থামিয়ে আধখোলা চোখে একবার তাকাল অ্যাল্‌জার-এর দিকে। 'পাগল ভাবছ, তাই না?'

'পাগল নয়, মাতাল।' অ্যাল্‌জার জবাব দিয়েছিল।

তারপর সেই দৈববাণীর কথা আর কখনও তোলেনি এড্রিস, কিন্তু অ্যাল্‌জার জানে, এড্রিস এখনও বিশ্বাস করে, সে সত্যিই দৈববাণী শুনেছে। অস্বস্তি বোধ করে অ্যাল্‌জার, কিন্তু করবার তো কিছু নেই।

কানের কাছে মশা ভন-ভন করে উঠতেই অ্যাল্জার-এর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো। মশাটাকে তাড়াবার জন্যে হাত তুলতেই নোরিনাকে দেখতে পেল। পায়ে-চলা পথটা দিয়ে চুপচাপ এগিয়ে আসছে বিস্রস্ত পদক্ষেপে, ঘন-ঘন এপাশে-ওপাশে তাকাচ্ছে।

উত্তেজনায় সিঁটিয়ে উঠল অ্যাল্জার। পাথরের মতো নিশ্চল বসে রইল। নোরিনার দিকে দেখতে-দেখতে হাতদুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল শুধু।

নোরিনা হয়তো টের পেল, সে একা নয়। আচমকা থেমে পড়ে আস্তে-আস্তে হাত দুটো মুখের কাছে তুলে আনতে লাগল। পায়ে-চলা পথ-বরাবর দৃষ্টি ফেলে ঝোপটার দিকে দেখলে, আতঙ্কের অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে, নিঃশ্বাস আটকে এল।

নোরিনা ভীষণ ভয় পেয়েছে, মুখ দেখে বুঝতে পারলে অ্যাল্জার। ঘুরে সমুদ্দুরের দিকে ছোটবার মুখেই, চট করে উঠে দাঁড়িয়ে ঝোপের বাইরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল নোরিনার দিকে।

অ্যাল্জারকে দেখেই আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল নোরিনা। দৌড়তে চেষ্টা করল, কিন্তু অ্যাল্জার তখন হাত চেপে ধরেছে, হ্যাঁচকা টানে নিজের দিকে ফেরাতে চাইছে। অ্যাল্জার ভেবে রেখেছিল, হাতে পেলে বেগ পেতে হবে না। নিজের প্রচণ্ড শারীরিক ক্ষমতার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু দেখলে, ধরে রাখাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চরম ভয় বে-পরওয়া করে তুলেছে নোরিনাকে। প্রাণপণে লাথি ছুঁড়ছে,

আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে। এখন আর ভয়ে চেঁচাচ্ছে না। মুখ বুজে যুঝে যাচ্ছে দুজনে নিষ্ঠুর উন্মত্ততায়। মুখে আর নাকে অনবরত ঘুষি মেরে চলেছে অ্যাল্‌জার। নোরিনার মুখে এখন পুরু রক্তের মুখোশ। নোরিনা এখন অবসন্ন। নোরিনা আর পারছে না। হিংস্র আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষে, টেনে-টেনে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ডান হাতখানা নোরিনার গলার দিকে বাড়িয়ে দিলে অ্যাল্‌জার, নলির দুপাশে আঙুলগুলো চেপে বসে যেতে লাগল। অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন বুঝেই বোধ হয় হঠাৎ অমন খেপে উঠল নোরিনা। এক ঝটকা মেরে, মোচড় দিয়ে, প্রচণ্ড অঙ্গবিক্ষেপে প্রায় মুক্ত করে আনল নিজেকে, কিন্তু অ্যাল্‌জার-এর হাতের মুঠো ছাড়াতে পারল না। নোরিনাকে নিয়ে সামনের দিকে পড়ে গেলে অ্যাল্‌জার। নোরিনা নিচে, অ্যাল্‌জার ওপরে। অ্যাল্‌জারের দেহের চাপে পিষ্ট হচ্ছে নোরিনা। নোরিনার গলায় ডান হাতের পাশে এবার অ্যাল্‌জার-এর বাঁ হাতটাও উঠে এল।

এখনও যুঝছে নোরিনা, কিন্তু প্রাণশক্তি ফুরিয়ে এসেছে। গলার ওপর এখন আরও চাপ। দুটো হাতে সমস্ত দেহের ভার চাপিয়ে দিয়েছে অ্যাল্‌জার। নোরিনার পাদুটো প্রচণ্ড বিক্ষেপে আছড়ে উঠতে লাগল বার-বার; গোড়ালিদুটো সজোরে এসে পড়তে লাগল বালির ওপর। ঐটুকুই ক্ষীণ অন্তিম চেষ্টা। তারপর হঠাৎ সব স্থির, সব শ্লথ, সব নিস্পন্দ। চোখের তারা দুটো উল্টে গেল, শূন্য দৃষ্টিতে মৃত্যুর স্বাক্ষর।

একবার শিউরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাল্‌জার। ঘাড়ের পাশটায় নখ বসিয়েছিল নোরিনা, সেখান থেকে একটা

রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিঠছে, নিঃশ্বাস নিতে বড় কষ্ট। একটু এগিয়ে ধপ করে বসে পড়ল, একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে নেতিয়ে পড়ল অসীম আলস্যে। দুহাতে মাথা রেখে নিথর হয়ে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

যাক, কাজ শেষ। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল অ্যাল্‌-জার, সাফল্যের নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তি পেতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার বদলে ঠাণ্ডা সাপের মতো একটা ভয় পাক খিয়ে-খেয়ে কুণ্ডলী পাকাতে লাগল তার বুকের ভিতরটায়।

এই রকম হবে জানলে কাজে হাত দিত না। পৃথিবীর সমস্ত অর্থের বিনিময়েও দ্বিতীয় বার এ অভিজ্ঞতা যেন পেতে না-হয় তাকে—শেষ কটি চরম মুহূর্তের অভিজ্ঞতা।

হাতঘড়ির দিকে দেখলে। আটটা চল্লিশ। দেরি হয়ে গেছে। ধোঁকাতে ধোঁকাতে উঠে দাঁড়াল, গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে মেটো রাস্তার দিকে তাকিয়ে কান পেতে রাখলে। সমুদ্রের হা-হুতাশ আর গাঙ-চিলের উদাস বিলাপ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

গাড়ির খোপ থেকে আধবোতল হুইস্কি বার করলে। বেশ খানিকটা ঢেলে দিলে গলায়। তারপর গাড়ির পিছন দিকের ট্রাঙ্কের ডালাটা আধখোলা করে তুলে রাখলে। নোরিনার মৃত দেহের কাছে ফিরে এল।

ওর বিকৃত, যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে দেখলে না, টেনে তুলে কাঁধের ওপর চাপিয়ে নিলে। বেশ ভারী, গাড়ি পর্যন্ত যেতে একটু-আধটু টলতে হলো। ট্রাঙ্কের মধ্যে ফেলে দিলে

দেহটা, ডালা বন্ধ করে দিলে। গাড়িতে বসে পিছন দিকে চালাতে লাগল, সেই গোল চক্করটার কাছে এসে থামল। গাড়ি থামিয়ে ব্রেক লাগাল, নেমে ট্রাঙ্কের ডালা খুললে। মায়ামিতে দোকান থেকে গর্ত খোঁড়ার যে বেলচাটা কিনে এনেছিল, সেটা বার করে নিলে। নোরিনার দেহটা কাঁধে চাপিয়ে বেলচাটা হাতে নিয়ে সামনের বালিয়াড়ির দিকে এগিয়ে গেল। দেহটাকে বালিয়াড়ির গোড়ার ধপ করে ফেলে দিলে। উঠে দাঁড়িয়ে বিস্তৃত বালুবেলার দুদিকে ভালো করে দেখে নিলে। জনহীন বেলাভূমি খাঁ-খাঁ করছে! নিশ্চিন্ত। এবার নোরিনার দেহের পাশে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। কাপড়-জামা সব খুলে রাখতে হবে। গা ঘুলিয়ে উঠল, কিন্তু না-করে উপায় নেই।

টিকি বলে দিয়েছে, 'জামা-কাপড় সমস্ত খুলে নেবে। ওতে কলেজের ধোপার ছাপ থাকবে। কোনও রকম ঝুঁকি রাখা চলবে না।'

টাইট ইজেরটা এত সাপটে রয়েছে কোমর আর উরুতের সঙ্গে যে, খোলা মুশকিল। টানা-হ্যাঁচড়া করতে করতে ঘেমে নেয়ে উঠল অ্যাল্‌জার, চোখের মধ্যে ঘাম ঢুকে জ্বালা করতে লাগল, মুখ দিয়ে গালাগাল বেরিয়ে এল। খুলতে পারল শেষ পর্যন্ত। নোরিনা এখন সম্পূর্ণ নগ্ন, নোরিনা এখন সদ্যোজাত।

বিক্ষত, ফুলে-ওঠা গলায় একটা পাৎলা সরু সোনার চেন, তাতে একটা ক্রুশ। রাখা ঠিক নয়। হাত দেওয়াই কি ঠিক? ক্যাথলিক পরিবারে মানুষ হয়েছে অ্যাল্‌জার;

যদিও ক্যাথলিকত্বের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, তবু, এই মুহূর্তে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়—সেই চার্চ, সেই মোমবাতির চঞ্চল আলোয় উদ্ভাসিত উপাসনাকক্ষ, সেই ধূপের গন্ধ, অর্গ্যানের কাঁপা-কাঁপা গম্ভীর সুর। কেন মনে পড়ে যায় ?

ক্রুশটা পকেটে ফেলে রাখল অ্যাল্‌জার, জামা-কাপড়-গুলো পুঁটলি করে নিলে। বেল্‌চাটা তুলে নিয়ে বালিয়াড়ির মাথায় উঠে গেল, বালি তুলে-তুলে ফেলতে লাগল নোরিনার দেহের ওপর।

একটা পাখি চক্কর দিচ্ছে মাথার ওপর, বালির ওপর ছায়া পড়ছে তার বিরাট, ছড়ানো ডানার। কাজ সেরে গাড়ি নিয়ে চলে গেছে অ্যাল্‌জার—পাখিটা তখনও পাক খেয়ে-খেয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে।

সকাল নটা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময়ে ফ্রেড হেসকে দেখা গেল ক্যাপ্টেন টেরেল-এর দরজার সামনে। টোকা মেরে, দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল সে।

টেরেল চেয়ারে বসে, বেগ্‌লার জানলার ধাপিতে, দুজনেই কফি খাচ্ছে।

কফি-ভরা একটা কাগজের কাপ টেবিলের সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে, চেয়ার দেখিয়ে টেরেল বললেন, 'তারপর, ফ্রেড, কী যোগাড় করলে, বল।'

'সব কিছু থেকেই একই সিদ্ধান্তে আসতে হচ্ছে, চীফ। ওকে

মেরেছে, তারপর নিজেকে মেরেছে। লেপস্কি খোঁজ-খবর করে যা জেনেছে, তাতে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে : উলিয়াম্‌স বিছানায় গেছে রাত আটটা নাগাদ, সর্দিতে মাথা ভার হয়েছিল। রাত দশটা বেজে দশ মিনিটের সময়ে রাস্তার সামনের বাড়ির কেউ-কেউ বন্দুকের শব্দের মতো আওয়াজ পেয়েছে, ঠিক ধরতে পারেনি, সত্যিই গুলির আওয়াজ কি না। চড়া পর্দায় টেলিভিশন খোলা ছিল। বাড়ির কর্তা, ডিক্সন জানলায় উঁকি মেরে সন্ধান নেবার চেষ্টা করেছে। বাংলোর বাইরে মিউরিয়েল-এর গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। ফিরে গিয়ে টেলিভিশন দেখেছে আবার। খানিক বাদে গাড়ি চলে যাবার শব্দ শুনেছে। লা কোকুইল-এর দরওয়ান গাড়ি থেকে মিউরিয়েলকে নামতে দেখেছে। মদ খেয়েছে বোঝা যায়, তবে মাতাল হয়নি, তাই ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়নি। এগারোটা নাগাদ পৌঁছেছিল, কাজেই সোজা বাংলো থেকেই এসেছিল বোঝা যাচ্ছে। ঐ রকম সময়ই লাগবার কথা। বারম্যান বলেছে, সে মিউরিয়েলকে বার-এ ঢুকতে দেখেছে, দেখেছে এড্রিস তাকে সব শেষের কামরাটাতে নিয়ে গিয়ে বসাল। বারম্যান সারাক্ষণই ওখানে কাজ করেছে, কাউকে ওর কামরার দিকে যেতে দেখেনি, কেবল এড্রিস একবার হুইস্কি দিতে গিয়েছিল। ইন্‌জেকশনের সিরিঞ্জটার গায়ে আবছা যে সব আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, তার একটা, হয়তো সবকটাই, মিউরিয়েল-এর। মিউরিয়েল-ই যে উইলিয়াম্‌সকে মেরেছে, তারপর আত্মহত্যা করেছে, এ ছাড়া অন্য কিছু সন্দেহ করার মতো কোনও সূত্র তো পাওয়া যাচ্ছে না।'

ঘাড় নাড়ল টেরেল। 'স্বীকারোক্তির হাতের লেখাটা সম্বন্ধে ওরা কী বলে?'

'মিউরিয়েল-এর ফ্ল্যাটে হাতের লেখার যা নমুনা পেয়েছি, দিয়েছিলাম ওদের। মিলে গেছে। বন্দুকটাও মিউরিয়েল-এরই। বছর তিনেক আগে নিউ ইয়র্ক-এ লাইসেন্স করিয়েছিল। উইলিয়াম্‌স যে ওর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করছিল, সেটা সত্যি। প্যারাডাইস হোটেলে একটা পয়সাওলা ঘাগি বুড়ি মাগি, মিসেস ভ্যাল ওয়াইল্‌ডেন-এর সঙ্গে কেটে পড়ার তালে ছিল! আমি বুড়িটার সঙ্গে দেখা করেছি, কথাও বলেছি।' ঠোঁট কোঁচকাল হেস। 'উইলিয়াম্‌স বেঁচে নেই শুনে ফিট হবার যোগাড়। নিজের বিষয়-সম্পত্তির তদারক করাবার জন্যে না-কি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ নিয়ে যাবার কথা ছিল।' মুচকি হাসল হেস। 'বললুম না যে, খুব বেঁচে গেছ। লেপ্‌স্কি পাড়ার লোকেদের কাছে খোঁজ-খবর করেছে, মিউরিয়েল আর উইলিয়াম্‌স-এর মধ্যে একদম বনিবনা ছিল না ইদানিং, দিন-রাত ঝগড়া করত।'

কফিটা শেষ করলে হেস। 'ডাক্তার বলেছে, হেরয়েন-এই মরেছে!' একটু কী যেন ভেবে নিলে হেস, তারপর কাঁধ ঝাঁকালে। 'আমার তো মনে হয়, ফাইল বন্ধ করা যেতে পারে। জলের মতো সোজা কেস।'

'মহিলার স্বামীর কথা কী ভেবেছেন?' বেগ্‌লার প্রশ্ন করলে। 'খুঁজে বার করা দরকার?'

টেরেল বললেন, 'জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে তো দরকার হবে তাকে। তা ছাড়া মেয়েটাও আছে।' চোয়ালের কাছটা চুলকে

নিলেন। 'আশ্চর্য, সারা সকাল হ্যামিল্টন-এর দেখা নেই।'

মুখ মচকে হাসল হেস। 'ব্রাউনিং জপিয়েছে তাকে। বিনা-পয়সায় এন্তার ভালো-মন্দ গিলছে তো, তাই চেপে গেছে। খুনের খবরটা দায়-সারা গোছের ছাপিয়েছে, তাও একদম শেষের পাতায়।'

টেরেল বললেন, 'মেয়েটার দিক থেকে ভালোই। গাইডে ডিভন-এর নামটা পাওয়া যায় কিনা দেখ তো, জো।'

তাক থেকে টেলিফোন গাইডটা নামিয়ে আনল বেগ্লার। পাতা ওল্টাতে লাগল।

'এই যে, মেলভিল ডিভন, ১৪৫৫, হিল্সাইড ক্রেসেন্ট। টেলিফোন করব বাড়িতে?'

'করে ফেল।'

নম্বর ঘোরাল বেগ্লার। একটু পরেই নারীকণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল, 'মিঃ ডিভন-এর বাড়ি।'

'সিটি পুলিশ থেকে বলছি। মিঃ ডিভন-এর সঙ্গে কথা বলা যাবে?'

'বাড়িতে তো নেই। ব্যাঙ্কে পেতে পারেন।'

'কোন্ ব্যাঙ্কে?'

'ফ্লরিডা সেফ ডিপজিট। একটু যদি ধরেন, নম্বরটা বলে দিতে পারি।'

'ঠিক আছে, বার করে নেব। ধন্যবাদ।' টেলিফোন রেখে দিল বেগ্লার। টেরেলকে বললে, 'মিঃ ডিভন ফ্লরিডা সেফ ডিপজিট ব্যাঙ্কে কাজ করেন।'

ভুরু কোঁচকালেন টেরেল। হঠাৎ তুড়ি দিয়ে উঠলেন।

'আরে, চিনি তো! পদবিটা জানতুম, নামটা খেয়াল করিনি। কান্ট্রি ক্লাব কম্পিটিশনে একবার একসঙ্গে গল্ফ খেলেছিলুম। বড় সুন্দর মানুষ। ব্যাঙ্কের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। হেঁজি-পেঁজি লোক নয়। ভেবে দেখ একবার! হ্যামিল্টন-এর কানে গেলে, ব্রাউনিং-এরও সাধ্য নেই রোখে। কী মুখরোচক খবর বল তো? ফ্লরিডা সেফ ডিপজিট ব্যাঙ্কের ভাইস-প্রেসি-ডেণ্টের স্ত্রীর অপকীর্তি—খুন এবং আত্মহত্যা! ভাবতে পার? না, আমাকেই সামলাতে হবে, জো! আমিই কথা বলব।'

টেলিফোন বেজে উঠল, বেগ্লার রিসিভার নিলে।

ডেস্ক সার্জেণ্ট-এর গলা শোনা গেল, 'টিকি এড্রিস চীফ-এর সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'ধর একটু।' টেরেল-এর দিকে চেয়ে বললে, 'এড্রিস ফোন করছে। কথা বলবেন?'

ভুরু কোঁচকালেন টেরেল। 'কী বলে?' হাত বাড়ালেন। বেগ্লার-এর কাছ থেকে টেলিফোনটা নিয়ে মুখের সামনে ধরে বললেন, 'এড্রিসকে দাও, চার্লি।'

এড্রিস-এর গলা শোনা গেল।

'ক্যাপ্টেন টেরেল বলছেন?'

'হ্যাঁ! কী ব্যাপার, এড্রিস?'

'নোরিনা ডিভন-এর ব্যাপারে দু-একটা কথা বলার ছিল। আপনাকে বিরক্ত করাটা বোধ হয় ঠিক নয়, কিন্তু ওর বাবার খোঁজ করবার জন্যে বাধ্য হয়ে আপনার শরণ নিতে হচ্ছে। ওদের পারিবারিক শুভাকাঙ্খী হিসেবে আমি নোরিনার ইস্কুলে

ফোন করেছিলুম। ডক্টর গ্র্যাহাম ওকে ওর মায়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। নোরিনা বাড়ি আসছে। ওখান থেকে বেরিয়ে পড়েছে। খুব ভেঙে পড়েছে। আমার এখন ওকে নিয়েই চিন্তা। ওদের বাসায় এখন একটা কানাকড়িও নেই। অবশ্য আমি ওর ভার নিতে পারি, নেবও, তবে, কথা হচ্ছে কি, এমন করে পরের ব্যাপারে নাক গলাবার আগে, ওর বাবার সঙ্গে একবার যোগাযোগ করাটা বোধ হয় দরকার। আমার তো তা-ই মনে হয়। বলা যায় না, হয়তো উনি নিজেই মেয়ের ভার নিতে চাইবেন। আমার অবস্থাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ক্যাপ্টেন। কোনো গণ্ডগোলের মধ্যে যেতে চাই না, কিন্তু তাই বলে এড়িয়ে যেতেও তো পারি না!'

শুনতে শুনতে গাল চুলকে নিলেন টেরেল।

একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'নোরিনার বাবার খোঁজ পেয়ে গেছি, এড্রিস। এক্ষুনি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে যাব। তাঁর এবং তাঁর মেয়ে, এই দুজনের দিক থেকেই, ব্যাপারটা যত চাপা থাকে, ততই মঙ্গল। যদি সত্যিই তুমি ওদের শুভাকাঙ্খী হও, সত্যিই যদি ওদের উপকার করতে চাও, অনেকখানি সাহায্য করতে পার। আমি করোনার-এর সঙ্গেও কথা বলব। তুমিই মিউরিয়েল মার্শ-এর মৃতদেহ সনাক্ত করবে, উইলিয়াম্‌স-এর সঙ্গে মিউরিয়েল-এর যে একটা সম্পর্ক ছিল, তুমিই তার সাক্ষ্য দেবে। তাতেই যাতে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যায়, সেই ব্যবস্থা করব। মনে হয়, এ ব্যবস্থায় করোনার রাজি হবেন, নোরিনা আর তার বাবাকে জড়াবেন না। সবটাই তোমার ওপর নির্ভর করছে।'

এড্রিস বললে, 'আমার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ক্যাপ্টেন। আমি সব রকমে সাহায্য করব। বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে যাতে হৈ চৈ না হয়, আমারও সেই ভাবনা।'

'বেশ। আমি ডিভন আর করোনার-এর সঙ্গে কথা বলে নিই। ওঁরা কী বলেন, জানতে পারলেই তোমায় টেলিফোন করব। তোমার নম্বর কী?'

'সীকম্ব ৫৫৬।'

ব্লটার-এর ওপর নম্বরটা লিখে নিতে-নিতে টেরেল বললেন, 'ঠিক আছে।' টেলিফোন রেখে দিলেন। 'তা হলে তোমরা সবাই যে যার কাজে যাও। এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। বাকিটুকু আমিই সেরে ফেলছি।'

হেস আর বেগ্লার চলে যাবার পর টেরেল আবার টেলিফোন করলেন। করোনার, অ্যালেক ব্রিউয়ারকে খুলে বললেন সব কথা।

যেন দুঃসংবাদ শুনলেন করোনার। 'মেল ডিভন! আমার অনেক দিনের বন্ধু। ওর এমন···নামে কোনও ভুল করনি তো? মেল ডিভন?'

'ওই নামই। তবে এখনও ওর সঙ্গে কথা বলিনি। হতে পারে, এক লোক নয়।'

'ভালো করে খোঁজ নাও। আমার তো কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। খোঁজ নিয়ে আমায় আবার টেলিফোন কোর।'

'তা হলে নিজে গিয়েই বরং দেখা করি।'

'কর, কিন্তু খুব সাবধান, ফ্রাঙ্ক। মেল ডিভন এখানকার একজন বিশেষ গণ্যমান্য লোক।'

অগাধ পয়সাওলা কয়েকজন ব্যাবসায়ীতে মিলে ফ্লরিডা সেফ ডিপজিট ব্যাঙ্ক খুলেছিলেন ১৯৪৮ সালে। এঁরা কেউ-কেউ কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে প্যারাডাইস সিটিতেই আস্তানা গেড়েছিলেন, বাকি যাঁরা তখনও কাজ নিয়ে মত্ত, তাঁরাও বছরে অন্তত তিনটে মাস কাটিয়ে যেতেন এখানে। এঁরা সবাই মিলে ঠিক করলেন যে, প্যারাডাইস সিটিতে এমন একটা নিরাপদ ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেখানে দরকারি বৈষয়িক কাগজপত্র, বণ্ড, জুয়া খেলবার নগদ টাকা, গিন্নিদের জড়োয়া গয়না, রুপোর জিনিস-টিনিস নিশ্চিন্তে রাখা চলে। এ অঞ্চলে সমুদ্রের ধারে-ধারে যত বিলাস-নগরী আছে, তার মধ্যে প্যাবাডাইস সিটিতেই চুরি-ডাকাতি হতো সবচেয়ে বেশি। ব্যাঙ্ক হবার পর থেকে অবস্থা পাল্টে গেছে; অপরাধের হার অন্য শহরের তুলনায় সবচেয়ে নিচে, অপরাধীর সংখ্যাও সব চেয়ে কম।

ফ্লরিডা সেফ ডিপজিট ব্যাঙ্কের এত সুনাম যে, যত সব বড়-বড় গয়নার দোকানদার, হোটেলওলা, স্থানীয় তিনটে জুয়া খেলার আড্ডা, বড়-বড় ক্লাব—সবাই দামি জিনিসপত্র বা টাকাকড়ি রাখবার জন্য এখানকার সিন্দুক ভাড়া নেয়।

ছুটির কটা মাসে টেক্সাস-এর তেলের খনির কোটিপতি সব মালিকরা এসে জোটেন প্যারাডাইস সিটিতে। তখন এই ব্যাঙ্কটিই হয়ে ওঠে তাঁদের ক্যাশবাক্স। লোকে বলে, এই মরসুমটাতে ফ্লরিডা সেফ ডিপজিট ব্যাঙ্কে যত টাকা, গয়না-পত্তর আর সরকারি হুণ্ডির কাগজ জমা পড়ে, পৃথিবীর কোথাও একসঙ্গে নাকি তত মজুদ থাকে না।

গাড়ি রেখে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন টেরেল।

কোমরে কোল্ট '৪৫ অটোমেটিক নিয়ে দুজন গার্ড টেরেলকে দেখে স্যালুট করল।

একজন বলল, 'মর্নিং, চীফ। সরকারি কাজ?'

'না' বলে একটু থামলেন টেরেল। দুজনেই চেনা। '২২ রাইফেল ক্লাবের প্রতিযোগিতায় এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছিল একবার। মনে আছে, অসাধারণ টিপ। 'না, মিঃ ডিভন-এর সঙ্গে দেখা করব।'

'ভেতরে ঢুকেই ডান হাতে দ্বিতীয় টেবিলে খোঁজ করুন।'

ঘাড় নেড়ে ভিতরে ঢুকলেন টেরেল। সামনেই বিরাট পাথর-বাঁধানো হলঘর, উঁচু-উঁচু থাম, বড়-বড় ফুলদানি; অর্ধবৃত্তাকার সেই ঘরে দুটো করে থামের মাঝবরাবর একটি করে টেবিল। পদস্থ কর্তাব্যক্তিরা কেউ অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা বলছে, কেউ লিখছে, কেউ বা টেলিফোন করছে।

ডান দিকের দ্বিতীয় টেবিলের ওপর কালো মেহগনির ফলকে সোনালি অক্ষরে লেখা—অনুসন্ধান।

চোখ তুলে টেরেলকে চিনতে পেরে নিঃশব্দে হাসললোকটি।

'মিঃ ডিভন-এর সঙ্গে একটু কথা বলার ছিল। ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং খুব জরুরি।'

অবাক হলেও ভাবে-ভঙ্গীতে প্রকাশ পেতে দিল না সে। বললে, 'বসুন, ক্যাপ্টেন টেরেল।' টেলিফোন তুলে নিচুগলায় কাকে কী বললে, টেরেল ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে লোকটি বললে, 'এক্ষুনি দেখা করবেন মিঃ ডিভন।' হলের শেষের দিকে লিফ্‌টের দিকে ইশারা করে বললে, 'তেতলায়।'

তেতলায় নেমে দাঁড়াতেই দেখলেন, সুদর্শনা একটি তরুণী তাঁর জন্যই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। 'আসুন, ক্যাপ্টেন টেরেল।' পথ দেখিয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটি। বিরাট অলিন্দ-পথ পার হয়ে ঝকঝকে পালিশ-করা একটা দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজা খুলে ধরে পাশ দিলে। খুব নিচু গলায় বললে, 'ক্যাপ্টেন টেরেল এসেছেন, মিঃ ডিভন।'

বিরাট ঘর। আসবাবপত্র খুবই কম। টেবিলটাও তেমনি বিরাট। টেবিলের ওপাশে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোকে। টেরেল করমর্দন করলেন, মুখটা মনে পড়ে গেল।

মেল ডিভন-এর বয়স উনচল্লিশ। লম্বা, চ্যাটালো আড়া, শক্ত-সমর্থ চেহারা। চুলে সবে পাক ধরতে শুরু করেছে। রোদে-হাওয়ায় চামড়ার রঙ তামাটে হয়ে গেছে, চোখদুটো নীল, অচঞ্চল, ঠোঁটজোড়া চাপা অথচ প্রসন্ন। দক্ষতা, বিচক্ষণতা আর সদাশয়তার লক্ষণ পরিষ্কার।

চেয়ারের দিকে হাত দেখিয়ে মিঃ ডিভন বললেন, 'কত দিন পরে দেখা। সেদিনকার গল্‌ফ খেলার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। আজকাল ক্লাবে তো বিশেষ দেখি না? গল্‌ফ ছেড়ে দেননি নিশ্চয়ই।'

বসলেন টেরেল। 'নিয়ম করে খেলা আর হয়ে ওঠে না আজকাল। শনিবার সকালের দিকেই যা-একটু ফাঁক পাই।'

'তাই নাকি তা, খেলা চলছে কেমন? আমার তো দিনকের-দিন হাত পড়েই যাচ্ছে দেখছি!' চেয়ার-সুদ্ধ পিছন দিকে হেলে টেবিলের ওপর হাত রাখলেন মিঃ ডিভন। আসল কথাটা শোনবার জন্য ব্যগ্র হচ্ছেন, বেশ বোঝা যায়। টেরলকে দেখে বিরক্ত হননি বটে, তবে হাতে কাজ জমে আছে।

আস্তে-আস্তে বলতে লাগলেন টেরেল, 'মিঃ ডিভন, একটি মহিলার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে হচ্ছে আমায়। আপনার কাছ থেকে হয়তো কিছু খবর পেতে পারি। মহিলার নাম হলো মিউরিয়েল মার্শ ডিভন।'

কাঠ হয়ে গেলেন ডিভন। ঠোঁটদুটো আরও চেপে বসে গেল, চোখের দৃষ্টি অনাগত সম্ভাবনার চিন্তায় সংহত।

বললেন, 'আমার স্ত্রীর নাম, ক্যাপ্টেন। কোনও বিপদ-আপদ ঘটেছে কি?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন টেরেল। ভুল হয়নি তা হলে। নিশ্চিন্ত। কিন্তু এখনও ভেবে-চিন্তে কথা বলা দরকার।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। বিপদ তো বটেই।' চোয়ালের কাছটা চুলকে নিলেন টেরেল। 'কাল রাত্তিরে মারা গেছেন··· আত্মহত্যা।'

পাথর হয়ে গেলেন ডিভন। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন টেরেল-এর দিকে। টেরেল-এর করুণা হলো।

খানিক বাদে কথা বললেন ডিভন। 'আজ পনেরো বছর হতে চলল ছাড়াছাড়ি হয়েছে আমাদের। খুব কম বয়েসে বিয়ে হয়েছিল। আমার বয়েস তখন উনিশ। বিয়েটা দুবছরও

ট্‌কেনি।—আত্মহত্যা ? শুনে খুব খারাপ লাগছে। আপনি—আপনি ঠিক জানেন, মিউরিয়েলই তো ?'

টেরেল বললেন, 'মেয়ে রয়েছে একটি, নোরিনা।'

'ঠিক, নোরিনা। তার কোনও খবর পেয়েছেন ?'

'আজ দুপুরের আগেই সীকম্ব-এ এসে পড়বে।'

'ও। খুব আঘাত পাবে বেচারি।' ওপর দিকে তাকালেন ডিভন। 'মার সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিল, জানেন না কি ? বনিবনা ছিল ? ভালোবাসত ?'

'মনে তো হয়, বাসত।' একটু আমতা-আমতা করতে লাগলেন টেরেল। তার পর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলতে লাগলেন, 'বড় মর্মান্তিক ব্যাপার, মিঃ ডিভন। আপনাদের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে কোনও রকম খোঁজ-খবরই আপনি পাননি, তাই না ?'

মাথা নাড়লেন মিঃ ডিভন। চোখে পরিষ্কার আশঙ্কা।

অল্প কথায়, অথচ দরকারি কোনও কথা বাদ না-দিয়ে মিউরিয়েল মার্শ-এর সম্বন্ধে যা জানা গেছে, সবই বললেন টেরেল। জনি উইলিয়াম্‌স-এর হত্যা আর লা কোকুইল রেস্টুরেন্টে মিউরিয়েল-এর আত্মহত্যার খবর দিয়ে কথা শেষ করলেন।

নিশ্চল বসে শুনে গেলেন ডিভন।

কথা শেষ করে চেয়ার ঠেলে উঠে বাইরের দিকের বড় জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন টেরেল। বেশ কিছুক্ষণ পর শান্ত-গম্ভীর-গলায় ডিভন বললেন, 'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। শুনলাম সব। শোনার মতো নয়, তবু শুনলাম।

নোরিনা তার মায়ের স্বভাব-চরিত্রের কথা কি সত্যিই কিছু জানে না?'

ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন টেরেল। 'এড্রিস তো তা-ই বলে। আপনি কী ভাবছেন, সেটা বেশ বুঝতে পারছি, মিঃ ডিভন। কিন্তু, চিন্তা করবেন না। ঠিকমতো যদি সামলাতে পারি, অনেক কথাই চাপা দেওয়া যাবে। মিঃ ব্রিউয়ার-এর সঙ্গে আগে থেকেই কথা বলে রেখেছি। উনি তো আপনার বন্ধুলোক। আমরা যদি আপনাকে আর আপনার মেয়েকে এ ব্যাপারে না-জড়াতে চাই, উনি নিশ্চয়ই তাতে আপত্তি করবেন না। তা ছাড়া ব্রাউনিংও প্রাণপণ চেষ্টা করছে, ব্যাপারটা নিয়ে যাতে হৈ চৈ না বাধে, কাগজওয়ালাদের সঙ্গে ওর খুব খাতির।'

ডিভন যেন একটু স্বস্তি পেলেন। 'কিন্তু, একেবারে চাপা কি যাবে? ওই এড্রিস লোকটাকে কী মনে হয়? একটু কেমন-কেমন না? লা কোকুইল-এ অনেকবারই দেখেছি। কী একটা আছে ওর মধ্যে, সহ্য করতে পারি না। ওকে কি বিশ্বাস করা উচিত?'

'দেখে তো মনে হয়, আপনার মেয়েকে সত্যিই ভালোবাসে। নোরিনাকে যাতে এর মধ্যে জড়াতে না-হয়, তার জন্যে ও যথাসাধ্য করবে বলে কথা দিয়েছে। আমার তো দৃঢ় ধারণা, ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা চলে।'

'ওর সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানেন, ক্যাপ্টেন? বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই, যদি আমরা চাপা দিতেও পারি, আমাকে অনায়াসে ভয় দেখিয়ে জব্দ করতে পারবে ও? ব্ল্যাকমেল

করতে পারবে ? যদি ফাঁস করে দেয়, ব্যাঙ্কের চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। গত পনেরো বছর মিউরিয়েল-এর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তবু ব্যাঙ্কে থাকা চলবে না। ব্যাপারটা বড্ড নোংরা যে, ক্যাপ্টেন !'

'ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই, মিঃ ডিভন। এড্রিস-এর সম্বন্ধে কোনও খারাপ কিছু তো পাইনি। বরং যা খবর পেয়েছি, তাতে বেশ সচ্চরিত্রই বলা চলে।'

'তা হলে, আপনার ওপরেই ভরসা রাখলুম, ক্যাপ্টেন। নোরিনা আজকেই আসছে বললেন না ?'

'এড্রিস তা-ই বললে। ও ভাবছে, আপনি হয়তো এলেই তার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন।'

'নিশ্চয়ই।' চেয়ার ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে দিলেন ডিভন। 'আমার মেয়ে, সতের বছরের মেয়ে—ভাবতেও অবাক লাগে। বরাবরই তাকে কাছে পেতে চেয়েছি। কিন্তু মিউরিয়েল নিয়ে চলে গেল ; সবচেয়ে বড় আঘাত আমার সেইটাই। এ নিষ্ঠুরতার ক্ষমা নেই। নোরিনাকে খুঁজে বার করবার জন্যে সব করেছি, সন্ধান পাইনি। পাঁচ বছর সন্ধান চালিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি, মন থেকে মুছে ফেলেছি তার কথা।' মাথা নিচু করে কোলের ওপর জড়ো-করা হাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডিভন। 'আমার চোখের সামনে একটু-একটু করে বড় হয়ে উঠত, দেখতুম, কত আনন্দ হতো। আর, এখন জানতে পারলুম, আমার মেয়ে আমারই অগোচরে বড়ো হয়ে ফিরে আসছে ; তার নিজের মতামত তৈরি হয়ে গেছে, তার নিজের চাল-চলন আচার-ব্যবহার তৈরি হয়ে গেছে—সে

সব কেমন, কিছুই জানি না। আপনি জানেন না কি, ক্যাপ্টেন ও কেমন?'

'না, তেমন আর কী। যেটুকু বললুম, তার বেশি কী করে আর জানব।' মিউরিয়েলে-এর ঘরে নোরিনার যে ফোটোখান রেখে দিয়ে এসেছিল এড্রিস, সেই ছবিটা ব্যাগ থেকে বার করলেন টেরেল। ডিভন-এর সামনে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিলেন। 'এই আপনার মেয়ে। আপনি সৌভাগ্যবান আমি তো বলি, প্রতীক্ষা আপনার সার্থক, মিঃ ডিভন।'

'হ্যাঁ···ওর মার সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল! এড্রিস-এর ঠিকানাটা কী?'

ঠিকানা আর টেলিফোন দিলেন টেরেল।

'আপনি বরং এড্রিসকে আগে একবার টেলিফোন করুন, মিঃ ডিভন, ওকে জানিয়ে দিন কী, ঠিক করলেন।'

আবার একবার ছবিটার দিকে তাকালেন ডিভন।

'কী ঠিক করলুম? এ তো জানা কথা, ক্যাপ্টেন টেরেল: নোরিনা তার নিজের বাড়িতে ফিরে আসবে।'

এড্রিস-এর দেওয়া ফোটোগ্রাফের সঙ্গে মিল দেখেই চিনতে পারল অ্যাল্‌জার—ইরা মার্শ। সীকম্ব বাস টার্মিনালে কাঠের একটা বেঞ্চে বসে আছে।

দেরি করে ফেলেছে অ্যাল্‌জার, তবু একটু তফাতে গাড়ি রেখে বসে-বসে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে ইরাকে। ছবি দেখেই বোঝা যায় মেয়েটার চটক আছে, কিন্তু আসলে যে এমন

সুড়সুড়ি-ধরানো চেহারা, তা ভাবতে পারেনি। ওর চাপা ঠোঁট আর এলিয়ে বসার ভঙ্গীটা লক্ষ্য করল অ্যাল্‌জার; বুঝতে পারল, বয়সের অনুপাতে অনেক পোক্ত এ মেয়ে। অ্যাল্‌জার-এর বয়সী পুরুষরা এর কাছে নেহাৎ ধস্‌কা, নেহাৎ পানসে। সমবয়সী কোনও দামড়া ছেলের উদ্দাম যৌবনের তুলনায় ওর নিজের পালিশ-করা চেহারার জৌলুস আর অভিজ্ঞতার মূল্য এর কাছে কানাকড়িও নয়।

বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাল্‌জার, গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটার কাছে এগিয়ে গেল।

'হ্যাল্লো, ইরা। কতক্ষণ অপেক্ষা করছ?'

উঠে দাঁড়াল ইরা। অ্যাল্‌জারের জুতোর দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলতে-বুলতে মুখের কাছে এসে থামল। চোখে-মুখে একটা ঠাট্টা-মেশানো তাচ্ছিল্যের অভিব্যক্তি। অ্যাল্‌জার চটে উঠল মনে-মনে।

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে ইরা বললে, 'অনেকক্ষণ। বড্ড দেরি করেছ।'

ঠুকুনি একদম সইতে পারে না অ্যাল্‌জার। মুখটা লাল হয়ে উঠল, ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেবার জন্য হাতটা নিশপিশ করছে, কোনও রকমে সামলে নিলে। একটা কর্কশ শব্দ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। স্টিয়ারিং নিয়ে বসল। ইরা পাশে এসে বসতে, রওনা দিলে এড্রিস-এর ফ্ল্যাটের দিকে।

ইরা সিগারেট ধরালে, কথা বলবার সময়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। 'আমি তো জানতুম সময়ের খুব

টানাটানি। তা হলে? কী হয়েছিল? ঘুম ভাঙেনি?'

ব্যোম্‌কে উঠল অ্যাল্‌জার। 'রয়ে-সয়ে কথা বোল। যতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে, আমি বলব, তুমি শুনবে। বুঝেছ?'

ঘাড় কাৎ করে তীক্ষ্ণ চোখে অ্যাল্‌জার-এর দিকে তাকিয়ে রইল ইরা। বললে, 'শোনাবার মতো কথা কিছু আছে না কি তোমার? জানতুম না তো? যাই হোক, তাতেই যদি ডাঁট বজায় থাকে, বল, চেষ্টা করে দেখি, শোনা যায় কি না!'

অ্যাল্‌জার-এর মুখের পেশীগুলো টানটান হয়ে উঠল। 'চুপ কর! তোমার মতোন একটা অসভ্য ওঁচাটে মেয়ের মুখ থেকে ও ধরনের বাঁ্যাকা কথা আমি বরদাস্ত করব না!'

'তাই না কি? তা, কার মুখ থেকে হলে বরদাস্ত করবে?'

'একদম চুপ কর বলে দিচ্ছি, কুত্তি কোথাকার! নইলে জীবনের মতো চুপ করিয়ে দেব!'

'ও সব নাটুকে বুলি তো পল মিউনির সঙ্গে লোপ পেয়ে গেছে বলেই জানতুম! খুব সিনেমা দেখ বুঝি?'

রাগে চোখ-মুখ লাল করে খুব নোংরা একটা গালাগাল দিয়ে উঠল অ্যাল্‌জার। ভেবেছিল, তাতেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ইরা। কিন্তু, তার বদলে প্রাণভরে হেসে উঠল সে।

'হায় রে। একেবারে বস্তাপচা মাল বের করলে শেষ-কালে। ও সব এখন আর চলে না। বড্ড সেকেলে তো তুমি!'

রাগে ফুঁসতে লাগল অ্যাল্‌জার; মেয়েটাকে আর আমল দিতে ইচ্ছা হলো না, গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে। ওর টকটকে মুখ আর ক্রুর ঠোঁটদুটো লক্ষ্য করলে ইরা, তারপর

নিস্পৃহ ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে রইল। ব্যাটাছেলেকে ভয় করে না ইরা। আগে-আগে বিপদের কথা ভেবে দেখত। ভেবে-ভেবে বুঝতে পেরেছে, ছুটো জিনিস ছাড়া আর কিছুতে তার ভয় নেই—দারিদ্র্য আর বার্ধক্য। বুড়ি আর গরিব হয়ে বেঁচে থাকাটা সত্যই দুঃস্বপ্নের মতো ভয়ঙ্কর—ইরার ভয় করে। অন্য কিচ্ছুকে পরোয়া করে না···এই মুস্কো ঢ্যাপ্সাটাকে তো নয়ই।

এড্রিস-এর বাসার সামনে পৌঁছে অ্যাল্জার বললে, 'পেছনের সীট থেকে ব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়।' ইরার দিকে তাকালে না পর্যন্ত।

গাড়ি থেকে নেমে ব্যাগটা তুলে নিয়ে, যাবার আগে একটু দাঁড়াল ইরা। অ্যাল্জার-এর দিকে তাকালে।

'সামলে-সুমলে চোল, ভাই। যেরকম রক্ত গরম কর, এ বয়েসে সেটা ভালো নয়, শিরা-টিরাগুলো ফেটে যেতে পারে···তোমারই ক্ষতি, আমার আর কি!'

মাথা উঁচু করে নির্ভীক উদ্ধত ভঙ্গীতে হংসগমনে বাড়ির ভিতর এগিয়ে গেল।

অত্যন্ত গভীর উদ্বেগে অপেক্ষা করছিল এড্রিস। অধৈর্যে বার-বার যখন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে, দরজায় বেল বেজে উঠল। বেলা সোয়া-এগারোটা। অ্যাল্জার টেলিফোন করেছিল সাড়ে-দশটায়। গলাটা একটু কাঁপা-কাঁপা শোনাচ্ছিল বটে, তবে সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য বার-বার বলেছে, সব ঠিক আছে।

এড্রিস জিগ্যেস করেছে, 'পোশাক-আসাক সব খুলে নিয়েছ তো মনে করে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বললুম তো চিন্তা করার কিছু নেই। এবার ইরাকে তুলে নিতে যাচ্ছি।'

'চিন্তা করার কিছু নেই? ঐ আনন্দেই থাক! আধ ঘণ্টারও বেশি দেরি করেছ তুমি! টেরেলকে টেলিফোন করতে হলো শেষ পর্যন্ত। ভয় হলো, পাছে নোরিনার স্কুলে টেলিফোন করে বসে। তোমার এত দেরি হচ্ছে কেন?'

'গুলি মার। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ইরাকে নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছি, তা হলেই হলো তো!'

এতক্ষণে এসেছে ইরা, দরজার বেল বাজাচ্ছে। লাফিয়ে উঠে খুট-খুট করে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরলে এড্রিস।

'আরে, এস, এস! ফিল কোথায়?'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ইরা জবাব দিলে, 'বনিবনা হলো না। পৌঁছে দিয়েই ছিটকে বেরিয়ে গেল।'

'মেয়েটার জামা-কাপড়গুলো এনেছ?'

'মেয়েটার?' এড্রিস-এর চোখের দিকে চাইলে ইরা।

'না, মানে, স্কুল থেকে ফিল যেগুলো নিয়ে এসেছে, আর কি।'

ব্যাগের দিকে দেখিয়ে ইরা বললে, 'ওরই মধ্যে আছে বোধ হয়।'

'খুলে দেখ না!'

সোফার ওপর রেখে ব্যাগটা খুললে ইরা। 'হ্যাঁ, আছে।'

'ঐ শোবার ঘরে চলে যাও। পোশাকগুলো পরে ফেল। তাড়াতাড়ি কর।'

'তা, এত হামলে ওঠার কী হল?'

'ডিভন এসে পড়বে এক্ষুনি। আর শোন, মনে রেখ, ও তোমার বাবা। তুমি খুব চটে আছ তার ওপর। তোমার মাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাড়াহুড়ো করবে না, সাবধানে কথাবার্তা বলবে। আর সব যা-যা বলেছি, ভোলনি তো?'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে। কিচ্ছু গোলমাল হবে না, নিশ্চিন্ত থাক। টাকা দিচ্ছ, কাজ পাবে।'

ব্যাগটা তুলে নিয়ে শোবারঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে ইরা।

৪

বাহামা দ্বীপপুঞ্জে বাবার সঙ্গে ছুটি কাটিয়ে ফিরে এসেছে জয় অ্যান্স্লি। স্যুটকেশ খালি করছে। শোবার ঘরে হাতের কাজ সারতে-সারতে ভেবে দুঃখ হচ্ছে, ছুটিটায় তেমন মজা হলো না।

আর একটা স্যুটকেশ খালি করা বাকি। খাটের ওপর তুলে সেটার ডালা খুলতে-খুলতে ভেবে দেখলে জয়, যতই ফুর্তিবাজ আর সুস্থ হোক, বাবাকে নিয়ে বাহামার মতো কাব্যিক জায়গায় তিন-তিনটে সপ্তাহ কাটাবার খেয়ালটাই একটা বোকামি—বিশেষ করে এই রকম প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া অবস্থায়। মেল ডিভন-এর জন্য এমন মন কেমন করেছে, যে কিছুই উপভোগ করতে পারেনি।

জয় অ্যান্স্লির বয়স হলো একত্রিশ। লম্বা ছিপছিপে। মুখের গড়ন ভালো, কালো কালো চোখদুটি ভারি সুন্দর। সম্ভ্রান্ত আর শান্ত-গম্ভীর স্বভাবের বৈশিষ্ট্যে একঘর মানুষের মধ্যেও চোখে পড়ে। বছর পাঁচেক আগে মেল ডিভন-এর সঙ্গে প্রথম আলাপ, তখন থেকেই ভালোবাসে। ডিভন যে বিবাহিত তা জানত, আর, বিয়ে করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে মিশছে না, তাও জানতে দেরি হয়নি। বাধ্য হয়েই এসব মেনে নিয়েছে জয়।

প্রায়ই দেখা হয়। লোকে পাঁচ কথা বলে, বলবেই।

মেল কিছুই গোপন করে না, জয় পরওয়া করে না। জয়-এর বাবা, অ্যান্স্‌লি হলেন জজ। তিনি সবই লক্ষ্য করেন, দুঃখ পান, বিচক্ষণ লোক, তাই এ নিয়ে কোনও আলোচনা করেন না। মনে-মনে এই ভেবে-চুপ করে থাকেন যে, নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই ঠিক করে নেবে ওরা, সেটাই কাম্য। শুধু আশা করেন, ঠিক করতে মেল যেন বেশি দেরি না করে। মেলকে পছন্দ করেন জজসাহেব, মনে-মনে তারিফ করেন।

ব্যাজার হয়ে হাতের কাজ ফেলে রেখে হঠাৎ বাইরের জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল জয়। বাগানে বাবা ঘুরে-ঘুরে গোলাপ দেখে বেড়াচ্ছেন। দীর্ঘ, ক্ষীণ, বৃদ্ধ মানুষ।

একটু হাসল জয়, হাতঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় চারটে বাজে। বাবার চা খাবার সময়। ঘর ছেড়ে নিচে নামল।

হল ঘর পার হচ্ছে, টেলিফোন বেজে উঠল। মেল ডিভন। ওর সাড়া পেলেই কেমন যেন রোমাঞ্চ হয়। বাহামা থেকে ফিরে আসার পর এই প্রথম কথা হবে ওদের।

'আরে, মেল! খুব ভালো লাগল। রাত্তিরের দিকে তোমায় ফোন করব ভাবছিলুম।'

'কেমন আছ, জয়? ছুটিটা বেশ ভালো কাটল তো?'

'ভালোই। তবে আমি…'

'জজসাহেব ভালো আছেন?'

'খুব ভালো। আমরা ভাবছিলুম…'

'জয়…ছটা নাগাদ দেখা হতে পারে? কথা আছে।'

বড় গুরুগম্ভীর শোনাচ্ছে। শঙ্কিত হয়ে উঠল জয়।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কোথায় দেখা করব বল?'

'ব্যাঙ্কে আসতে অসুবিধে হবে?'

'না, না। অসুবিধের কী আছে। কিন্তু আজকের বিকেলটা ভারি ভালো লাগছে। বীচ হাট-এ (সমুদ্রের ধারে হাল্কা ধরনের ছোট শখের বাড়ি) আসতে ইচ্ছে করছে না?'

'না। ব্যাঙ্কেই চলে এস না জয়। দেখা হলে সব বুঝিয়ে বলব। তা হলে, ছটার সময়ে দেখা হচ্ছে তো?'

'হ্যাঁ'।

'সোজা আমার ঘরে চলে এস। মিস অ্যাশ্‌লে-কে বলে রাখব যে, তুমি আসবে। আচ্ছা, তা হলে···এখনকার মতো ছাড়লুম।' ছেড়ে দিল ডিভন।

খুব আস্তে-আস্তে টেলিফোন নামিয়ে রাখল জয়। দাঁড়িয়ে রইল। খানিকটা অস্বস্তি, খানিকটা উদ্বেগ। "কথা আছে"। ওদের ভবিষ্যতের কথা?

ঘর পেরিয়ে বাইরে রদ্দুরে বেরিয়ে এল জয়। চায়ের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন বাবা।

আর, এখন, এই ছটার ঠিক পরেই, ডিভন-এর অফিস-ঘরে বসে রয়েছে জয়। কোলের ওপর হাতব্যাগটা ধরে রয়েছে, ডিভন-এর কথা শুনতে-শুনতে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় বুকটা গুড়গুড় করে উঠছে।

মেল ডিভনকে শ্রান্ত আর উদ্‌ভ্রান্ত মনে হচ্ছে। আসল খবরের আচমকা আঘাতটা সইয়ে দেবার জন্য একটু গৌর-চন্দ্রিকা করে নিয়েছেন তিনি।

'জয়···আমরা দুজনে অনেক দিনের বন্ধু, কত দিন থেকে

যে আমরা এমন আপনার হয়ে গেছি, মনেও পড়ে না। কতবার আমার দুঃখ-দুর্দশার কথা বলেছি তোমায়, তুমিও মন দিয়ে শুনেছ, আশ্বাস দিয়েছ। তুমি যখন বাইরে, তখন একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে গেছে। তোমার জানা দরকার। খুব অল্প কয়েক জনেই জানে, তবে, আমি নিশ্চিত যে, তারা কাউকে বলবে না। কথাটা চাউর হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার। অন্য কারও মুখ থেকে শোনার আগে, আমি নিজেই তোমাকে পুরো ব্যাপারটা শুনিয়ে রাখতে চাই, জয়।'

এ গৌরচন্দ্রিকায় যে বিশেষ ফল হয়েছে, তা নয়, কিন্তু জয় সামলে নিয়েছে নিজেকে, বুঝতে দেয়নি যে, আকস্মিক এক আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে পড়েছে সে ভেতরে-ভেতরে। ডিভন-এর জীবনে কোনও দুর্বিপাক ঘটার সম্ভাবনার চেয়ে নিজের জীবনের দুর্বিপাককে মেনে নেওয়া অনেক সহজ তার কাছে।

জোর করে আরামের ভঙ্গীতে নড়ে বসল জয়। বললে, 'বল, মেল। কী ব্যাপার?'

টেবিলের ওপর কনুই রেখে দুহাতের ওপর থুৎনির ভর দিয়ে বসে-বসে মিউরিয়েল মার্শ ডিভন, জনি উইলিয়াম্‌স আর নোরিনার কথা শোনালেন মেল। খোলাখুলি বলে গেলেন।

শুনে একটু যেন স্বস্তি পেল জয়—আরও কত কী-ই তো হতে পারত। মনে মনে একটু গুটিয়েও গেল—সতের বছরের মেয়ে বাড়িতে থাকবে। যে সেবা, যে যত্ন দিয়ে মেলকে একদিন ভরিয়ে রাখবে বলে জয় আশা করে আছে, ঐ

মেয়েটিই এখন তার ভার নেবে, সঙ্গ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে আরও দূরে সরিয়ে নেবে তার কাছ থেকে।

ঘটনার কথা সারা হলো। মেল এবার উপসংহার করেছেন। 'এই হলো ব্যাপার। খুবই নোংরা, তাই না? আমার তো মনে হয়, আজ হোক কাল হোক, চাউর হবেই। টেরেল বা ব্রিউয়ারকে বিশ্বাস করা যায়। টেরেল-এর কর্মচারীরাও মুখ খুলবে না, কিন্তু ঐ বামনটাকে নিয়েই আমার ভয়। ও কিছু না-জানলে অনেক নির্ভাবনায় থাকতে পারতুম।'

'তোমার মেয়েকে যখন ভালোবাসে, তখন বদমাইসি করতে যাবে কেন?'

'সে কথাও ভেবেছি। কিন্তু, কী জানি কেন, কিছুতেই মন থেকে ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না।' বিরক্তি এড়াবার জন্য কাঁধ ঝাঁকালেন মেল। 'যাক গে, এখুনি ও নিয়ে ভেবে দরকার নেই। তদন্তের পর দু সপ্তাহ তো কেটে গেল, নোরিনা বা আমার কথা তো ওঠেইনি দেখছি। কাজেই অপেক্ষা করা যাক, আশা করা যাক, সব নির্ঝঞ্ঝাটে মিটে যাবে।' ঠ্যাসান দিয়ে বসলেন মেল, চেয়ারের হাতলে হাত রাখলেন। 'মনে হয়, নিজেই ভুল বুঝেছিলুম। টেরেল যখন বললেন যে, নোরিনাকে খুঁজে পাওয়া গেছে, তখন আত্মহারা হয়ে পড়েছিলুম। ওকে ফিরে পাব, একান্ত আপনার করে কাছে পাব, এই আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলুম কি না, তাই মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।' ম্লান হাসি দেখা দিল মেল-এর মুখে। 'একটু বেশি বেশি আশা

করে ফেলেছিলুম বোধ হয়। তবে, ও যে একটু এড়িয়ে চলবে প্রথম-প্রথম, সেটাই স্বাভাবিক হয়তো।...ঠিক যে অমান্য বা অগ্রাহ্য করে, তা অবশ্য বলা যায় না। জন্ম থেকে শুনে আসছে, আমিই ওর মাকে এমন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলুম যে, সংসার ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে তাকে।...এখন এমন দাঁড়িয়েছে, দু সপ্তাহ ধরে একসঙ্গে আছি, অথচ কেউ কাউকে আপন জন বলে মনে করতে পারছি না।'

আশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল জয়। 'একটু ধৈর্য ধরতে হবে, মেল। তোমার মনে কী হচ্ছে, সবই বুঝেছি, কিন্তু ওর মনের দিকটাও ভেবে দেখতে হবে তো।'

'দেখেছি। আমার মেয়ে হলে যা হওয়া উচিত, একদম সেরকম নয়। সত্যি বলছি, নেহাৎ মিউরিয়েল-এর সঙ্গে চেহারার অদ্ভুত মিল, নইলে আমার মেয়ে বলে বিশ্বাস করাই শক্ত হতো।'

'কী করে সময় কাটায়?'

'সেইখানেই তো গোলমাল। কোনও কিছুতেই উৎসাহ নেই। বেশির ভাগই ঘরে বসে পপ রেকর্ড শোনে, অসহ্য লাগে গানগুলো।' ম্লান হাসলেন মেল। 'খাল কেটে আমিই কুমির ডেকেছি অবশ্য। রেকর্ড প্লেয়ারটা আমিই কিনে দিয়েছি,। টাকাও দিয়েছি হাতে। সেই থেকে একের-পর-এক যাচ্ছেতাই ঐসব রেকর্ড কিনে চলেছে। আমার সঙ্গে ক্লাবে গিয়ে টেনিস শিখতে বললুম, সে না কি বিচ্ছিরি। ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস করতে বললুম, সেও বাজে। গল্‌ফ খেলার কথাটা আর তুলিনি...'

'দেখ, মেল, ও কি ব্যাটাছেলে? হয়তো খেলা-ধুলো দৌড়-ঝাঁপ ভালোবাসে না। অনেক মেয়েই তো বাসে না।'

'হ্যাঁ, কথাটা হয়তো ঠিকই। আমি এই ভেবে বলেছিলুম যে, তা হলে ওর সঙ্গে টেনিস খেলা যেত। একসঙ্গে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়া যেত। হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, ভুলই করেছি।'

'আর কী করে?'

'একটা গাড়ি দিয়েছি, চালিয়ে প্রায়ই সীকম্ব-এ যায়।' এবার নিজের হাতের দিকে চেয়ে-চেয়ে কথা বলতে লাগলেন মেল। 'ঐ হতচ্ছাড়া বামনটার সঙ্গে একটু বেশি মেলামেশা করছে। আমার চেয়ে ওর দিকেই যেন টানটা বেশি। বামনটার মধ্যে কিছু একটা আছে, যা অশুচি, যা···ইতর। দেখি, এই মেলামেশাটাকে থামাতে হবে।'

জয়-এর কালো ভুরুজোড়া একটু উপরে উঠে গেল।

'কী করে থামাবে?'

'বলে দেব, দেখা করবে না।'

'যদি বলে, কেন?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন মেল। 'মেলামেশাটা বন্ধ করবার দরকার নেই বলতে চাও?'

'একটু বুঝে দেখ। এই বামন লোকটি ওর মাকে চিনত, তাঁর আলাপী লোক। এখন, এই প্রথম দিকে, ওর কাছেই একটা নিশ্চিন্ততা পাবে নোরিনা। হঠাৎ একজন নতুন লোকের কাছে এসে টাকা পেয়েছে, আরাম পেয়েছে, সবই—তাকে বাবা বলেও জেনেছে, কিন্তু এখনও বাবা বলতে ঠিক কী বোঝায়, তার দাম বোঝবার সময় পায়নি।

এড্রিস-এর কাছে যেতে চাইবে, এটাই তো স্বাভাবিক, মেল।'

'কিন্তু লোকটা বামন। লোকটার মধ্যে কী একটা আছে·· পরিষ্কার বোঝাতে পারব না, কী আছে, কিন্তু আমার একদম ভালো লাগে না। সতেরো বছরের একটা মেয়ে ওর মতোন একটা লোকের সঙ্গে অতক্ষণ ধরে করেটা কী? কী পায়?'

'তুমি সাড়ে-আটটায় বেরোও, আর ছটায় ফের। সারাটা দিন শুধু পপ রেকর্ড শুনে কী আর কাটানো যায়? ওর সঙ্গে ছাড়া কার সঙ্গেই বা মিশবে?'

'ক্লাবে এলে কত লোক পেত।'

'এটা কী বলছ, মেল! ক্লাবের মহিলারা সব হয় বিয়ে-ওলা, ছেলে-পুলের মা, আর না হয় আমার মতোন···সতের বছরের মেয়ের সঙ্গে মেশবার পক্ষে একটু বেশি বয়স্থা।'

'ঠিক আছে। আমার ধারণাই ভুল। এবার তুমিই না-হয় কিছু পরামর্শ দাও।'

'আমার তো মনে হয়, পরিষ্কার যেটা বোঝা যাচ্ছে, ওর কিছু কাজ দরকার। তাতে করে সমবয়সীদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পাবে। একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকুক, লেগে থাকুক, তা হলে আর এই রকম ভেসে-ভেসে বেড়াতে হবে না।'

'না, না, দোহাই তোমার! আমার মেয়ে চাকরি করবে, তা কিছুতেই হবে না। কেন চাকরি করবে? দুজনের মতো যথেষ্ট টাকা তো রয়েইছে আমার। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের ব্যাঙ্কেই একটা চাকরি নেবার কথা একদিন তুলেওছিল নিজে। কোনও মানে হয়? ফুটফুটে একটা মেয়ে,

সে কি না ব্যাঙ্কের ঝামেলায় নাকানি-চোবানি খেতে যাবে!'

'ঢুকিয়ে নেওয়া যায়?'

'এক কথায় হবে না, একটু···তা, হ্যাঁ, ঢুকিয়ে নিতে পারি। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হিসেবে ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কিন্তু করব না। ও চাকরি করতে বেরুবে, এ আমি হতে দিতে চাই না।'

'আমার মনে হয়, চাওয়া উচিত।' হাতঘড়ির দিকে দেখলে জয়। 'খেতে আসবে আমার সঙ্গে? বাবার সঙ্গে দেখা হলে খুব খুশি হবেন।'

'দেখা করতে তো চাই, কিন্তু হয়ে উঠবে না। এতক্ষণ নোরিনা একা থাকবে, সেটা ভালো লাগে না। বুঝতেই পারছ, একটু জড়িয়ে পড়েছি এখন।'

'ওকেও সঙ্গে নিয়ে আসার কথা বলছি না, তার কারণ আশি বছরের একজন থুত্থুড়ে জজ আর মায়ের বয়েসী একজন আইবুড়ো স্ত্রীলোকের সঙ্গ ওর তো ভালো লাগার কথা নয়।'

'মায়ের বয়েসী আইবুড়োটিকে আবার কোথায় পেলে?'

হেসে উঠল জয়।

'একটা কিছু করা দরকার। এখানেই কাজে ঢুকিয়ে দাও। দেখ, সব গোলমাল মিটে যাবে। তুমি তো আমার কথা শোন। এবারেরটাও শোন, যত শিগগির পার চাকরির ব্যবস্থাটা করে দাও।'

'তাতে সত্যিই কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে?'

'হতে বাধ্য।'

একটু ইতস্তত করে ঘাড় নাড়লেন মেল। 'তোমার কথাই হয়তো ঠিক। ওকে বলব। ক্রেশার-এর সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। কর্মচারীদের দিকটা ও-ই দেখে। খুশি হবে না, ওপরওয়ালা হিসেবে চাপা দিতে হবে আর কি।'

উঠে দাঁড়াল জয়। 'আজই সবে ফিরেছি, মেল। বাবা নিশ্চয়ই আশা করছেন, একসঙ্গে খাব। আমি যাই। আবার কবে দেখা হচ্ছে?'

'কাল সন্ধেয় এস, ক্লাবে ডিনার খাই।'

'নোরিনা?'

'ও বেরুবে। সন্ধের সময়ে বেশির ভাগই তো বেরিয়ে যায়।'

'সঙ্গে আসতে বল না।'

'আসবে না। ক্লাব-ট্লাব ওর পানসে লাগে।'

কাঁধ ঝাকাল জয়। জোর করাই উচিত হয়তো, কিন্তু করলে না। মেলকে একা পেতে ইচ্ছে করে।

'হয়তো সত্যিই লাগে। তাহলে, কালকে ক্লাবে দেখা হচ্ছে। বেশি চিন্তা কোর না। সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখ।'

জয় চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ বসে ভাবতে লাগলেন ডিভন। জয় যা বলে, তাতে কাজ হয়। হয়তো কাজ পেলে নোরিনা সত্যিই সামলে যাবে, সব ব্যাপারে অবাধ্য হবে না। আরও খানিকক্ষণ ভেবে মনে হলো, চেষ্টা করে দেখাই উচিত।

পরের দিন সকালে টিকি এড্রিস যখন ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে চানের ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন দশটা বেজে গেছে। রান্নাঘরে ঢুকে কফি বানাবার পারকোলেটরটা চালু করে দিয়ে দুধের বোতল আর খবরের কাগজ নিতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। লিফ্‌টের দরজা খুলে অ্যাল্‌জারকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কী খবর হে?' হেঁট হয়ে দুধের বোতলটা তুলে নিতে-নিতে বললে, 'এত সকাল সকাল? আমার কাছে না কি?'

পাশ কাটিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ল অ্যাল্‌জার। মুখটা থমথম করছে। এড্রিস বুঝতে পারলে যেকোনও মুহূর্তে রাগে ফেটে পড়তে পারে।

'তোমার কাছে ছাড়া আর কোন্ চুলোয় যাবার আছে বলে মনে হয়?' টুপিটা চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে দিলে অ্যাল্‌জার।

দরজা বন্ধ করে বসবার ঘরে এল এড্রিস।

'কফি খাও। সবে বানিয়েছি।'

'চুলোয় যাক কফি!' দাঁত কিড়মিড়িয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল অ্যাল্‌জার। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে কাঁপা-কাঁপা হাতে ধরিয়ে নিলে।

'কোনও গণ্ডগোল হয়েছে?'

সামনে ঝুঁকে এড্রিস-এর দিকে কটমটিয়ে চেয়ে অ্যাল্‌জার বলে উঠল, 'আর কতদিন আমার এভাবে চলবে, বলতে পার?' চোখদুটো চকচক করতে লাগল।

'এক্ষুনি আসছি।' ধীর, শান্তগলায় কথাকটা বলে

রান্নাঘরে ঢুকল এড্রিস। কফির সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে এল, টেবিলে গুছিয়ে রেখে, বসল। কাপে কফি ঢালতে লাগল।

আবার দাঁত কিড়মিড়িয়ে উঠল অ্যাল্‌জার। 'কুত্তিটা কী করছে?'

সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিয়ে উঠল এড্রিস, 'থিতু হচ্ছে।' কফির কাপে চুমুক দিলে। 'খচে আছ কেন?'

'দেখ, এভাবে আমার আর চলছে না। তোমার আর কী···চাকরি আছে, রোজগার করছ, খাচ্ছ। আমি কি চিরকাল এই রকম ফোতো কাপ্তেন হয়ে ঘুরে বেড়াব? পরিষ্কার জানতে চাই, কাজে হাত দিচ্ছ কবে!'

'ভালো করে বোঝ,' এড্রিস-এর গলাটা বেশ চড়া। 'আগেই বলেছিলুম না, তাড়াহুড়োর ব্যাপার নয়? একটা ভুল করেছ কি, সব ভেস্তে যাবে।' সামনে ঝুঁকে খেঁটে-খেঁটে আঙুলের ডগা দিয়ে টেবিলে টোকা মারতে-মারতে বললে, 'মতলবটা মাথায় নিয়ে অপেক্ষা করছি আজ পাঁচ বচ্ছর ধরে। ভালোয় ভালোয় কাজ গুছতে আরও দু বচ্ছর লাগলেও, অপেক্ষা করতে পেছপা হব না। ইরাকে ব্যাঙ্কে চাকরি নিতে হবে। তারই ব্যবস্থা করছে। ভারি চালাক মেয়ে। একেবারে নিখুঁতভাবে কাজ গুছিয়ে যাচ্ছে। মতলবের আসল ব্যাপারটাই হলো তাই—ব্যাঙ্কে ঢুকে ওদের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া। এ সব কি দুদিনের কাজ বলে মনে কর? ব্যাঙ্কে বেশ মাখামাখি হয়ে না-গেলে কাজই হাসিল করতে পারবে না—এই-ই হলো মোদ্দা-কথা। ঢুকুক, ওদের ব্যবস্থা-ট্যবস্থা দেখে-শুনে নিক, তখন কাজ শুরু করব, তার আগে নয়।'

'কত মাস যে লাগবে, তার ঠিক কী? তদ্দিন আমার খাই-খরচ জুটবে কোত্থেকে? তা হলে, কিছু মাল-কড়ি ঝাড়, টিকি। হোটেলওলার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি।'

এড্রিস-এর মুখটা শক্ত হয়ে উঠল। 'গেল হপ্তায় দুশ ডলার দিয়েছি। টাকার গাছ দেখেছ?'

'আরও দুশ চাই। কাজ হয়ে গেলে শোধ দিয়ে দেব।'

'একশর এক পয়সাও বেশি পাবে না, আর ওতেই অন্তত দুহপ্তা চালাতে হবে।' উঠে টানা খুলল এড্রিস।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গিয়েই সজোরে একটা ধাক্কা মারলে অ্যাল্‌জার। এড্রিস ঠিকরে পড়ে গেল। অ্যাল্‌জার টানার মধ্যে হাত ঢোকালে। কুড়ি ডলারের একটা তাড়া বার করে নিলে। 'তোমায় আর কষ্ট দিলুম না, টিকি!' মুচকি হাসল অ্যাল্‌জার। 'শোধ করে দেব।'

এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে এড্রিস। মুখটা সাদা হয়ে গেছে। ছোট-ছোট চোখ দুটো কালো কাঁচের গুলির মতো চকচক করছে। তাড়া থেকে তখন তিনশ ডলারের নোট গুণে নিচ্ছে অ্যাল্‌জার। পিছতে লাগল এড্রিস।

উদ্ভাসিত মুখে নোটের দিকে চেয়ে অ্যাল্‌জার তখন বলছে, 'তিনশ-ই নিলুম। একশ রইল, ওটা থাক। ওতেই দিব্যি হয়ে যাবে তোমার। তাই না টিকি? আমার মতো দশাসই লোকের যা খরচ, তোমার মতো পুঁচকে মানুষের তো আর তা লাগে না!'

মাপ-সই ছোট্ট দেরাজটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল টিকি।

টানা খুললে, ছোট্ট একটা পিস্তল বার করলে ; বাঁটের কাছটায় একটা রবারের বলের মতো লাগানো।

ধীর, ফিসফিসে গলায় বলে উঠল, 'রেখে দাও ! প্রত্যেকটা নোট যেমনকার তেমনি রেখে দাও, অ্যাল্‌জার ! মুখময় যদি অ্যামেনিয়া মাখতে না চাও, যা বলছি, শোন !'

প্রথমে উঁচিয়েধরা পিস্তলটার দিকে দেখলে অ্যাল্‌জার, তারপর এড্রিস-এর মুখের দিকে। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল নোটের তাড়া হাতে, ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল।

'রেখে দাও !'

নোটের বাণ্ডিলটা টানার ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরে গেল অ্যাল্‌জার।

দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'আচ্ছা, আচ্ছা ! ঘেয়ো ভাঁড় কোথাকার ! নেগে যা তোর টাকা !'

'তাই নেব।' পিস্তলটা পকেটে ভরে নিলে এড্রিস। 'আমাকে ঘাঁটাতে যেয়ো না, ফিলি-চন্দর। বড শক্ত ঘাঁটি !' টানার কাছে গিয়ে একশ ডলার গুনে নিয়ে টেবিলের ওপর তাল পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলে। 'এর বেশি নয়। ভেবে-চিন্তে খরচ কোর !'

অ্যাল্‌জার যখন নোটগুলো তুলছে, সেই সময়ে দরজায় বেল বাজল। টানায় চাবি দিয়ে চাবিটা পকেটে ভরে বাইরের ঘরে গিয়ে দরজা খুলল এড্রিস।

ইরা মার্শ বারান্দায় দাঁড়িয়ে। পুরুষদের একটা শার্ট গায়ে, ঘননীল জীন্‌স, শার্টটা ভেতরে ঢোকায়নি। ফ্ল্যাটের ভেতরে যখন ঢুকল, তার নীল চোখে উত্তেজনার আভাস।

কটমট করে তার দিকে তাকাল অ্যাল্‌জার।

'হচ্ছেটা কী? তা না না না করে আর কদ্দিন চালাবে?'

গ্রাহ্য করলে না ইরা। টেবিলের কাছে গিয়ে এক কাপ কফি তৈরি করে নিলে, তারপর হাসিমুখে এড্রিস-এর দিকে চেয়ে বললে, 'কাল থেকে ব্যাঙ্কে চাকরি করছি।'

চমকে উঠল এড্রিস।

'দেখ, এমন গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা কোর না, বলে দিচ্ছি।'

'কাল থেকে ব্যাঙ্কে চাকরি করছি।'

লম্বা করে নিঃশ্বাস টানলে এড্রিস, মুখখানা হাসিতে ভরে উঠল। জোরে হাততালি দিয়ে মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে উঠল। নিজস্ব ছোট্ট ডেস্কের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে টেবিলের ওপর চড়ল, সেখান থেকে একলাফে মাটিতে। পাগলের মতো ছুটে বেড়াতে লাগল ঘরময়, আর চেঁচাতে লাগল, "য়েপ্পি-ই-ই-ই! য়েপ্পি-ই-ই-ই।" শেষকালে অ্যাল্‌জার ওকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলে।

বললে, 'চেঁচাচ্ছ কেন, পাগলা কুকুর কোথাকার! রাজ্যের পুলিশ এসে জড়ো হবে।'

হাঁফাতে হাঁফাতে অ্যাল্‌জার-এর দিকে চেয়ে মুচকি হাসল এড্রিস, ছোট-ছোট চোখদুটো ঝকমক করে উঠল।

'বলেছিলুম না? বলেছিলুম না, ওস্তাদ মেয়ে! বলেছিলুম না, মেয়েটার দ্বারা কাজ হবে!' টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে ইরার কোমরটা জড়িয়ে ধরে ঘরময় ঘুরে-ঘুরে নাচতে শুরু করে

দিলে এড্রিস। হাসতে-হাসতে সরে দাঁড়াল অ্যাল্জার। শেষ অবধি হাঁফাতে-হাঁফাতে দুজনে জড়াজড়ি করে গড়িয়ে পড়ল সোফার ওপর। দুহাতে ইরার মুখখানা তুলে ধরে তার কপালে সশব্দে একটা চুমু খেয়ে ফেললে এড্রিস।

খিলখিল করে হেসে উঠে ওকে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল ইরা।

মাটিতে থেবড়ি খেয়ে বসে মুখ তুলে ইরার দিকে চেয়ে এড্রিস বলে উঠল, 'আমার আদুরিটা রে! কেল্লা তা হলে ফতে! এত শিগগির হলো কী করে বলত, শুনি?'

'খুব সহজ। বাবা বেচারার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে একটা আইবুড়ো মাগি, দিনরাত পেছনে পেছনে ঘুরছে। বাবা ওকে মনের কথা-টথা বলে। দুহপ্তা তো মেজাজ দেখিয়ে কাটালুম, পপ্ রেকর্ড শুনলুম আর তিরিক্ষি হয়ে রইলুম। বাবা বেচারা বড় ভাবনায় পড়ল। বাবা ওকে ডেকে পাঠাল। আর, বললে বিশ্বাস করবে না, ঠিক যা ভেবেছিলুম, মেয়েটা তা-ই বললে।' উঠে দাঁড়িয়ে এড্রিস-এর দিকে আঙুল উঁচিয়ে অভিনয় করতে লাগল ইরা। 'মেয়েটার কাজ দরকার। ওকে তোমার ব্যাঙ্কে একটা চাকরি করে দাও, প্রিয়তম! মেয়েটার আসলে কাজ করা দরকার, সমবয়েসীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দরকার। বাবা আর না বলতে পারলে না। বললে, যদি সত্যিই আমার ইচ্ছে থাকে, ব্যাঙ্কে চাকরি করে দেবে। যদি চাই, আগামী কাল থেকেই কাজে লাগতে পারি।' মুখ ফ্যাঁচকালে ইরা। 'কাজ! মাকড়াগুলো সবাই এমন কাজ কাজ করে কেন?'

হো হো করে হেসে উঠল এড্রিস।

'ভালো লাগবে, সোনামণি! অত সব টাকাকড়ি, তারই আশেপাশে ঘুর-ঘুর করবে! ওহ্, আমি যদি তোমার জায়গায় যেতে পারতুম! ভেবে দেখ! রোজ সকাল নটা থেকে সন্ধে ছটা পর্যন্ত চারিদিকে শুধু কড়কড়ে টাকার পাহাড়!' হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ইরার দিকে এগিয়ে গেল এড্রিস, খেঁটে-খেঁটে হুটো হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরলে, ছোট্ট মুখখানা গুঁজে দিলে তার বুকের মাঝখানে। সুর করে বলে উঠল, 'সোনামণি, তোমায় আমি নিজের চেয়েও ভালোবাসি!'

এত জোরে ধাক্কা মারলে ইরা যে, টাল সামলাতে না-পেরে মাটিতে পড়ে গেল এড্রিস।

'হাত হুটো সামলে রেখ! বেশি গায়ে পড়ার চেষ্টা কোর না!'

মুখ তুলে পিট-পিট করে চাইলে এড্রিস। তারপর মুখে ম্লান একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

চেয়ারে গিয়ে বসতে বসতে বললে, 'কিছু খারাপ ভেবে করিনি। একটু রসিকতা করলুম। ওই রকমই ধারাআমার।'

'তোমার ধারা তোমারই থাকুক, আমার ধারাটা অন্য রকম।' ধপ করে সোফায় বসল ইরা।

অ্যাল্‌জার চুপচাপ বসে দেখতে লাগল, মুখে একটা শ্লেষের অভিব্যক্তি।

বললে, 'তোমাদের ধাস্টামোর পালা সাঙ্গ হয়ে থাকলে, এবার একটু কাজের কথা বললে হতো না?'

এড্রিস বললে, 'ব্যাঙ্কের কোন্ ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে, সেকথা ডিভন কিছু বলেছে ?'

ঘাড় নাড়লে ইরা। 'কাল সকালে স্টাফ ম্যানেজারের কাছে ইন্টারভিউ আছে। তিনিই ঠিক করে দেবেন, কোথায় কাজ করব।'

এড্রিস বললে, 'মনে করে বোল যে, অ্যাডিং মেশিন চালাতে জান। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ পাও, সেইটাই চাই।' ঝুঁকে বসল এড্রিস। 'বসে-থাকা সিন্দুকগুলো কোথায় থাকে, সেটা যদ্দিন না জানতে পারা যায়, তদ্দিন কাজে হাত দেবার উপায় নেই।'

'বসে-থাকা সিন্দুক···মানে ?'

'যেসব সিন্দুক অনেক দিন বসে আছে, মানে, যেসব সিন্দুকে অনেক দিন কোনও লেন-দেন হয়নি। এ রকম অনেক আছে। টেক্সাস-এর যত বড়লোকগুলো ছুটি কাটাতে আসে বছরে একবার, তখন সিন্দুক ভাড়া নেয়। ঠেসে টাকা রাখে, তারপর দেশে ফিরে যায়। পরের বছর আবার যখন ছুটিতে আসে, তখন খোলে। তদ্দিন অমনি-ই বন্ধ পড়ে থাকে। একবার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে পারলে, এই রকম অকেজো সিন্দুকেরও নম্বরগুলো জেনে নিতে পারবে। ঐগুলো নিয়েই তো আমাদের কারবার।'

'মাথা খারাপ!' চটে উঠেছে অ্যাল্‌জার। 'নম্বর জানলেই বা কী? ছুঁতে পারবে? পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ ব্যাঙ্ক। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা, সারা ব্যাঙ্কটা হাজার হাজার অ্যালার্ম-এ একেবারে ছেয়ে রেখেছে! কাছেই ঘেঁষতে পারবে না!'

'কাছে ঘেঁষতেই বা যাচ্ছে কে?' মুখ টিপে হাসল এড্রিস। 'আগে তৈরি হয়ে নিই, তারপর খুঁটিনাটি সব বলব। একাজে খুব সাবধানে এগোতে হবে। প্রথম: ইরার ব্যাঙ্কে চাকরি নেওয়া, তা সে তো কাল থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়: অকেজো সিন্দুকগুলোর খোঁজ নেওয়া। তৃতীয়: সিন্দুক ভাড়া দেওয়ার নিয়ম, চাবি, পাহারা—এই সবের খোঁজ-খবর নেওয়া। ধাপে-ধাপে···কাজ হাসিল করতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই।'

'এই করতেই কত দিন লাগাবে, কে জানে।' অ্যাল্‌জার বেশ ক্ষুব্ধ।

'এ সব কাজে সময় একটু নেবেই। তবে বছরখানেক লাগলেও ক্ষতি নেই, পুষিয়ে যাবে।'

আরও কিছু হয়তো বলত অ্যাল্‌জার, কিন্তু ইরার চোখের ভাব লক্ষ্য করে সামলে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলে, 'আমাকে কাজে লাগতে হবে কখন?'

'চারের ধাপে। ধৈর্য ধর, ফিল। সবুরে মেওয়া ফলবে।'

এড্রিস-এর দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করলে অ্যাল্‌জার, তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

ইরা বললে, 'এত চিড়বিড়িয়ে উঠছে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকালে এড্রিস। 'দেদার পয়সা ওড়াতে না-পারলেই ওর মেজাজ বিগড়ে যায়। আপাতত ওর হাতে পয়সা নেই।'

'আমাদের কাজে ওকে ঠিক কী ব্যাপারে দরকার হচ্ছে?'

'দেখতে পাবে। তোমাকে যেমন না-হলে নয়, ওকেও তাই, তবে অন্য ভাবে।—ডিভন-এর সঙ্গে এখন সম্পর্কটা কেমন?'

সোফায় আরাম করে বসল ইরা। 'যতটা পারি এড়িয়ে চলি। বড়লোকের সংসার যে এমন পানসে হয়, কে জানত বাবা! বেশি দিন থাকতে না-হলেই বাঁচি। আর কিছু দিন থাকলে পাগল হয়ে যাব!'

ইরাকে লক্ষ্য করতে লাগল এড্রিস, চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল।

'পঞ্চাশ হাজার ডলার তো আর ফালতু পাওয়া যায় না। তা, তোমার হলোটা কী? দামি পোশাক পেয়েছ, গাড়ি পেয়েছ, বাড়ি রয়েছে, টাকা পাচ্ছ···আর কী চাই?

'সবই তো বুঝি···তবু ব্যাজার লাগে·· ভীষণ ব্যাজার লাগে, সোজা কথা।'

'তবে ব্যাজারই হও। কাঙাল ভিখিরি হয়ে উপোস করে থাকার চাইতে ব্যাজার হওয়া ঢের ভালো। আর, শোন ইরা, খুব সাবধান, তোমার আগেকার সেই সব ফুর্তি-টুর্তির তাল করতে যেও না। একটু বেতাল হয়েছ, কি সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাঙ্কের বাইরে। ও ব্যাঙ্ক একেবারে ঠাকুরঘর। মেলভিল ডিভন-এর মেয়ে, তাই ঢুকতে পেরেছ কোনও রকমে। আর, বেশি চালাকি-টালাকি করতে যেও না। ওরা তোমার স্কুলে খোঁজ-খবর নিয়েছে··মানে নোরিনার স্কুলে। খুব ভালো করে পড়াশুনা করত, একেবারে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। ব্যাঙ্কে ঠিক ওই ধরনের মেয়েই চায়, মনে রেখ এখন তুমিই নোরিনা। যদি নেশা-ভাঙ কর, ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে লদ্‌কালদ্‌কি কর আর

ধরা পড়···ফট্! কাজের দফা গয়া।' সামনে ঝুঁকে বসল এড্রিস। মুখটা থমথমে আর লাল। 'তোমার ব্যাজার লাগছে বলে যদি আমাদের হাত গুটোতে হয়, তা হলে তোমার এমন হাল করব, কাগজওয়ালারাও তা ছাপাতে আঁৎকে উঠবে!'

এড্রিস-এর স্থির, চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে স্থাণুর মতো বসে রইল ইরা। একটু পরে উঠে দাঁড়াল।

বেপরওয়া তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলে উঠল, 'ভয় দেখিও না, বুড়ো আঙ্লা। আমিও তোমার এমন অবস্থা করতে পারি, কাগজওয়ালারা ছাপাতে ভয় পাবে।'

হঠাৎ হেসে উঠল এড্রিস।

'খুব হিম্মৎ তোমার, সোনামণি। বড় ভালো লাগল; তবে যা বললুম, মনে রেখ: ব্যাজার হতে আপত্তি কোর না, আর সামলে চোল।'

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ইরা বললে, 'এবার থেকে আর বেশি দেখা-সাক্ষাতের আশা কোর না, কারণ কাল থেকে পাকা চাকরে মেয়ে হয়ে যাচ্ছি। কিছু জানবার থাকলে দেখা করব। চলি, টিকি।' আস্তে-আস্তে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল ইরা।

রবিবার সকাল দশটার ঠিক পরেই জজ অ্যান্স্লির বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে হর্ন টিপলেন মেল ডিভন।

অপেক্ষা করছিল জয়, আওয়াজ পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে

এসে গেট খুলে ধরলে। পরনে কালো সোয়েটার, সাদা ঢিলে প্যাণ্ট, হাতে ঝোলা।

এখন গাড়ি চলছে প্রমিনেড-এর রাস্তা দিয়ে, প্যারাডাইস বে-র সমুদ্রতীরে। সেখানে ডিভন-এর একটা বীচ ক্যাবিন আছে।

'তোমায় অনেক ধন্যবাদ, নোরিনাকে নিয়ে আর কোনও ঝামেলা নেই। তুমি একেবারে খাঁটি কথাই বলেছিলে, ওর কাজের দরকার ছিল। ব্যাঙ্কে কাজ পাওয়ার পর থেকে একেবারে অন্য মূর্তি।'

'খুব আনন্দের কথা। কদ্দিন হলো?'

'হপ্তা দুয়েক তো বটেই···হ্যাঁ, দু সপ্তাহ আগের সোমবার ঢুকেছে।' ভুরু কোঁচকালেন ডিভন, জয়-এর দিকে দেখলেন। 'কী তাড়াতাড়ি দিনগুলো চলে যাচ্ছে! তার মানে দু সপ্তাহ তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি, জয়···কত দিন!'

'আমারও খারাপ লেগেছে।' কত দিন যে দেখা হয়নি, তার হিসাব মেল-এর কাছ থেকে শোনার প্রয়োজন ছিল না। রোজই ভেবেছে, টেলিফোন আসবে। 'খুব ব্যস্ত ছিলে নিশ্চয়ই!'

'তা ছিলুম। নোরিনাকে শহরটা চেনাচ্ছিলুম খুব ঘোরাঘুরি করেছি। সিনেমা, থিয়েটার, জলসা···সব!'

সামনের পথের দিকে চেয়ে রইল জয়।

'নোরিনার সঙ্গে আড়ো-আড়ো ভাবটা আর নেই তা হলে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' ডিভনের মুখটা একটু যেন

থমথমে হয়ে উঠল। 'সত্যি কথা বলতে কী, ওর নিজের বয়সী কোনও সঙ্গী পেলেই ভালো হয়, ওকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে পারে ; তাতে ওরও ভালো লাগবে, আমিও স্বস্তি পাব। আমার মনে হয়, আর কাউকে পায় না বলেই আমার সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করে। সেই জন্যেই ব্যাঙ্কের ক্লাবে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি। প্রথমে রাজি হচ্ছিল না, খানিকটা জোর করেই করিয়েছি। আর এখন, নিজেই রবিবারটা ক্লাবে কাটাবে বলে ঠিক করেছে।'

একটু স্বস্তি বোধ করল জয়। 'বন্ধু-টন্ধু জুটছে না কি ?'

'মনে হয়। ছেলেমেয়েদের বেশি জিগ্যেস-পত্তর করাটা বোধ হয় ঠিক নয়। বলেছি, ইচ্ছে হলে বন্ধু-টন্ধুদের বাড়িতে আনতে পারে, তা এখনও পর্যন্ত কাউকে তো আনেনি। মনে হচ্ছে বরফ গলেছে, তবে যাকে বলে স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা দিয়ে আপনার হয়ে যাওয়া, তা এখনও হয়নি।'

'তাড়াতাড়ি কি সব হয় ?'

'মনকে তা-ই তো বোঝাই, কিন্তু কেবলই মনে হয়, ও বোধ হয় একটু অন্য রকম, ধাতটাই বোধ হয় নরম নয়। সব সময়ে যেন একটা আড়াল দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছে।' কাঁধ ঝাঁকালেন ডিভন। 'তবু, হয়তো আস্তে-আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। বিনা ঝঞ্ঝাটে একবাড়িতে বাস করতে পারব অন্তত। কথাবার্তা তো বেশ বলে আজকাল। ওর মন্তব্য শুনলে মাঝে-মাঝে চমকে যেতে হয়। মুখ ফস্কে বেরিয়ে পড়ে··· এমনি কথার কথা, কারণ যখন চেপে ধরি, তখন আমতা আমতা করে। ছেলেমানুষ তো সেই জন্যেই বোধ হয়।'

'কী রকম ?'

'বোধ হয় ওর জীবনের ধারাটাই এর আসল কারণ। ওর মার কাছ থেকেই পেয়েছে সম্ভবতঃ। জীবন সম্বন্ধে ধারণাটা মোটেই মার্জিত নয়, বিবেকের বালাই বড় কম। খুবই আশ্চর্যের কথা, কারণ আমাদের ব্যাঙ্কের ক্রেশার ওকে কাজে বহাল করবার আগে ডক্টর গ্র্যাহামের কাছে যখন খোঁজ-খবর করেছিল, তখন বেশ সুখ্যাতিই করেছিলেন তিনি। হয় তাঁকে বোকা বানিয়ে এসেছে এতকাল, না হয় হঠাৎ বদলে গেছে।'

'এখনও কিন্তু ঠিক পরিষ্কার বুঝতে পারছি না, মেল।'

'এক্ষুনি ঠিক গুছিয়ে বলা মুস্কিল। হঠাৎ হঠাৎ এক একটা ব্যাপার ঘটে। হয়তো খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আল্‌টপ্‌কা একটা কথা বলে বসল। একজন লোক একটা জ্বলন্ত গাড়ি থেকে একটা বাচ্চা ছেলেকে বাঁচিয়ে শেষকালে নিজেই পুড়ে মারা যায়। নোরিনা বললে, লোকটা হাঁদা। একজন বৃদ্ধা মহিলার যথাসর্বস্ব চুরি গেছে। নোরিনা বললে, এত বয়েসেও যে নিজের টাকা সামলে রাখতে পারে না, তার চুরি যাওয়াই ভালো। গত সপ্তাহে খুব বড় একটা হীরে-জহরৎ চুরির ঘটনা হলো, মনে আছে? নোরিনা বললে, চোরটার বুদ্ধি খুব। ছোটখাট কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলুম। আমার সত্যিই মনে হয়, ওর বিবেক বলে কিছু নেই।'

'আরে ছি, ছি, ও কথা বল না, মেল। আজকালকার ছেলেমেয়েরা ঐ রকমই বলে। একটু নিষ্ঠুর, একটু রূঢ়, একটু হৃদয়হীন না-হলে সবাই বোকা বলে। তোমাকে ক্ষুণ্ণ করে হয়তো মজা পায়।'

'হয়তো তাই। অন্য ছেলেমেয়েদের কথা জানি না, কিন্তু নিজের মেয়ের বেলায় ঠিক পছন্দ করতে পারি না।'

'ডক্টর গ্র্যাহাম যখন অত সুখ্যাতি করেছেন, তখন ও নিজে কী বলে-না-বলে, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। ব্যাঙ্কে কেমন করছে?'

'কোনও গোলমাল নেই।' ডিভন-এর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ক্রেশারকে খুব জব্দ করেছে। ক্রেশার তো ওকে নিতেই চায়নি, আমার মেয়ে না-হলে নিতও না। ইণ্টারভিউ নেবার আগেই ডক্টর গ্র্যাহাম-এর কাছে খোঁজ-খবর নিলে। সব শুনে-টুনে বিশেষ আপত্তি করতে পারলে না। অঙ্কে বেশ মাথা। অ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টে কাজ করছে, ক্রেশার বলছে, কাজ না কি খুবই ভালো।'

'বাঃ, খুব ভালো কথা!'

একটু হেসে ডিভন বললেন, 'আমার ধাত পেয়েছে। ব্যাঙ্কের কাজ-কর্ম সম্বন্ধে খুব উৎসাহী। আমি তো বিশ্বাস করতেই চাইনি। সব সময়ে খালি প্রশ্নের পর প্রশ্ন···বেশ বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন সব। কাল রাত্তিরেই তো, হুম করে বলে বসল, আমরা যে আমাদের ব্যাঙ্ককে "পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ ব্যাঙ্ক" বলে বড়াই করি, সেটা নাকি ফাঁকা বুলি। আমাদের সব পাহারা-টাহারা বা আর যে সব নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে, খুলে বললুম; তখন অবশ্য স্বীকার করলে যে, কথাটা মিথ্যে নয়। যে রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে, বলা যায় না, আমাদের ব্যাঙ্কেই হয়তো একটা কেউ-কেটা হয়ে উঠবে!'

'আজকাল সেই বামনটার কাছে যায়-টায়?'

'না, সুখের কথা, যায় না। সীকম্ব-এ যাবার সময়ই পায় না। তবে, তাতে কোনও দুঃখ আছে বলেও মনে হয় না। এখন বাড়ি পেয়েছে, ব্যাঙ্ক পেয়েছে, ক্লাব পেয়েছে, ওকে ভুলেই গেছে।'

ঠিক এই সময়ে ইরাকে দেখতে পেলে ডিভন অবাক হতেন, বিরক্ত হতেন। টিকি এড্রিস-এর বাসাবাড়ির সামনে সে তখন গাড়ি রাখছে। তারই খানিক বাদে, এড্রিস-এর ফ্ল্যাটের দরজার বেল বাজাতে দেখা গেল তাকে।

এড্রিস দরজা খুলে ওকে পাশ দিলে। মুখটা গম্ভীর।

দুসপ্তাহ ইরার কাছ থেকেও কোনও খবর পায়নি। অনেক বারই মনে হয়েছে টেলিফোন করে, কিন্তু ইরা বলে গেছে, দরকার হলে নিজেই খবর দেবে। অ্যাল্‌জারও অনেক বার বলেছে টেলিফোন করতে, কিন্তু কান দেয়নি এড্রিস। ইরার ওপর বিশ্বাস রাখে। জানে, তাড়াহুড়োর কাজ নয়।

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললে, 'একটু ভাবনা হচ্ছিল। আরও আগে খবর পাব ভেবেছিলুম।'

শোবার ঘর থেকে অ্যাল্‌জার বেরিয়ে এল। টাকার তাগাদা দিয়ে হোটেলে বড় গোলমাল করছে, তাই রাত্তিরটা এখানেই ছিল।

বললে, 'যাক, সময় হলো! কদ্দুর? পুরো দুসপ্তাহ শালার বসে-বসে কড়িকাঠ গুনছি, কবে তুমি গতর নাড়বে! সুখে আছ, ভাবনা কী? কিন্তু আমার তো আর তা নয়? মামলা কদ্দুর'

চেয়ারে গিয়ে বসল ইরা। অনেকক্ষণ অ্যাল্‌জার-এর

দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অবজ্ঞায় মুখ কেঁচকে এড্রিস-এর দিকে চোখ ফেরালে।

'এই গবেটটাকে সামলাতে পার, ভালো, নইলে সোজা বেরিয়ে যাব ঘর থেকে। ফালতু বলছি না, সত্যিই যাব! মাকড়াটা ঝুলি ঝেড়ে ফতুর হবে আর ঝাল ঝাড়বে আমার ওপর!'

অ্যাল্‌জার কিছু বলে ওঠবার আগেই এড্রিস ধমকে উঠল, 'থাক! ওর ব্যাপারে একদম নাক গলিয়ো না, সাফ বলে দিচ্ছি!' ইরার দিকে ফিরে বললে, 'ঠিক আছে, সোনামণি, ওর কথা বাদ দাও। বল, কী রকম এগুচ্ছে?'

'প্রায় সব খবরই যোগাড় হয়েছে। অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে, খুব হুঁশিয়ার হতে হয়েছে, তবে শেষ অবধি সন্ধান পেয়েছি।' হাতব্যাগ খুলে ভাঁজকরা একটা কাগজ বার করলে। 'মুখপাতটা কেমন হয়েছে, দেখ!'

কাগজটা নিলে এড্রিস। ভাঁজ খুলে দেখলে। বললে, 'বসে-থাকা সিন্দুকের নম্বর?'

'সব কটা নয়, কয়েকটা। তবে এইগুলোর মালিকরাই হলো আসল কাপ্তেন। সিন্দুকে কী আছে, ব্যাঙ্কে তার কোনও রেকর্ড থাকে না। খদ্দেররা নিজেরা সিন্দুক খোলে, ভেতরে কী আছে বা কত আছে, সে বিষয়ে ব্যাঙ্কের কোনও দায়িত্ব নেই। তবে, যে রকম গাদা-গাদা টাকা তোলে, তাতে বেশ বোঝা যায় যে, সিন্দুকগুলো মালে ঠাসা।

'খোঁজ নিয়ে জেনেছি, টেক্সাস-এর পাঁচজন তেলের খনির

মালিক এই সপ্তাহের শেষে দেশে ফিরে যাচ্ছে। বাজিতে হাজার-হাজার ডলার জিতেছে। দেশে ফেরার আগে সমস্ত টাকাই যে সিন্দুকে রেখে যাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় সারিতে সেই পাঁচটা সিন্দুকের নম্বরগুলো আছে, দেখে নাও।'

দাঁতে-দাঁত-চেপে অ্যাল্‌জার বললে, 'শালার সিন্দুকের নম্বর দিয়ে কী হবে? সিন্দুকে কী মাল আছে, সেইটাই জানা দরকার!'

এড্রিস বা ইরা, কেউই ওর কথায় কান দিলে না।

এড্রিস বললে, 'চমৎকার, সোনা! এবার জানা দরকার, পাহারা-টাহারার ব্যবস্থাটা কী রকম।'

'সেটাও জেনেছি।' প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরাল ইরা। 'বাবার সঙ্গে কথা বললুম। ভাবলে, আমি বুঝি পেশাদার চাকরে হতে চাইছি। কী ভাবে কী হয়, সব আমায় খুলে বললে। বাবা না-জানলে কেই বা জানবে ওসব ব্যাপার।'

সামনে এগিয়ে ঝুঁকে বসল এড্রিস। চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

'কী ভাবে কাজ হয়?'

'একটা কথা বলে রাখি: রাত্তির বেলা ব্যাঙ্কে ঢোকবার কথা ভুলে যাও। ছজন সশস্ত্র পাহারাদার আছে, প্রত্যেকেই বাছা-বাছা বিশ্বাসী লোক। ওদের নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যাওয়া মানে জ্বলন্ত বোমা নিয়ে খেলা করা। সারা রাত কুকুর নিয়ে পাহারা দেয়। সিন্দুক থাকে ব্যাঙ্কের একতলারও

নিচে, মাটির তলাকার ভল্ট-এ, তিন ইঞ্চি পুরু ইস্পাত দিয়ে মোড়া, তার ওপর চার ফুট পুরু কংক্রিটের দেওয়াল। ব্যাঙ্ক যখন বন্ধ হয়, পুরো ভল্টটাকে জলে ভরিয়ে দেওয়া হয়। সকাল ছটার সময়ে আপনা থেকেই জল বেরিয়ে যেতে থাকে। তারপর যান্ত্রিক উপায়ে গরম হাওয়া চালিয়ে শুকিয়ে খটখটে করে নেওয়া হয়। কাজেই, রাত্তির বেলা ভল্ট ভেঙে ভেতরে ঢোকবার মতলব থাকলে, সোজা বাতিল করে ফেলতে পার।'

হাতের সিগারেটটার ওপর ঝাল ঝাড়লে অ্যাল্‌জার, গায়ের জোরে ছাইদানিতে ঘষড়ে-ঘষড়ে নিবিয়ে দিলে।

'বরাবরই বলে আসছি, সিন্দুকের নাগাল পাওয়া অসম্ভব! অ্যাদ্দিন শুধু শুধু খেটে মরলুম!'

এড্রিস অ্যাল্‌জার-এর দিকে ফিরেও তাকালে না, ধমকের সুরে বলে উঠল, 'ঢের হয়েছে, থাম!—দিনের বেলার অবস্থাটা কী রকম, সোনামণি?'

'সেও বেশ কড়াকড়ি। বারোজন পাহারাদার ঘুরে-ঘুরে পাহারা দেয়। ভল্ট-এ যাবার যে জালি-কাটা লোহার দরজা, তার সামনে দুজন বন্দুকধারী সেপাই। যেমন দশাসই তেমনি জোয়ান, দেখলেই ভয় করে। সমস্ত জায়গাটাময় বিপদ-সঙ্কেতের ব্যবস্থা, কোথাও ফাঁক নেই। বাবার মুখে শুনলুম, কুড়িজন মিলেও যদি বোমা-টোমা বন্দুক-টন্দুক নিয়ে ডাকাতি করতে যায়, কাঁচকলা খাবে। গুলি-নিরোধক কাচের তৈরি একটা উঁচু ঘর থেকে একজন পাহারাদার সব সময়ে লক্ষ্য রাখে, কে এল, কে গেল। সে নাগালের বাইরে। একটু গণ্ডগোল হলেই, সে একটা বোতাম টিপে দেবে,

বেরুবার পথ বন্ধ। ভল্ট-এর মধ্যে জল থৈ থৈ করবে, থানায় সঙ্কেত চলে যাবে। কাজেই ব্যাঙ্ক যখন খোলা থাকে, তখন ফাঁকি দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করা বৃথা, পাখি-টাখি হলে হয়তো হয়।'

খিলখিল করে হেসে উঠল এড্রিস, জোরে-জোরে হাত ঘষতে লাগল।

'খুব ভেবে-চিন্তেই ব্যবস্থা করেছে, তাই না সোনামণি? এবার বল তো, শুনি, ভল্টে কারা কারা ঢুকতে পায়?'

'খদ্দেররা।'

'আর কেউ না?'

হাসল ইরা। 'এইবার আসল কথায় এসেছ। হ্যাঁ, আরও একজন যেতে পারে। একজন রিসেপ্‌শানিস্ট আছে, সে খদ্দেরদের ভল্ট-এ নিয়ে যায়।'

ঘাড় নাড়ল এড্রিস। 'মহিলা তো? জানি। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'হয়েছে। নাম ডোরিস কার্বি। তেত্রিশ বছর বয়েস, আট বছর কাজ করছে। ওকে বাগাতে পারা যাবে না।'

'কোথায় থাকে, জান?'

'না, তবে জেনে নিতে পারি।'

ঘাড় নাড়ল এড্রিস। 'জেনে নাও, সোনা, তাড়াতাড়ি জেনে নাও। পেলেই টেলিফোনে ঠিকানাটা জানিয়ে দিও, খুব জরুরি।'

'ঠিক আছে।'

'ওর কাজটা কী? মানে ও ঠিক কী করে? কিছু জান?'

আরও একটু গুছিয়ে বসল ইরা। 'মনে কর, তুমি হলে খদ্দের, সিন্দুক ভাড়া নিতে চাও। ব্যাঙ্কে গিয়ে একটা ফর্ম ভর্তি করবে। নাম, ধাম, টেলিফোন নম্বর দেবে; কদ্দিনের জন্যে ভাড়া নিচ্ছ আর কত ঘন-ঘন সিন্দুক খুলতে আসবে, মোটামুটি একটা হদিশ দিতে হবে। তোমায় একটা চাবি দেবে। যদি হারিয়ে ফেল, সিন্দুক ভাঙতে হবে, বাড়তি চাবি থাকে না। প্রত্যেক সিন্দুকের দুটো করে গা-তালা। তোমার কাছে একটার চাবি, আর অন্যটার চাবি ব্যাঙ্কের কাছে। এই চাবিটা সব সিন্দুকেই লাগে। দুটো চাবি না-হলে কোনও সিন্দুকই খুলবে না।

'ব্যাঙ্কের যে মূল চাবি—'পাশ কী'—সেটা থাকে কার্বি বলে মেয়েটার কাছে। ব্যাঙ্ক বন্ধ করে চলে যাবার সময়ে সেটা সেপাইয়ের কাছে জমা করে দেয়। যদি সিন্দুক খুলতে যাও, প্রথম ঐ জালি দেওয়া লোহার দরজার কাছে সেপাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। চাবি দেখাবে—সব চাবিতেই নম্বর আছে। নম্বর দেখে তোমার নাম-ধাম সে যাচাই করে নেবে। ওর কাছে খদ্দেরদের ফোটো থাকে, তাও মিলিয়ে দেখে নেবে। প্রত্যেক চাবির মালিককে আলাদা-আলাদা একটা করে সঙ্কেতবাক্য বলে দেওয়া হয়; সেই সঙ্কেতবাক্যটা বলতে হবে।

'সব যদি মিলে যায়, তখন তোমায় সেই লোহার দরজার চৌকাঠ পার হতে দেবে। ভেতরে সিঁড়ি আছে, তারই নিচে চেয়ার-টেবিল নিয়ে কার্বি বসে থাকে। তুমি নম্বর বলবে, সে তোমাকে সঙ্গে করে 'ভল্ট'-এর ভেতরে নিয়ে যাবে,

তোমার সিন্দুকের কাছে পৌঁছে দেবে। 'পাশ কী' দিয়ে প্রথম গা-তালাটা খুলে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে আসবে। তুমি তোমার চাবি লাগিয়ে সিন্দুক খুলবে, কিছু রাখবার থাকলে রাখবে, নেবার হলে নেবে, কাজ শেষ হলে বেল বাজাবে। কার্বি ফিরে এসে চাবি লাগিয়ে দেবে, তারপর তোমায় ঐ লোহার দরজার কাছে পৌঁছে দেবে। এই হলো কার্বির কাজ।'

ক্রুর হাসি দেখা দিল এড্রিস-এর মুখে! 'চমৎকার, সোনা, চমৎকার,! ভেবেছিলুম এত সব খবর যোগাড় করতে মাস-খানেক অন্তত লাগবে। ওস্তাদ মেয়ে বটে!'

অ্যাল্‌জার আর সামলাতে পারলে না। 'এত সব ঝামেলা শুনেও বলছ, চমৎকার! বেশ, এবার বল তো, সিন্দুকে হাত দেবে কী করে, কোন্‌ ফন্দিতে টাকাগুলো হাতাবে? ওদের কী ব্যবস্থা আছে-না-আছে, সে সব খুঁটি-নাটি চুলোয় যাক। টাকাটা বাগাবে কী করে, বল!'

'ফিল, দোস্ত আমার, এইখানেই তোমার কাজ শুরু হচ্ছে। অ্যাদ্দিন বসে বসে ভুঁড়িতে হাত বুলিয়েছ, এবার কাজের পালা।

'তোমার প্রথম কাজ হলো, মিস কার্বিকে সরানো। মারাত্মক কিছু করতে হবে না। হপ্তাখানেক যাতে ছুটি নিতে হয়, তারই ব্যবস্থা করতে হবে। পারবে?'

থতমত খেয়ে গেল অ্যাল্‌জার। 'খুলে বল, শুনি···ওকে সরাতে চাইছই বা কেন?'

'কারণ, আমাদের এই সোনামণিটি ওর জায়গায় বসবে। বসবে না, আদুরি?'

'সেটা কিন্তু ক্রশার-এর হাতে।'

মুচকি হেসে এড্রিস বললে, 'না, তার ওপরেও একজনের হাত আছে। তোমার বাবা, সোনামনি। তোমার বাবার কর্তৃত্ব অনেক বেশি খাটে ব্যাঙ্কে। বাবাকে বলবে যে, ব্যাঙ্কের মালদার খদ্দেরদের সঙ্গে চেনা-শুনো হওয়া দরকার এবং এই-ই তার সুযোগ। কার্বি তো আর বেশি দিন কামাই করছে না, এই কটা দিনের সুযোগে খানিকটা অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে তোমার—দেখবে, আপত্তি করবে না। বাবাকে ঠিকমতো বুঝিয়ে বল্‌লে কোনও গোলমাল হবে না।'

এতক্ষণে অ্যাল্‌জার যেন একটু উৎসাহ পেল। ঝুঁকে বসে বললে, 'ইরা পাশ কী-র ছাপ নেবে, তাই, না?'

'শুধু পাশ কী-র নয়, খদ্দেরদের চাবিরও নেবে··· বিশেষ করে টেক্সাস-এর ঐ পাঁচটা খদ্দেরের।'

'কী করে নেবে? এক্ষুনি তো বললে, খদ্দেরদের চাবি খদ্দেরদের কাছেই থাকে। হাতে পাবে কী করে?'

'ছেনালি করে।' মেয়েলি ঢঙে বলতে লাগল এড্রিস, 'চাবিটা যদি আমার হাতে দেন গবুচন্দ্রবাবু, তা হলে আমিই আপনার সিন্দুকটা খুলে দিই।'

'এই টেক্সাস-এর বড়লোকগুলো বড় বেরসিক। হয়তো বলে বসবে, গোল্লায় যাও।'

'তুমি হলে এই রকম একটা মেয়েকে গোল্লায় যেতে বলতে পারতে, ফিল?'

ইরাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল অ্যাল্‌জার। ইরা জিভ ভ্যাঙালে।

'তা, কথাটা মন্দ বলনি। কী দিয়ে ছাপ নেবে?'

'বাঁ হাতে একটু পুটিং রাখবে। চাবি তৈরির ভার তোমার। তুমি বরং ওকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও ঠিক কী ধরনের হলে ভালো ছাপ উঠবে।'

'চাবি তৈরি করা শক্ত হতে পারে। কী রকম গোলমেলে কল, কে জানে।'

'ভুল করছ। অমন কড়া ব্যবস্থা রয়েছে যখন, তখন চাবিতে অত ক্যার্দানি থাকবে কেন। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, চাবি আর তালা খুবই সাধারণ। যাই হোক, কালই টের পাওয়া যাবে। একটা চাবি তোমার কাছেই থাকবে। তোমার নিজের ব্যবহারের জন্যে।'

'সে আবার কী?'

'কাল তুমি ব্যাঙ্কে যাচ্ছ, একটা সিন্দুক ভাড়া করছ। খবরের কাগজের টুকরো ভরে বেশ মোটাসোটা একটা খাম সঙ্গে নেবে। বলবে, বাজি-জেতার টাকা। বলবে, এখন কয়েক দিন রোজই টাকা তুলতে আসবে, রাখতে আসবে। ডোরিস কাবির সঙ্গে দেখা হবে। ভালো করে চিনে রাখবে। খামটা সিন্দুকে রাখবে, চাবি নিয়ে চলে আসবে। তখন ভালো করে দেখে-শুনে নিয়ে টের পাবে, চাবি তৈরি করতে ঝঞ্ঝাট হবে কি না। সন্ধেবেলা মিস কাবির একটা ব্যবস্থা করে ফেল—অসুখ-বিসুখ হতে পারে, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, পেটের যন্ত্রণা হতে পারে, যা হোক একটা মতলব করে নিও—মোটকথা ওকে হপ্তাখানেক ব্যাঙ্কের বাইরে রাখতে হবে। তবে, একটা কথা ভুলে যেয়ো না, ও হেঁজি-পেঁজি কর্মচারী নয়, দায়িত্বশীল কাজ

করে, কাজেই গোলমেলে কিছু ঘটলেই ওদের টনক নড়তে পারে ; পুলিশ-ফুলিশের হুজ্জুত যাতে না-হয়, খেয়াল রেখ। কাজেই, খুব সাবধানে কাজ কোর, ফিল।'

ভুরু কুঁচকে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল অ্যাল্‌জার।

খানিক বাদে বললে, 'আমার গাড়িটা নিয়ে টুক করে একটু ধাক্কা দিলে কেমন হয় ?'

'ধাক্কা মেরে কেটে পড়া, পুলিশের হাঙ্গামা।'

'একা থাকে ?'

ইরা বললে, 'হ্যাঁ, একাই থাকে। একেবারে সব উঁচু তলার একটা ফ্ল্যাটে। নিজেই আমায় বলেছে।'

'যদি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, তা হলে সিঁড়ির শেষ মাথায় আড়া-আড়ি একটা সুতো বেঁধে রাখলেই কাজ হবে। তাতে চলবে ? পা ভাঙলে হবে ?'

এড্রিস বললে, 'খুব হবে। শুধু ঘাড় না-ভাঙলেই হলো। পুলিশের হাঙ্গামা হয়, এমন কিছু যেন না-ঘটে।'

ইরার দিকে চেয়ে অ্যাল্‌জার বললে, 'ঠিকানাটা দিও। পেলেই জায়গাটা দেখে আসব।'

ঘাড় নাড়লে ইরা, তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল।

'আর কিছু আছে, টিকি ? আমার এখন ক্লাবে থাকার কথা। বাবা হয়তো টেলিফোন করে বসবে। সেখানে না-পেলে সন্দেহ করতে পারে।'

'আপাতত আর কিছু নেই, সোনা। খুব ভালো কাজ দেখিয়েছ। সত্যি বলছি, আমি তাজ্জব হয়ে গেছি। এই ভাবেই

চালিয়ে যাও, এত টাকা পাবে যে, পুড়িয়েও শেষ করতে পারবে না।'

'তুমি কি ভাবছ, তা নইলে শুধু-শুধু ব্যাগার খাটছি?' দরজার কাছে এগিয়ে গেল ইরা। 'চলি, টিকি।' অ্যাল্‌জারকে বললে, 'এবার তোমার খেলটা দেখা যাক গবুচন্দ্র। এবার একটু খেটে খাও।' বেরিয়ে গেল ইরা।

অ্যাল্‌জার-এর মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। 'কুত্তিটাকে একবার হাতে পেলে হয়। যখন নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে বার করব, কেমন চেঁচায়, একবার শুনতে ইচ্ছে করে!'

খিক-খিক করে হেসে উঠল এড্রিস। 'হবে, হবে, ফিল, ধৈর্য ধর। এত অল্প বয়েসে অত টাকা হাতে পাওয়াটা ওর পক্ষে ভালো নয়!'

সিগারেট ধরাল অ্যাল্‌জার। 'একটা কথা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি সিন্দুক ভাড়া করব কেন?'

'ওফ, দোহাই তোমার! একটু মাথা খাটাও। ইরার কাজ হবে অন্য সিন্দুক থেকে টাকা সরিয়ে তোমার সিন্দুকে ভরে রাখা। তুমি রোজ গিয়ে নিজের সিন্দুক খুলে টাকা বার করে নিয়ে আসবে—ব্যাঙ্ক ভাববে তোমারই টাকা। তা নইলে ভল্ট থেকে টাকা বার করে আনবার আর কোনও রাস্তা আছে, ভাব? তোমার কাছে নকল চাবি, ইরা আমাদের লোক—বুঝতে পারছ না, কাজটা কেমন জলের মতোন সোজা হয়ে যাচ্ছে? কার্বি যদ্দিন কামাই করবে, তদ্দিন ইরাই সর্বেসর্বা। যে সব সিন্দুক খুলতে পারবে, সেই সব সিন্দুক থেকে টাকা সরিয়ে-সরিয়ে তোমার সিন্দুকে বোঝাই করতে থাকবে। সব

কটাহ্ বুসে-থাকা সিন্দুক, কাজেই টাকা সরানোর ব্যাপারটা টের পেতে প্রায় বছর ঘুরে যাবে। আর আমরা তদ্দিনে পগার পার।'

হাঁ করে চেয়ে রইল অ্যাল্‌জার।

খানিক বাদে চোখ বড় বড় করে বোকার মতো বলে উঠল, 'আইব্বাস!'

'বড় মধুর, না?' একটু থামল এড্রিস। 'কোটি-কোটি টাকা সরাতে হবে। এমন মজার চুরির কথা আগে কেউ কখনও ভেবেছে?' পিছনে হেলে পড়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে, 'য়েপ্পি-ই-ই-ই!'

৫

পরের দিন, সকাল তখন সোয়া নটা, আপিসের কাগজ-পত্র নিয়ে টেবিল সাজিয়ে বসে ছিলেন মেল ডিভন। ঘরের লাগোয়া একটা লিফ্‌ট আছে, সেটা নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে। ঘর থেকে সোজা লিফ্‌টে চড়া যায়। বড়-একটা ব্যবহার করেন না, হেঁটেই ওঠা-নামা করেন, যাতায়াতের পথে কর্মচারীদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলা যায়।

এখন হঠাৎ সেই দরজায় টোকা পড়তে একটু অবাক হলেন। আবার টোকা পড়ল। ঘটনাটা বেশ অপ্রত্যাশিত এবং অস্বাভাবিক। সেক্রেটারি মিস অ্যাশলে-কে ডেকে দেখতে বলার জন্যে বেল টিপতে যাচ্ছিলেন, দরজার ফাঁক দিয়ে চাপা গলার আওয়াজ এল, "বাপি···আমি।"

হাসি ফুটে উঠল ডিভন-এর মুখে। উঠে দরজা খুলতে এগিয়ে গেলেন। মিস অ্যাশ্‌লে যদি টের পায়, এই রকম কাজের সময় কর্তাকে কেউ বিরক্ত করছে, তা হলে তার সাহস দেখে অবাক হবে তো বটেই, সঙ্গে-সঙ্গে চটেও যাবে খুব। পাশের ঘর থেকে টাইপ রাইটারের খুট খুট শব্দ আসছে, তার মানে মিস অ্যাশ্‌লে খেয়াল করেনি।

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিলেন ডিভন।

ইরা ভিতরে ঢুকে এল। চোখে সারল্য, ঠোঁটে নিশ্চিন্ততার স্মিত হাসি। ছাই-ছাই রঙের ফ্রক পরেছে—কলার আর

আস্তিন সাদা, কোমরে কালো চামড়ার চওড়া পটি। বড়-বড় খোলা জানলা দিয়ে রদ্দুর পড়েছে তার মুখে, চুলগুলো মাজা তামার মতো ঝক-ঝক করছে।

ডিভন কিছু বলবার আগেই চাপা গলায় ফিসিফিসিয়ে উঠল ইরা, 'জানি···জানি, বাপি, তোমায় বলতে হবে না। আমি জানি এখন এভাবে আমার আসা উচিত হয়নি, মিস অ্যাশ্‌লে জানতে পারলে রক্ষে রাখবে না। কিন্তু, কী করব বল, বিশেষ দরকার।'

চেয়ারে বসে ডিভন বললেন, 'এই ভাবে আমার ব্যক্তিগত লিফ্‌ট ব্যবহার করে এমন সময়ে আমার ঘরে ঢুকে যে অন্যায় করেছে, স্বীকার করছ তো?'

কয়েকটা কাগজ সরিয়ে জায়গা করে নিল ইরা, টেবিলের ওপর বসে ফ্রকের তলাটা ঠিক করে নিলে। বড় মোহনীয় দেখাচ্ছে ইরাকে; হাসি-হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে, গলে গেলেন ডিভন।

'আর কখ্‌খনও করব না বাপি, কিন্তু ব্যাপারটা খুবই জরুরি। ডোরিস কাবির একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমি ভল্টে ওর জায়গায় কাজ করতে চাই।'

পিছনে হেলান দিয়ে আড় হয়ে বসলেন ডিভন।

'কী করে জানলে? গুরুতর কিছু?'

'একতলার সবাই তো বলাবলি করছে। বেশ লেগেছে: হাত ভেঙেছে, তিনটে পাঁজরে চিড় খেয়েছে। বোকার মতো সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছল কাল সন্ধেবেলা। শোন, বাপি, ডোরিস-এর জন্যে দুখ্‌খুটা পরে করলেও চলবে। এক্ষুনি

যেটা আগে ভাবা দরকার, সেটা হলো, আমি ওর জায়গায় বসতে চাই। সেই জন্যেই তোমার কাছে এসেছি। তুমি ক্রেশারকে গিয়ে বল যে, ডোরিস যদ্দিন না ভালো হয়ে ফিরে আসে, আমি ওর জায়গায় কাজ করব। ক্রেশার অন্য কারও কথা ভেবে ফেলবার আগেই এক্ষুনি তুমি ওকে বলে দাও।'

'এ আমি কিছুতেই···' আর বলতে দিলে না ইরা, তাঁর মুখে হাত চাপা দিয়ে দিলে।

'কেন বাজে কথা বলে পরে মনে দুখ্খু পাবে! এখন আমার কথাটা শোন তো মন দিয়ে। দেখ, সত্যিই যদি তোমাদের এই ব্যাঙ্কের বা তোমার কোনও উপকারে লাগতে হয়, তা হলে আমার অনেক কিছু জানা দরকার, শেখা দরকার। তোমাদের বড়-বড় খদ্দেরদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকা তো নেহাৎ-ই দরকার। তুমি হলে ব্যাঙ্কের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, আমি তোমার মেয়ে। তারাও নিশ্চয় আমার সঙ্গে আলাপ করতে পারলে খুশি হবে, আমি তো হবই। খদ্দেরদের সঙ্গে ব্যক্তিগত জানা-শোনা হবে না অথচ ব্যাঙ্কের ভালো-মন্দের ব্যাপারে মাথা ঘামাব, তা কি হয়, বাপি, বল? ব্যক্তিগত একটা সম্পর্ক গড়ে উঠলে, কাজ করতেও একটা আনন্দ আসবে। সত্যি কথা ভেবে দেখ, ডোরিস-এর বদলে উপযুক্ত কাউকে পাওয়া দুর্ঘট—ক্রেশার-বুড়ো বেশ ভাবনায় পড়বে। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট-এর মেয়ে আমি, কাজেই ভল্টে ঢোকবার পক্ষে বাধা নেই। এবার বুঝতে পারছ তো যে, আমিই হলুম সব দিক থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্রী—বিশেষ করে নিজেরও যখন ইচ্ছে রয়েছে!'

মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন ডিভন। ভাবলেন, মিউরিয়েল-এর সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল। বিয়েটা টিকল না বলে হঠাৎ বুকের ভিতরটায় একটু টন-টন করে উঠল। জোর করে মত আদায় করবার সময়ে মিউরিয়েল ঠিক এই রকমই করত।

নোরিনার মধ্যেও সেই একই মন-কাড়ানো মাধুর্য, জেদ আর হিসেবি আতুরেপনার লক্ষণ দেখতে পেলেন তিনি।

'ডোরিস-এর কাজটা খুব সুখের নয়, নোরিনা। সারাদিন ভল্টের মধ্যে বসে থাকতে হবে। ব্যাজার লাগবে, দেখ।'

'কম্পিউটার চালানো বুঝি খুব সুখের? দেখ, একটা কথা মনে রেখ, বাপি, মজা করবার জন্যে আমি ব্যাঙ্কে ঢুকিনি। ব্যাঙ্কের কাজ-কর্ম ভালো করে শিখতে এসেছি।'

'আরে, যাঃ!' হেসে উঠলেন ডিভন। 'এটা আমি বিশ্বাস করতে পারব না, যাই বল আর তাই বল। যাই হোক, হঠাৎ ভল্টে কাজ করবার বাই চাপল কেন?'

'পৃথিবীর সেরা কয়েকজন বড়লোকের সঙ্গে আলাপ করব বলে···আবার কেন। বড়লোকরা আমার কাছে একেবারে নতুন ধরনের জীব। আমি ওদের দেখতে চাই, বুঝতে চাই, ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই!'

ইতস্তত করতে লাগলেন ডিভন, তারপর কাঁধ ঝাঁকালেন। কথাটা খারাপ বলেনি নোরিনা। ব্যাঙ্কের কাজে তার উৎসাহের পরিচয় পেয়ে খুশিই হলেন।

বললেন, 'ক্রশার কী বলবে, কে জানে।'

'ওর মত জিগ্যেস না-করে ওকে সোজা বলেই দাও না,

বাপি। তুমি হচ্ছ বড়-কর্তা। তুমি আবার জিজ্ঞেস করবে কী? তুমি হুকুম করবে।' টেলিফোনটা তুলে নিয়ে অপারেটরকে বললে, 'মিঃ ডিভন-এর লাইনে ক্রুশারকে দিন তো।' একটু মোহিনী হাসি হেসে রিসিভারটা ডিভন-এর হাতে তুলে দিলে।

লাঞ্চের সময় গাড়ি নিয়ে বেরুল ইরা। প্রমিনেড বরাবর অনেকখানি গিয়ে সরু একটা গলির মধ্যে ঢুকল। ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামালে।

বার-এর একেবারে শেষের দিকে বসে ছিল অ্যাল্জার। সামনে মদের গেলাস, ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলন্ত সিগারেট।

পাশে গিয়ে বসল ইরা, কোকাকোলার হুকুম দিলে। বাধ্য হয়েই দাম মেটালে অ্যাল্জার। বারম্যান অন্যদিকে সরে যেতেই হাতব্যাগ খুলে কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স বার করলে। অ্যাল্জার-এর হাতে গুঁজে দিলে।

ওর দিকে না তাকিয়েই বললে, 'চাবির ছাপ। টিকিকে বোল, কোনও গোলমাল হয়নি। অন্য চাবিগুলোর ছাপ পেলেই, দিয়ে দেব।'

বাক্স খুলে পুটিং-এর ডেলার গায়ে চাবির ছাপটা দেখে নিলে অ্যাল্জার। বুঝলে, চাবি বানাতে মোটেই ঝঞ্ঝাট হবে না। ঘাড় নাড়লে।

'কাজ হবে।'

গেলাস শেষ করে টুল থেকে হড়কে নেমে পড়ল ইরা।

ইরার শরীরটার দিকে চোখ বোলাতে-বোলাতে অ্যালজার বললে, 'তাড়াহুড়ো করছ কেন? পিৎসা খাওয়াব।'

'নিজে খাও, আমার দরকার নেই।' চট করে বেরিয়ে পড়ল ইরা, গাড়িতে উঠে প্রমিনেড ধরে ফিরে চলল। যে দোকানে সাধারণতঃ খায়, তার সামনে থামল। ভিতরে ঢুকে খাবার আনতে বললে। খেতে-খেতে নানান কথা পাক খেতে লাগল তার মাথায়।

এক মাস হলো নিউ ইয়র্কে নেই। গরিব থেকে হঠাৎ বড়লোক বনে গেলে যে রকম মারাত্মক একটা কিছু হবে বলে ভেবেছিল, তার কিছুই হয়নি। ভেবে দেখলে, এখানে এসে পর্যন্ত একটি মুহূর্তের জন্যেও সত্যিকার সুখ পায়নি। কেন পায়নি, জানে। হেস ফার-এর সঙ্গে মিলে-মিশে ভোগ করতে না-পারলে বড়লোকি চালে থাকাই বা কী, গাড়ি চড়াই বা কী আর একগাদা হাতখরচ পাওয়াই বা কী! হেস ফার ছাড়া জীবনটা বোদা, পানসে, অস্পষ্ট ছবির মতো ঝাপসা। সন্ধের ফুর্তির পর সপ্তাহে অন্তত চারটে দিন ফার তাকে তার নোংরা আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলত।...খেতে খেতে সেই সব রাত্রের কথা ভেবে ইরার সারা দেহ লালায়িত হয়ে উঠল ফার-এর জন্যে।

এবার যখন ভল্টে ঢোকবার কাজটা হাসিল করে ফেলেছে, আর দেরি করার দরকার নেই। বেশ কিছুদিন থেকেই ভাবছিল, হেসকে আসতে বলা উচিত। আসবে কি আসবে না, সেটা পরের কথা। কেন না, অন্য কোনও মেয়ে হয়তো জুটিয়ে ফেলেছে এর মধ্যেই। প্রাণভরে দেহটাকে ভোগ করেছে ফার, একসঙ্গে ঘুরেছে, কিন্তু মনের দিক থেকে কোনও আকর্ষণ বোধ করে কি না, আঁচ করতে পারেনি। চিঠি লিখে

ফারকে আসতে বললে, বোঝা যাবে হয়তো। যদি না আসে, চুকে গেল, আর যদি আসে…

দাম চুকোবার সময়ে মাথায় এল, প্যারাডাইস সিটিতে ফারকে আনাটা বিপজ্জনক। ফারকে ঝুঝিয়ে বললে কি আর মানবে না? এতই বোকা? বুঝতেই পারবে, ইরার অসুবিধাটা কোথায়। মেল ডিভনকে নিশ্চয়ই এড়িয়ে চলতে হবে, তার চোখে পড়লে চলবে না। ফার যে ইরার কাছে এসেছে, টিকি বা অ্যাল্‌জার যেন ঘুণাক্ষরেও টের না-পায়।

নিউ ইয়র্ক থেকে মায়ামি পর্যন্ত প্লেনের টিকিট কিনে পাঠাতে হবে। কত লাগে, কে জানে। খরচের টাকাও দিতে হবে। টাকার দরকার হলে চুরি করতো ফার। এখানে তা করতে দেওয়া যায় না।

গাড়িতে উঠতে-উঠতে মাথায় এল, হাতে বেশ কিছু পুঁজি না-নিয়ে ফারকে আসতে বলা মানে ঝঞ্ঝাট ডেকে আনা। প্রথমবার সিন্দুক থেকে যে টাকা হাতাবে, সেটা ফার-এর প্রাপ্য হোক। এইটাই সোজা সমাধান।

তবু, একটা কিসের অস্বস্তি যেন খচ খচ করছে। এড্রিস-এর শাসানির কথাটা মনে পড়ছে। লোকটা সাপের মতোই ভয়ঙ্কর, তাকে ধোঁকা দিতে হবে। টান-টান হয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল ইরা। মনে-মনে বললো একটা বামনকে আবার ভয়! হেসকে কাছে পেতে ইচ্ছে করছে, কাছে আনবে।

চাপ-চাপ মাংস আর ঠেলে-ওঠা পেশী-দিয়ে-গড়া ছ ফুট একখানা শরীর, ফুলে-ওঠা ধমনীর গোলকধাঁধায় জটিল চামড়া, ব্রণর দাগে-ভরা ফোলা-ফোলা নাক—হিয়াম ওয়ানাসী পাক্কা একজন ষণ্ডা-গুণ্ডা কোটিপতি টেক্সান।

প্যারাডাইস সিটিতে ছ সপ্তাহের ছুটি ফুরিয়েছে, আজই শেষ দিন। আজই রাত্তিরের প্লেনে সস্ত্রীক টেক্সাস ফিরে যাচ্ছে, মন খারাপ করেই ফিরে যাচ্ছে।

টেক্সাস-এর সেই আঁধি, সেই ঝোড়ো বাতাস আর পাগল-করা কাজের চাপের কথা ভাবলেই মনটা দমে যায় বৈকি। তেষট্টি বছর বয়সে আপিসের ঝামেলা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা খনিতে গিয়ে তদারকি করে কাটানো, রাতদিন টেলিফোনের ঘড়-ঘড়ানি সত্যিই বড় ব্যাজার লাগে। খুশিমতো চলতে পারলে, ছেলের ওপর সব ভার দিয়ে প্যারাডাইস সিটিতে এসে আরামে বসে থাকত। সমুদ্রের ধারে অলস বসে থাকা, একটুকরো বিকিনি-ঢাকা মেয়েগুলোকে তারিয়ে-তারিয়ে দেখা, হুইস্কি গেলা, সমুদ্রের মাছ-টাছ দিয়ে দিব্যি করে খাওয়া, আর সন্ধে-বেলা ক্যাসিনোতে গিয়ে জুয়া খেলা—এর কোনও তুলনা হয়! কিন্তু মড়াখেকো ঐ তেকেলে বৌটার জন্যে কি আর তা হবার জো আছে। কেবলই এক কথা, 'কাজ ছেড়ে দিলেই ব্যাটা-ছেলেরা নষ্টামি করে। আমি বেঁচে থাকতে, ও সব চলবে না, হিয়াম।'

বেলা তখন তিনটে; ওয়ানাসী-র রোল্স রয়েস এসে থামল ফ্লরিডা সেফ ডিপজিট ব্যাঙ্কের সামনে। ড্রাইভারকে রেখে নামল ওয়ানাসী।

ওয়ানাসীকে সবাই চেনে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে একজন গার্ড ওকে স্যালুট করলে।

ভল্টে যাবার লোহার দরজার কাছে যে দুজন গার্ড থাকে, তারাও ওয়ানাসীর পরিচয় যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করে না। একজন এগিয়ে এসে দরজা খুলে তাকে ভিতরে ঢোকবার ইশারা করলে।

ওয়ানাসী বললে, 'এ বছরের মতো আজই শেষ, ভাই। বড্ড তাড়াতাড়ি ছুটিটা ফুরিয়ে গেল এবার।'

ভল্টে যাবার জন্যে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল ওয়ানাসী। ব্যাঙ্কের একটিমাত্র খুঁৎ চোখে পড়ে তার—ঐ বৃষকাষ্ঠটাকে ভল্টের কাজে দেওয়া। ডোরিস না কি যেন নাম কেঠো মাগিটার! একটা খুবসুরৎ ছুঁড়ি-টুঁড়ি থাকলে ভল্টের সরু-সরু গলির মতো নিরালা জায়গার নিশ্চিন্ত নির্জনতায় একটু মজা-টজা করা যেত। তা, ঐ ন্যাপা-পোঁছা গড়নের বোবা-মার্কা সতী-সাবিত্রীটিকে ঠারে-ঠোরে ইশারা করতেই ঘেন্না করে!

কিন্তু···আরে! আরে! আরে! এ আবার কে? হাঁ করে একদৃষ্টে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল ওয়ানাসী।

ইরাকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওয়ানাসী আসবে আজ। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওয়ানাসী একজন মস্ত বড় দামি খদ্দের, এক কোটি আশি লক্ষ ডলারের খদ্দের। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন রাজা-রাজড়ার মতো খাতির করে।

ইরা তার টেবিলে বসেছিল। ওয়ানাসী সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে মুখ তুলে তাকাল, একটু হাসল, তারপর উঠে

দাঁড়াল। মাথার ওপরকার আলোটা সোজা ইরার ওপর এসে পড়েছে।

'হাই!' আনন্দ আর বিস্ময় ঝরে পড়ছে ওয়ানাসীর গলায়। 'কোত্থেকে উদয় হলে? এমন ফুটফুটে মেয়ে হয়ে এখানে একলাটি করছটা কী?'

'গুড আফটারনুন, মিঃ ওয়ানাসী।' টেবিলের ওধার দিয়ে ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল ইরা। 'সপ্তাহ খানেকের জন্যে মিস কার্বির জায়গায় কাজ করছি। ওঁর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

'তাই বুঝি?' নোরিনার সুডোল দীর্ঘায়ত নিরাবরণ পায়ের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না ওয়ানাসী। 'অ্যাক্সিডেন্ট? হুঁ! কোনও ব্যাটা অ্যাক্সিডেন্ট করে ওকে মা বানিয়ে দেয়নি তো?'

হেসে উঠল ইরা।

'না, না, মিঃ ওয়ানাসী। সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন।'

'খুব ভালো কাজ করেছেন।' একটু ঘেঁষে এল ওয়ানাসী। মেয়েটা খুবসুরৎ যাকে বলে। কী কপাল, আজকেই চলে যেতে হচ্ছে। 'তা, তোমার পরিচয়টা, মিষ্টুনি? নাম কী?'

'নোরিনা ডিভন।'

'ডিভন? ভাইস-প্রেসিডেন্টের নামও তো ডিভন?'

'আমার বাবা।'

'তাই বুঝি?' অবাক হলো ওয়ানাসী। 'তোমার বাবা? কী কাণ্ড! দশ বছর ধরে আসা-যাওয়া করছি, মেল-এর মেয়ে আছে বলে তো কখনও শুনিনি···আর, মেয়ের মতো মেয়ে!'

'সবে স্কুল থেকে বেরিয়েছি। এখন এখানে কাজ করছি।'

'কেমন লাগছে?'

'ভালোই তো। বাবার খাতিরের খদ্দেরদের সঙ্গে জানা-শোনা হচ্ছে।'

মুচকি হাসল ওয়ানাসী।

'আমাকেও তার মধ্যে ধরেছ নাকি?'

ওয়ানাসীর দিকে তাকালে ইরা—মাথা নিচু করে আস্তে-আস্তে ওপরের দিকে চোখ তুললে—পুরুষরা এতেই মজে, বিশেষ করে বেশি বয়সের পুরুষরা। ইরা জানে।

'বাঃ, সে তো নিশ্চয়ই, মিঃ ওয়ানাসী! বাবা বিশেষ করে আপনাকে খাতির করতে বলে দিয়েছেন।'

'বলেছেন বুঝি? তা, না বললে কি খাতির করতে না?'

চোখ নত করল ইরা। 'আমার তো মনে হয়, কোনও মেয়েই আপনাকে খাতির না-করে থাকতে পারে না, মিঃ ওয়ানাসী। আপনাকে দেখলেই ওয়েস্টার্ন ফিল্মের নায়কের কথা মনে পড়ে যায়। ঘোড়ায় চেপে ছুটে চলেছেন প্রান্তরের ওপর দিয়ে—আপনার দিকে তাকিয়ে কেবলই সেই রকম একটা ছবি মনে পড়ে যাচ্ছে আমার।'

ওয়ানাসীর বুকটা আপনা থেকেই একটু ফুলে উঠল।

'তা বটে···আমার মতোন বয়েসে এমন জোয়ান চেহারা বড় একটা দেখা যায় না।'

'আপনার মতন বয়েসে? কী বলছেন, মিঃ ওয়ানাসী? আপনি এমন-কিছু বুড়ো হননি!'

এর পর সবটাই বেশ সোজা হয়ে গিয়েছিল। ওয়ানসীকে

ভল্টের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে একটু-একটু উস্কে দিতে লাগল ইরা, ওয়ানাসীও ব্যাড়র-ব্যাড়র করে নিজের বাহাদুরি জাহির করতে লাগল, শ্রদ্ধায় আর বিস্ময়ে ইরার চোখদুটো চকচকে হয়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত যখন হাত বাড়িয়ে চাবিটা চাইলে, তখন নিজের কোটিপতি হবার ইতিহাস বলতে-বলতে নির্বিবাদে চাবিটা তার হাতে তুলে দিলে ওয়ানাসী। কথা বলতে-বলতেই দুসারি সিন্দুকের মাঝের সরু গলির মতো জায়গাটা দিয়ে নিজের সিন্দুকের দিকে এগিয়ে গেল। বাঁ-হাতের মধ্যে লুকানো পুটিং-এর ডেলার ওপর চাবিটা একবার চেপে নিতে কোনই অসুবিধা হয়নি। ইরা আগে-আগে যাচ্ছিল, তাই চোখে পড়ার প্রশ্নই ওঠেনি। ওয়ানাসী পিছনেই থেকেছে, কারণ হংস-গমনের তালে-তালে ইরার নিটোল নিতম্বের লোভনীয় আন্দোলনটা চোখের আড়াল করতে চায়নি সে।

সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে ইরাই দুটো চাবি খুলে দিলে, ওয়ানাসীর চাবিটা ফিরিয়ে দিলে তার হাতে।

'এবার আমি যাই, মিঃ ওয়ানাসী। কোন দরকার হলে বেল বাজিয়ে ডেকে পাঠাবেন।'

'কোথাও যেতে হবে না মিষ্টুনি, এখ্খুনি হয়ে যাবে।'

সিন্দুক খুললে ওয়ানাসী, পকেট থেকে মোটা একটা খাম বার করে নিতান্ত অবহেলায় ভিতরে ছুঁড়ে রেখে দিলে।

ওয়ানাসীর কাঁধের ওপর দিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে ইরার হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন ছলাৎ করে উঠল। এক শ ডলারের নোটের তাড়ায় সিন্দুকটা একেবারে ঠাসা। এত টাকা কখনও চোখে

দেখেনি। এক পলকের দেখা—ঝনাৎ করে ডালা বন্ধ করে দিয়েছে ওয়ানাসী। নিজের চাবি দিয়ে সিন্দুক বন্ধ করে একটু সরে দাঁড়িয়েছে।

'চাবি লাগাও, মিষ্টুনি।' নিজের চাবিটা পকেটে ভরে ফেলেছে।

তার গা ঘেঁষে এগিয়ে এসেছে ইরা, পাশ কী-টা দ্বিতীয় ফোকরে ঢুকিয়েছে।

ইরার দিকে তাকিয়ে আছে ওয়ানাসী। যে আকুল তৃষ্ণাটা বরাবর বুকের কাছে ঠেলে উঠতো, এখন তা গলার কাছে উঠে এসেছে। এমন সুযোগ ছাড়া অসম্ভব। প্রবল আবেগে ভেবে দেখবার অবসরও পেল না, ইরা চেঁচামেচি করে উঠলে কী হবে।

চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে ইরা টের পেলে তার বাঁদিকের পাছায় উষ্ণ আঙুলের স্পর্শ, চেপে বসতে চাইছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সটান একটা ঘুষি বসাতে ইচ্ছা করল ওয়ানাসীর মুখে। সামলে নিল। মুঠোটা আরও একবার চেপে বসবার পর ঘাড় ঘুরিয়ে ওয়ানাসীর দিকে তাকালে—বড়-বড় চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

'এ কী, মিঃ ওয়ানাসী! ছি, ছি, এ রকম করবেন না!'

হঠাৎ লজ্জা পেয়ে, একটু ভয় পেয়েও বোধহয়, সরে দাঁড়াল ওয়ানাসী।

'ঠিক বলেছ।' ধরা-ধরা গলায় বললে, ওয়ানাসী, 'কী যে হলো আমার হঠাৎ। ভারি দুঃখিত, ভাই। খুব ভুল হয়ে গেছে।'

ওয়ানাসীর দিকে ফিরে তাকিয়ে ঝকমকে চোখে হাসল ইরা।

'তবু তো আর কারও হাতে পড়তে হয়নি, মিঃ ওয়ানাসী। আপনি বলেই বাঁচোয়া। রাস্তা-ঘাটে ব্যাটাছেলেগুলো ভীড়ের মধ্যে কী যে করে, কী বলব। জানোয়ার সব। কিন্তু আপনি···আপনার কথা আলাদা।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওয়ানাসী। ঘাড়ে ভুত না-চাপলে কেউ ওরকম করে? মওকা পেয়ে গায়ে হাত দেয়? যদি চেঁচিয়ে উঠত? যদি বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করত?

'খুব খুশি হলুম তোমার কথা শুনে, সত্যি ভারি ভালো লাগল। কাজটা উচিত হয়নি।' মানিব্যাগ খুলে এক শ ডলারের একটা নোট তুলে নিয়ে ভাঁজ করে নোরিনার হাতে গুঁজে দিলে। 'বুড়ো মানুষটার মুখের ওপর না বোল না, নোরিনা। যা করেছি, একদম ভুলে যাও, অ্যাঁ? মনের মতন একটা কিছু কিনে নিও, আর বাবাকে যেন বোল-টোল না।'

ওর কাঁধে চাপড় মেরে বাইরের দিকে পা বাড়ালে ওয়ানাসী।

ইরা একটু দাঁড়িয়ে রইল।

দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলল, 'ব্যাটা ছ্যাচড়! আসছে বছর ফিরে এসে সিন্দুক খুলে চক্ষু একেবারে ছানাবড়া হয়ে যাবে!'

গাড়ি রেখে নামবার সময়ে সুইতে পারলে না এড্রিস

লা কোকুইল রেস্ট রেণ্টে অতক্ষণের খাটুনিটা যেন তার সহ্য হয় না। পিঠটা টন-টন করছে। এবার, মুক্তি যতই এগিয়ে আসছে, খাটুনিটাও তত বেশি মনে হচ্ছে, কাজের সময়টাও আরও লম্বা লাগছে। হাতঘড়ির দিকে তাকাল। রাত দুটো পঞ্চান্ন। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পক্ষে কী চমৎকার সময়! নিজের ঘরের জানলার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল—ঘরে আলো জ্বলছে।

অ্যাল্‌জার তো এত রাত অবধি জেগে বসে থাকে না? গণ্ডগোল হলো কিছু? ক্লান্ত চরণে ফুটপাথ পেরিয়ে বাসায় ঢুকে লিফ্‌টে চড়ল এড্রিস।

উঠতে-উঠতে মনে হলো, অ্যাল্‌জার কিছু টাকা পেলে ভালো হয়। ঘরে বসিয়ে পোষবার সাধ মোটেই নেই।

দরজার চাবি খুলে বসবার ঘরে ঢুকল এড্রিস।

রান্নাঘরের টেবিলটা বসবার ঘরে নিয়ে এসে ইদানীং কাজের টেবিল হিসাবে ব্যবহার করছে অ্যাল্‌জার। এখন তারই সামনে বসে আছে। টেবিলের ওপর একটা পায়ে-চালানো লেদ, একটা ভাইস, আরও কয়েকটা যন্ত্রপাতি। একপাশে গাদাখানেক আ-কাটা চাবি।

'অনেক রাত অবধি কাজ করছ দেখছি! নোতুন-কিছু খবর আছে?'

'বিরক্ত কোর না! মাথা ঘুলিয়ে দিচ্ছে শালার চাবিটা!' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল অ্যাল্‌জার।

একপাত্তর হুইস্কি ঢেলে নিয়ে, পা থেকে জুতো জোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরাম-চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল এড্রিস।

অ্যালজার উকো চালাচ্ছে, সেই দিকে দেখতে লাগল। মিনিট দশেক পর, চেয়ার ঠেলে হাঁফ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অ্যাল্‌জার।

'এতক্ষণে দাঁড়াল মনে হচ্ছে। শালার চার চারটে ঘণ্টা নাকানি-চোবানি খেতে হলো।' এগিয়ে গিয়ে হুইস্কি ঢেলে নিলে গেলাসে। 'সন্ধেবেলা ইরা এসেছিল। হিয়াম ওয়ানাসীর সিন্দুকের চাবির ছাপ এনেছিল—খুব পরিষ্কার ছাপ।'

সশব্দে গেলাসে চুমুক মারলে এড্রিস।

'ওয়ানাসী! টাকার কুমির! লা কোকুইলের বাঁধা খদ্দের। এক সঙ্গে পনেরো জনকে বকশিস করে!'

'আজ সন্ধের প্লেনে চলে গেছে। ইরা কাল সকালে ওর সিন্দুক ফাঁক করবে। সেই জন্যেই রাত জেগে কাজ করছি। ওয়ানাসীর সিন্দুকে যে মাল আছে, তাতে আমাদের ছ মাসের খোরাক তো নির্ঘাৎ বাঁধা!'

'এই তো সবে শুরু, ফিল। কাল হয়তো আরও-একটা চাবি বাগাতে পারবে। কাজেই, লেগে থাকতে হবে, বুঝলে? ঢিলে দিলে চলবে না। ছাপ পেলেই সঙ্গে-সঙ্গে চাবি তৈরি করে ফেলবে। শুনে রাখ, মোটমাট দশ লাখের কম হবে না …বেশিও হতে পারে!'

ঘাড় নাড়ল অ্যাল্‌জার। হুইস্কির গেলাসে চুমুক মেরে সামনে ঝুঁকে বসল।

'একটা ব্যাপার নিয়ে মনটা খুঁৎখুঁৎ করছে, টিকি। তুমি হয়তো খেয়াল করনি।'

'কোন্ ব্যাপার?'

'ইরা যে আমাদের ঠকাতে পারে, সেটা একবারও মাথায়

এসেছে ? ও তো আমার সিন্দুকে টাকা রাখবে। তারপর আমি গিয়ে টাকা তুলে এখানে নিয়ে আসব। বেশ। কিন্তু ও যদি সব টাকাটা আমার সিন্দুকে না রেখে বেশির ভাগটাই নিজে গাপ করে ? আটকাতে পারবে ?'

'বেশ, নিল। বাইরে পাচার করবে কী করে ? তুমি পাচার করতে পারবে, তার কারণ, ব্যাঙ্কের চোখে সেটা তোমার টাকা। অত সব পাহারার চোখ এড়িয়ে গাদা গাদা টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কের চৌকাঠ পার হওয়ার সাহস হবে ওর ?'

'ডিভন-এর মেয়ে বলে খানিকটা তো বিশ্বাস করবেই। একটা বড় হাতব্যাগ যদি সঙ্গে রাখে, তাতে করেই অনেক টাকা ভরে নিয়ে আসতে পারে।'

ভাবনায় পড়ল এড্রিস। 'যদি সত্যিই সে রকম সাহস করে, রোখবার তো কোনও রাস্তা দেখছি না।'

'দেখছ তো! ভাবছিলুম, কথাটা তোমায় বলা দরকার।'

চিন্তাকুল-দৃষ্টিতে অ্যাল্জার-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এড্রিস। তারপরে উঠে দাঁড়াল।

'শুতে চললুম।' শোবার ঘরের দরজায় ঢোকবার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এড্রিস। 'একটা নতুন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, ফিলি-চন্দর। ইরা যদি আমাদের ধোঁকা দিতে পারে, তুমিও তো আমায় ধোঁকা দিতে পারো—তাই না ? তোমার সিন্দুকে যে টাকা ইরা রাখবে, তা থেকে বেশ খানিকটা সরিয়ে রেখে বাকিটা আমায় দিতে পার তো ? পার না ?'

'আমি কখনও তা করতে পারি, টিকি ?' এড্রিস-এর

চোখের দিকে লক্ষ্য করতে লাগল অ্যাল্‌জার। 'আমরা হচ্ছি দোস্ত, আমরা হচ্ছি দোসর।'

'তবু, হঠাৎ মনে হলো। বড় কুচিন্তা। আমায় যে ঠকাবে, তার এমন হাল করব যে, ভবিষ্যতে আর কাউকে ঠকাবার সুযোগ পাবে না।'

'যাও, যাও, শুতে যাও!' ছটফট করে উঠল অ্যাল্‌জার। 'এখনও কিছু কাজ বাকি আছে।' টেবিলে ফিরে গিয়ে বসল।

অনেকক্ষণ ওর পিঠের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল এড্রিস। তারপর ধীরে-ধীরে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিলে।

পরের দিন সকাল সাড়ে-আটটার সময়ে ইরা একটা কফিখানায় গিয়ে ঢুকল—ব্যাঙ্কের কাছেই, শ খানেক গজ দূরে। কোণের দিকে বসে ছিল অ্যাল্‌জার। এ সময়ে দোকানে লোক থাকে না, ব্যাঙ্কের কাছাকাছিও হয়, তাই এই জায়গাটাই ঠিক করেছিল ওরা।

অ্যাল্‌জার-এর পাশে গিয়ে বসল ইরা। নিগ্রো পরিচারকটি কাছে এগিয়ে আসার উপক্রম করতেই, হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলে।

'এখুনি চলে যাব। কিচ্ছু লাগবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরে গেল পরিচারক, আবার রেসের কাগজ নিয়ে বসল।

অ্যাল্‌জারকে জিগ্যেস করলে ইরা, 'এনেছ ?'

'হুঁ।' টেবিলের তলায় চাবিটা চালান করে দিলে অ্যাল্‌জার। 'ঠিক লেগে যাবে। এগারোটা নাগাদ যাব। সঙ্গে একটা ব্রীফকেস থাকবে। এগারোটার মধ্যে টাকাটা আমার সিন্দুকে চালান করতে পারবে তো ?'

'মনে তো হয়। ভল্টে গিয়েই কাজ শুরু করে দেব। খুব সহজে হবে না। ভল্টের একেবারে এক টেরে ওর সিন্দুক, তোমারটা আর এক টেরে। কেউ হঠাৎ এসে না পড়লেই হলো।'

'সামলে-সুমলে কাজ কোর। কোনও রকম ঝুঁকি নিয়ো না। বরং দেরি হোক, ক্ষতি নেই, কিন্তু ভেস্তে না-যায়। দুবার তো আর মওকা হবে না।'

হাতব্যাগে চাবিটা ভরে নিলে ইরা। ব্যাগটার দিকে সন্ধানী-চোখে তাকাল অ্যাল্‌জার। বেশ বড়-সড়, বেশ কিছু টাকা ধরে বলে মনে হলো।

সাবধানে জিগ্যেস করলে, 'ব্যাগ সুদ্ধ ভল্টে ঢুকতে দেয় তোমায় ?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অ্যাল্‌জার-এর দিকে তাকাল ইরা।

'দেবে না কেন ? মেয়েদের ব্যাগ না-হলে চলে ?' উঠে দাঁড়াল। 'এবার ছুটলুম। দেরি করা ঠিক নয়।'

'এগারোটায় দেখা হচ্ছে।'

ঘাড় নেড়ে বাইরে রোদে বেরিয়ে পড়ল ইরা। গাড়িতে উঠে ব্যাঙ্কের পিছনে গাড়ি রাখবার জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। বড় ভয়-ভয় করছে। হেসকে একটা চিঠি লিখে রেখেছে কাল

রাত্তিরে, ব্যাগের মধ্যে রয়েছে। চিঠিটা সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা লিখতে চায়নি ; বলা যায় না, যদি ইতিমধ্যে ইরার ওপর আর টান না থাকে ? সুধু লিখেছে ও এখন প্যারাডাইস সিটিতে আছে, তার জন্যে মন কেমন করছে, চায় যে ও আসুক। লিখেছে, বেশ-কিছু টাকা পেয়েছে হাতে, তাতে তার প্লেনের ভাড়া মিটিয়েও কিছুদিন বেশ আরামে কাটাবার খরচ চালানো যাবে।

ভল্টের লোহার দরজাটা সোয়া নটা পর্যন্ত চাবি বন্ধ থাকে। পৌনে এক ঘণ্টা সময়টা বড় দীর্ঘ মনে হয়। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেণ্টে খানিকক্ষণ কাজ করল ইরা, দু-একজন মেয়ের সঙ্গে কথা বলল, বার-বার ঘড়ির দিকে তাকাবার ইচ্ছাটা অনেক কষ্টে দমন করে রাখল। শেষ অবধি সময় হলো, হাত ব্যাগটা তুলে নিয়ে হলঘর পার হয়ে লোহার দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল ইরা। প্রহরী দুজন স্যালুট করল তাকে।

ওদের মধ্যে বড় যে, অ্যাল্‌ডুইক, বললে, 'মর্নিং, মিস এই সবে দরজা খুলছি।' আর একজন, ডজ্‌সন, একবার সুধু তাকিয়ে দেখল ইরার দিকে।

অ্যাল্‌ডুইক পাশ কী দিলে ইরাকে। ইরা রসিদ সই করল। অ্যাল্‌ডুইক বললে, 'আজ কাজের চাপ খুব। খদ্দেররা সব অনেকেই বাড়ি ফিরে যাচ্ছে আজ-কাল করে। দুপুরের দিকে মিঃ রস আর মিঃ ল্যান্‌জা জুনিয়র আসবেন। ওঁদের দিকে একটু বেশি করে নজর দেবেন, মস্ত বড় খদ্দের আমাদের।'

'ওঁরাও কি চলে যাচ্ছেন?' ইরা জিগ্যেস করলে।

'হ্যাঁ, ছুটি ফুরিয়েছে। মিঃ ল্যান্‌জা টেক্সাস-এ ফিরে যাবেন, মিঃ রস যাবেন নিউ ইয়র্ক।'

'বেশ, নজর রাখব।' সুন্দর করে হেসে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল ইরা।

টেবিলের কাছে এসে চোখ তুলে সিঁড়ির দিকে তাকালে। এখান থেকে প্রহরীদের পায়ের গোড়ালিটুকু কেবল চোখে পড়ে। যদি হেঁট হয়, ইরাকে দেখতে পাবে, নইলে নয়। হাতব্যাগটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ড্রয়ারের চাবি খুলে খদ্দেরদের নামের খাতাটা বার করে নিলে। খাতাটা টেবিলের ওপর রেখে হাতব্যাগটা তুলে নিলে, হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে দশটা বাজতে তিন।

বুকটা একটু ছুড়ছুড় করছে, অস্বস্তি লাগছে। পকেটে হাত দিয়ে অ্যাল্‌জার-এর দেওয়া চাবিটা একবার দেখে নিলে। একটু দোনা-মনা করে চট করে সিঁড়ির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে ভল্টের ভিতর ঢুকে পড়ল, সরু গলি-পথ দিয়ে খানিক সোজা গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে হন-হন করে এগিয়ে গেল ওয়ানাসীর সিন্দুকের দিকে।

সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল। কাজটা যে কত সাংঘাতিক, আগে এমন পরিষ্কার ভেবে দেখেনি। কেউ যদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে, ওকে টেবিলে না-পায়—কিছুই জানতে পারবে না ইরা। এখান থেকে টেবিলের জায়গাটা চোখে পড়ে না, কিন্তু টেবিলে ইরাকে না পেয়ে কেউ যদি ওকে খুঁজতে এসে নিঃশব্দে এই

গলি-পথটার মুখে এসে দাঁড়ায়, তা হলে আর রক্ষা নেই।

ঘড়ি দেখল ইরা। দশটা বেজে চার। ডোরিস-এর কাছে শুনেছে, এত সকাল সকাল কেউ আসে না, তবু সাবধান হওয়া ভালো। বলা যায় না, হঠাৎ যদিই কেউ আসে।

মুহূর্তের জন্যে সাহস হারাল ইরা, ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। পরমুহূর্তেই হেস-এর কথা মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে গেল, সিন্দুক না খুললে হেস-এর সঙ্গে দেখা হবে না, হেসকে কাছে পাওয়া যাবে না। মন শক্ত করলে ইরা, গা-তালার ফোকরে গলিয়ে দিলে পাশ কী। ঘুরিয়ে দিলে। অ্যাল্‌জার-এর চাবিটা নিয়ে দ্বিতীয় ফোকরে গলালে। ঘুরতে চাইছে না। একটু জোর করতে হলো। এবার ঘুরল। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মতো। হাতের তালুদুটো ঘামে জবজব করছে। কান খাড়া করে রাখলে। কোনও শব্দ নেই। কোনও খদ্দের যদি এসে থাকে ? ওর টেবিলের কাছে অপেক্ষা করে থাকে ? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ? কতক্ষণ পর অধৈর্য হয়ে গার্ডদের কাছে গিয়ে জানাবে যে টেবিলে কেউ নেই ?

দেখা দরকার। নিঃশব্দ দ্রুত পায়ে গলি-পথের মুখে এসে দাঁড়াল ইরা। ডানদিকে সোজা তাকিয়ে টেবিলটা দেখতে পেল। কেউ দাঁড়িয়ে নেই। গার্ডদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, নিয়ম-মাফিক এধার-ওধার করছে ওরা। ওপর থেকে খুব মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ আর টাইপরাইটারের শব্দ ভেসে আসছে কানে।

ফ্রকের গায়ে হাত মুছে নিলে ইরা, লম্বা একটা নিঃশ্বাস টেনে দ্রুতপায়ে ওয়ানাসীর সিন্দুকের কাছে ফিরে গেল।

ডালাটা খুলে ফেললে। থাকে-থাকে সাজানো তাড়ায়-তাড়ায় এক শো ডলারের নোট—মুখের ভিতরটা শুকিয়ে উঠল। হাত ঢুকিয়ে একটা গোছা তুলে নিলে। পঁচিশটা নোট, তার মানে ২,৫০০ ডলার! এত টাকা ছোঁবারও সৌভাগ্য হয়নি জীবনে! কিন্তু, হেস-এর প্লেন ভাড়া আর তার থাকা-খাওয়ার খরচ কুলোবে না। আরও একটা গোছা তুলে নিলে। ফ্রক তুলে জাঙিয়ার ভিতর গুঁজে রাখলে। ইচ্ছে করেই পা-ওলা টাইট গার্ডল পরেছে আজ, সেই সঙ্গে ঢিলে স্কার্ট। বেশ ভালো করে গুঁজে রাখলে নোটগুলো, যাতে পড়ে না-যায়। নিশ্চিন্ত হয়ে স্কার্ট নামিয়ে দিলে।

আবার সিন্দুকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এবার যতটা পারা যায় অ্যাল্‌জার-এর সিন্দুকে ভরতে হবে। একগাদা রয়েছে! অন্তত বার তিনেক আনা-নেওয়া করতে হবে। আবার একবার আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে উঠল ইরা। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিলে, এক মুঠোয় যতগুলো পারে নোটের গোছা বার করে নিলে। মেঝের উপর থাকে থাকে সাজিয়ে রাখলে। আবার উঠে সিন্দুকের সামনে দাঁড়াল। আরও একমুঠো গোছা যখন সবে তুলে নিতে যাচ্ছে, পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলে। আওয়াজটা এগিয়ে আসছে।

একমুহূর্তের জন্যে চোখে অন্ধকার দেখলে ইরা। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, বুকের ভিতর বোধ হয় কোনও শব্দ নেই, শরীরের সব উত্তাপ উধাও হয়ে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে কেউ!

নোটের গোছা মেঝেতে পড়ে রইল, সিন্দুকের ডালা

খোলা রইল, হুড়মুড় করে গলি-পথের মুখে এসে দাঁড়াল ইরা।

মেল ডিভন। ভুরু কুঁচকে সোজা ইরার দিকে তাকিয়ে সন্দিগ্ধ মুখে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেল ডিভন।

থমকে দাঁড়াল ইরা। খোলা সিন্দুক আর পড়ে-থাকা নোটগুলোর কথা মনে পড়ল। আর গজ দশেক এগিয়ে এলেই ডিভন-এর চোখে সব ধরা পড়ে যাবে—এগিয়েই আসছেন ডিভন!

সমস্ত জড়তা কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ইরা; ডিভনের দিকে।

মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে এল, 'আরে, কী খবর বাপি?'

মেল দাঁড়িয়ে পড়লেন, ইরাকে এগিয়ে আসতে দিলেন।

'কী করছিলে?' ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলেন মেয়েকে। 'গণ্ডগোল হয়েছে কিছু?'

'গণ্ডগোল? আরে না, না। মিঃ ল্যান্জা আসছেন বেলার দিকে। আগে থেকে তাঁর সিন্দুকটা চিনে রাখছিলুম, যাতে তখন খুঁজতে না-হয়।' চরম মুহূর্তে টপ করে এমন মিথ্যে কথাটা মাথায় এসেছে বলে নিজেই অবাক হলো ইরা।

'আমি ভাবছিলুম, গেলে কোথায়।' আবার একবার ভালো করে দেখলেন মেয়ের দিকে। 'সত্যি কিছু গোলমাল নেই তো? ভীষণ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তোমায়।'

'কিচ্ছু হয়নি।'

ডিভনকে পাশ কাটিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল

ইরা। ডিভনও এগিয়ে এলেন তার পিছু-পিছু। 'শরীর ভালো লাগছে না, না কি, নোরিনা?'

বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইরা।

'আঃ, থাম তো! বলছি কিছু নয়। তবু না-শুনে ছাড়বে না! বেশ, শোন। আমার এ রকম হয়। প্রত্যেকবারই এই সময়টাতে একটু ভোগান্তি সইতে হয়। একটু ফ্যাকাসে দেখায়।'

একটু ধাক্কা খেলেন ডিভন, বিব্রতও হলেন। খদ্দেরদের নামের খাতাটা টেনে নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

'কিছু মনে কোর না মা-মনি।—এর মধ্যে এসেছিল কেউ?

'না।'

'ল্যান্জা-র সিন্দুকটা দেখে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

চেয়ারে বসে ড্রয়ার খুলে হিসাব-লেখা একটা কাগজ বার করল ইরা।

'আর কোনও দরকার না থাকলে, একটু এইটা নিয়ে বসতুম। হিসেবটা মেলাতে হবে।'

'একবার দেখতে এসেছিলুম। সব ফিটফাট থাকা দরকার। তুমি কাজ কর।' কথা শেষ করে গলি-পথের দিকে এগিয়ে গেলেন ডিভন।

'বাপি!' ইরার গলার আওয়াজটা কাঁপা কাঁপা বাঁশির মতো শোনাল।

ঘুরে দাঁড়ালেন ডিভন। 'বল।'

কোনও একটা ওজর তৈরি করার জন্যে মনে-মনে মাথা খুঁড়তে লাগল ইরা।

আচমকা বলে উঠল, 'জয় অ্যান্স্‌লির সঙ্গে আলাপ করাচ্ছ কবে?' হঠাৎ মনে হয়েছে, বাবাকে ফেরাতে হলে জয় অ্যান্সি্‌লির প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। আন্দাজটা মিলেও গেল। বিস্ময় আর আনন্দের অভিব্যক্তি দেখা দিল ডিভন-এর মুখে।

'আমি তো জানতুম, তুমিই আলাপ করতে চাও না।' বলতে-বলতে টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন ডিভন।

'হ্যাঁ, চাই।······অবশ্য ওঁর যদি আপত্তি না-থাকে।'

'ওর তো বরং ইচ্ছেই আছে। প্রায়ই বলে। আজ সন্ধেয় একসঙ্গে ডিনার খাবার কথা। আসবে?'

'বেশ, যাব।' একটা স্কেল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল ইরা। 'ওঁকে তুমি ভালোবাস, না?'

'অনেক দিনের বন্ধু।' সামলে-সুমলে কথা বলতে চাইলেন ডিভন।

'ওঁকে বিয়ে করবে?'

ভুরু কুচকে মেয়ের দিকে তাকালেন ডিভন। ওর চোখ অন্য দিকে। স্কেল নিয়ে একমনে নাড়াচাড়া করে চলেছে, উত্তরটা শোনার আগ্রহও নেই বোধ হয়।

'তোমার খারাপ লাগবে?'

এবার চোখ তুলে ডিভন-এর মুখের দিকে তাকাল ইরা।

'আমি আমার মতো চলব, আমার নিজের জীবন গড়ে

তুলব······তোমার জীবন তোমারই থাক। তুমি কী করবে, না-করবে তাতে আমার কী, বল?'

'আরে যাঃ, এটা কি একটা কথা হলো, নোরিনা!' টেবিলের ওপর বসলেন ডিভন। 'তুমি আমার মেয়ে। আমার বাড়ি এখন তোমারও বাড়ি। আমার সংসার, তোমার সংসার। যদি ধর, জয়কে বিয়ে করি, সে যখন আমার কাছে এসে থাকবে, তোমার খারাপ লাগবে?'

'তার মানে, বিয়ের কথা ভাবছ!'

'তোমার মা যখন আর বেঁচে নেই······

'হ্যাঁ, বিয়ের কথা ভাবছি। ষোলটা বছর একা-একা অপেক্ষা করে কাটিয়েছি। সে যাই হোক, তোমার খারাপ লাগবে কি না, বল।'

'না।'

ইরার অভিব্যক্তিহীন মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডিভন।

'ঠিক বলছ?'

'আমি যা বলি, পরিষ্কার করে বলি। না যখন বলেছি, তার মানে, না।'

'ওকে তোমার ভালোই লাগবে, নোরিনা। একজন সঙ্গী পাবে।'

'আমার সঙ্গীর দরকার নেই। উনি তোমার সঙ্গী হবেন। এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভালো। আমিও তো একদিন বিয়ে করব। তখন ওঁকে কাছে পেলে সত্যিই ভালো লাগবে তোমার। বিয়েটা তোমার চুকিয়ে ফেলাই উচিত। আমি

হলে বাপু ওঁর মতোন অ্যাদ্দিন অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারতুম না।'

'খুব খোলাখুলি কথা বলতে পার তো?'

'কেনই বা বলব না?'

হেসে উঠলেন ডিভন। 'বেশ, আজই রাত্তিরে পরিচয়টা হয়ে যাক তোমাদের। আলাপ কর, তারপর আবার একবার আলোচনা করা যাবে তোমার সঙ্গে।'

'দেখ, বাপি, হয় তুমি তাঁকে ভালোবাস, না-হয় বাস না, এর মধ্যে কোনও রকমফের থাকতে পারে না।' ডিভন-এর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে রয়েছে ইরা। 'যদি ভালবাস, বিয়ে করাই উচিত। যদি না-বাস, পরিষ্কার বলে দাও, মুক্তি দাও।'

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিল ইরা।

অপারেটারের গলা ভেসে এল, 'আপনার ওখানে মিঃ ডিভন আছেন বোধ হয়। মিঃ গোল্ডস্থাণ্ড তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'তোমাকে অফিস থেকে ডাকছে, বাপি।' রিসিভার নামিয়ে রাখতে-রাখতে বললো, 'গোল্ডস্থাণ্ড না কি যেন নাম বললে।'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, বাড়ি ফিরে দেখা হবে।' লম্বা-লম্বা পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে ভল্টের বাইরে চলে গেলেন ডিভন।

সঙ্গে-সঙ্গে তড়াক করে উঠে পরল ইরা, সোজা ওয়ানাসীর সিন্দুকের কাছে ফিরে গেল। নোটের গোছাগুলো সিন্দুকের ভেতর পুরে ডালা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলে। চাবি খুলে

নিয়ে টেবিলে ফিরে এল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠা দরকার। একটু পরে কান খাড়া করে শুনলে, স্কার্টটা তুলে নোট দুগোছা বার করে নিয়ে হাত-ব্যাগের ভেতর ঠেসে নিলে, ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখলে ব্যাগটা।

এগারোটা বাজবার কয়েক মিনিট আগে অ্যাল্‌জারকে দেখা গেল ভল্টের লোহার জালি-কাটা দরজার সামনে। পরিচয় যাচাই করে দরজা খুলে ভিতরে আসতে ইশারা করলে গার্ড। হাতে একটা ব্রীফকেস নিয়ে উদ্বেলিত অন্তরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল অ্যাল্‌জার। যাক, অ্যাদ্দিনে টাকার সমস্যাটা মিটল বোধ হয়।

কিন্তু ইরার ফ্যাকাশে থমথমে মুখটা দেখেই বুঝতে পারলে, গোলমাল হয়েছে কোথাও।

চাপা গলায় বললে, 'কী হলো? চাবি লাগেনি?'

'চাবি ঠিকই লেগেছে।' টেবিলের ওপাশ দিয়ে ঘুরে কাছে এসে দাঁড়াল ইরা। 'প্রায় ধরা পড়ে যাচ্ছিলুম। আমার দ্বারা হবে না!'

'তার মানে? ধক নেই?' দাঁত কিড়মিড়িয়ে উঠল অ্যাল্‌জার। মুখখানা রাগে রাঙা হয়ে উঠল।

'আরে, রেখে দাও! আমি একা এত হ্যাঁপা সামলাতে পারব, এটা ভাবাই ভুল হয়েছে তোমাদের! আমারও মাথায় ভূত চেপেছিল, তাই রাজি হয়েছিলুম! ঐ তো, নাকের গোড়ায় ওয়ানাসীর সিন্দুক। আমি ওদিকে সিন্দুক খালি করি, আর এদিকে দিব্যি কেউ এসে আমায় ধরে ফেলুক—একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়বার আগে টেরও পাব না।

এই তো ডিভন এসেছিল। কিছুই টের পাইনি। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। মেঝেতে নোট ছড়ানো, সিন্দুকের ডালা খোলা।'

চট করে বুঝে নিলে অ্যাল্‌জার। সত্যিই সমস্যার কথা। ইরার মুখ-চোখ দেখেই বোঝা যায়, খুব সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। টিকি-ই বুদ্ধি বাৎলেছে। আরও খতিয়ে দেখা উচিত ছিল তার।

'ঠিক বলেছ। তোমার একার কম্ম নয়। ঠিক আছে, আমি তো এসেছি। তুমি নজর রাখ, আমি কাজ সারি। চাবিগুলো কোথায়?

চাবি দিল ইরা।

'সিন্দুকটা কোনখানে?'

'ঢুকেই বাঁ দিকের প্রথম গলিতে। A. 472।'

'তেমন কেউ এসে পড়লে ঐটা মাটিতে ফেলে দিও।' তামার ছাইদানিটার দিকে ইসারা করলে অ্যাল্‌জার। 'ঠিক আছে?'

ঘাড় নাড়লে ইরা।

'অনেক টাকা আছে?'

'বইতে পারবে না।'

'টাকা হলে কতখানি যে বইতে পারি, দেখলে অবাক হয়ে যাবে!'

দ্রুত পায়ে ওয়ানাসীর সিন্দুকের দিকে এগিয়ে গেল অ্যাল্‌জার।

৬

শুয়ে-শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছে না ইরার। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে, মেঝের সাদা কার্পেটের ওপর আলো-ছায়ার নক্সা তৈরি হয়েছে। কোথায় কোন্ ঘড়িতে বারটা বাজতে শুরু হলো।

মনের মধ্যে অনবরত পাক খেয়ে চলেছে একটা বিরক্তিকর চিন্তা—সে এখন পাকা চোর। নিউ ইয়র্কে থাকতে দোকান-টোকান থেকে যখন ছোটখাটো জিনিস-টিনিস সরাত, সেটা হতো হাত-টানের ব্যাপার, এখন যা করছে, সেটা সুচিন্তিত প্রবঞ্চনা, বড় রকমের চুরি ; ধরা পডলে দীর্ঘদিনের শ্রীঘরবাস! ধরা তো পড়েই যাচ্ছিল। সত্যিই যদি ওকে ওয়ানাসীর সিন্দুকের সামনে নোটের তাড়া-হাতে দেখতে পেত মেল? মেল-এর মুখখানা কী বিচ্ছিরি কুঁচকে উঠত? মনে-মনে কুঁকড়ে উঠল ইরা। নতুন একটা অনুভূতির স্বাদ পেল—লজ্জা। আগে কখনও এমন হয়নি। এই প্রথম হলো, বিচ্ছিরি লাগল।

মানতে মন চায় না, কিন্তু বোঝে যে, দিনের-পর-দিন মেল-এর সঙ্গে একবাড়িতে থাকা, রোজ-রোজ দেখা হওয়া, মেল-এর স্নেহ-ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া—এতে করে মনের ভিতর একটা ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে তার। এখানকার এই সুনিয়ন্ত্রিত জীবনটা সয়ে এসেছে তো বটেই, সত্যি কথা

বলতে কি, একটু-একটু ভালোও লাগতে আরম্ভ করেছে। নিয়ম করে সকাল বেলা ঠিক সময়ে ওঠা, কাজে যাওয়া, মন দিয়ে কাজকরা—বিশেষ করে মন দিয়ে কাজ করা, ভালো করে কাজ করা, কাজ করে তারিফ পাওয়া, নিজেকে বুক ফুলিয়ে জাহির করতে পাওয়া!

অস্বস্তিতে একটু নড়ে-চড়ে শুল ইরা। আরও একটা খারাপ ব্যাপার হলো, জয় অ্যান্সলির সঙ্গে আলাপ করে ভালো লেগেছে। বেশি আমল দেবে না ঠিক করেই গিয়েছিল; নানা রকম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে, দুর্বিনীত ব্যবহার করেছে, তবু জয় অ্যান্স্লির প্রসন্ন মাধুর্যকে এক কণাও ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। তিনজনে বীচ ক্লাবে ডিনার খেয়েছে, আলো-ঝলমল, সুইমিং পুলে সাঁতার দেখেছে, বাজনা শুনেছে—ভালো লেগেছে। ডিনারের পর মেল যখন জয়কে বাড়ি পৌঁছে দিল, তখন সে জয়-এর বাবা জজ অ্যান্স্লির সঙ্গে আলাপ করেছে।

কিন্তু এই দীর্ঘকায়, শীর্ণ অশীতিপর বৃদ্ধ মানুষটি, তাঁর স্বচ্ছ, গভীর চোখদুটি, এমন একটা ছাপ ফেলেছে ইরার মনে, যা তার কাছে অনাস্বাদিত ছিল এতকাল। খুব ঘরোয়া ব্যবহার করেছেন ইরার সঙ্গে, মিষ্টি ব্যবহার করেছেন, অপরিচয়ের সঙ্কোচ বোধ করতে দেননি, নিজের ছোট্ট লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়ে পুরনো খুনের মামলার নথি-পত্র দেখিয়েছেন ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। মনে-মনে প্রাণপণ ভাবতে চেষ্টা করেছে ইরা—এ সব বাজে, এ সব ফালতু; তবু, মেল যখন এসে বলেছে, এবার যেতে হবে, তখন হঠাৎ টের পেয়েছে, এখুনি যেতে মন চাইছে না।

'আবার এস।' জজ সাহেব বলেছিলেন আসবার সময়ে। 'তোমাদের বয়সী কাউকে বড়-একটা তো পাই না। রবিবার চলে এস। এক সঙ্গে চা খাব। জয় তো তোমার বাবার সঙ্গে বীচ হাট-এ যাবে। যদি তেমন কিছু করবার না-থাকে, চলে এস, দুজনে মিলে গল্প-গুজব করা যাবে।'

আর একটু হলেই "হ্যাঁ" বলে ফেলেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয়েছে, জজসাহেবের মতো একটা নেহাৎ নীরস বুড়োর সঙ্গে বসে সময় নষ্ট করার চিন্তাটাও অন্যায়, মনের দুর্বলতা। কাজের ছুতো দেখিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল।

আর, এখন, এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে, জজসাহেবের সঙ্গে আর একবার কথা বলতে মন চাইছে।

অসীম বিরক্তিতে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল ইরা। 'না, বলব না। এ কী হলো আমার! রবিবারের ভেতর হেস আসছে! আমার হেস!'

লাঞ্চের সময়ে হেস-এর চিঠিটা ডাকে দিয়েছে। আলাদা রেজিস্ট্রি করে পাঁচ শো ডলার পাঠিয়ে দিয়েছে প্লেন-ভাড়া আর হাত খরচের জন্যে। টাকা পাঠাবার সময়ে বুকটা একটু দুলে উঠেছিল। যদি না আসে?

হেস-এর কথা মনে পড়তেই নাড়ি চঞ্চল হয়ে উঠল, মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। জোর করে অন্য কথা ভাবতে চেষ্টা করলে ইরা। বিকেলের ঘটনার কথা।

মিঃ ল্যান্‌জা-র চাবির ছাপটা তুলতে একদম কোনও ঝঞ্ঝাট হয়নি। বেঁটে, মোটা এই টেক্সানটা ওয়ানাসীরই জুড়িদার একেবারে। গায়ে হাত তো দিয়েইছে, তার ওপর

আবার চুমুও খেতে এসেছে। শেষ কালে গার্ডদের ডাকবার ভয় দেখাতে, নেহাৎ ব্যাজার হয়ে রেহাই দিয়েছে। সিন্দুক খোলবার সময়ে ইরাকে থাকতে দেয়নি অবশ্য, তবে চাবির ছাপটা আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল।

অন্যজন, মিঃ রস, বেশ দীর্ঘকায় পুরুষ, জাতে ইহুদি। প্যাণ্টের বোতামের সঙ্গে লম্বা একটা সোনার চেন দিয়ে লাগানো ছিল চাবিটা।

দেখেই বুঝেছিল ইরা, চাবি পাওয়া যাবে না, তাই চায়ওনি।

যাই হোক, ইরা ভেবে দেখলে, তিনজনের মধ্যে দুজনের ক্ষেত্রে কাজ হাসিল হয়েছে। মন্দ কী! ব্যাঙ্কের ছুটির পর সামনের সেই কফি-বার-এ গিয়ে ল্যান্‌জা-র চাবির ছাপটা অ্যাল্‌জার-এর হাতে চালান করে দিয়েছে।

অ্যাল্‌জার বলেছিল, 'এগারোটা নাগাদ যাব। টিকির সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। কাল সন্ধে ছটার পর টিকির ওখানে থাকব। যেয়ো, তখন টাকা ভাগাভাগি হবে। ওয়ানাসীর সিন্দুক থেকে পাওয়া গেছে পঞ্চাশ হাজার ডলারের মতোন। রস-এর চাবিটা পেলে না, মুশকিল হলো। ওর সিন্দুকে মেলাই টাকা ছিল নিশ্চয়ই।'

'আমি তো আর ম্যাজিক জানি না।' ছোট্ট করে কথাটা বলে বেরিয়ে এসেছে ইরা, আর গাড়িতে চড়তে-চড়তে টের পেয়েছে, রস-এর চাবিটা হাতে পায়নি বলে মনটা যেন হাল্কা লাগছে।

কেন হাল্কা লাগল? চাঁদের আলোর আভাস-মাখা

দেওয়ালের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবতে লাগল ইরা। ভাবতে-ভাবতে আরও একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগছে এখন তার কাছে—অ্যাল্‌জার যখন বললে ওয়ানাসীর সিন্দুক থেকে পঞ্চাশ হাজার পাওয়া গেছে, তখন খুব একটা উল্লাস তো জাগেনি? হপ্তা দুয়েক আগে হলে আনন্দে দিশেহারা হয়ে উঠত নিশ্চয়ই।

তা হলে? এতক্ষণে বুঝতে পারলে ইরা। বুঝতে পারলে, আর তার টাকার দরকার নেই। নিজের অগোচরে মনে-মনে যা চাইত, আপনা থেকেই পেয়ে গেছে সব: নিশ্চিন্ততা, মর্যাদা, সংসার, গাড়ি—আর, বাবা।

কোনও ঝুঁকি নিতে হয়নি, তবু পেয়ে গেছে। ও যে নোরিনা ডিভন নয়, কেই বা জানতে পারছে সে কথা? কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে এই ভাবে টাকা সরাতে থাকলে, কেউ-না-কেউ ধরে ফেলতে পারে, এবং তখন চরম সর্বনাশ।

আধ-শোয়া হয়ে উঠে বসল ইরা। যদি আর সিন্দুকে হাত না-দেয়? ভেবে দেখতে চেষ্টা করলে। টিকিকে যদি বলে যে, চাবির ছাপ আর নেওয়া যাচ্ছে না?

লোকটা সহজ নয়। লোকটা ভয়ঙ্কর। বুঝে-সুঝে চলা দরকার। মেলকে বলে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়াই ভালো বোধ হয়। তা হলে টিকির আর কিছু বলবার থাকবে না।

শেষ অবধি ভেবে দেখলে, হেস আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো। হেস কাছে থাকলে সাহস হবে, আগলাতে পারবে হেস। টিকি আর অ্যাল্‌জারকে অনায়াসে সামলাতে পারবে।

শনিবার দিন ভল্ট থেকে বদলি করার কথা বলবে মেলকে, আর এই দুদিন যা হোক করে কাটিয়ে দিয়ে বলবে, আর কোনও চাবি হাতে পায়নি।

তাই-ই ঠিক রইল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরে চোখ বুজল ইরা।

পরের দিন সকাল এগারোটা নাগাদ ভল্টে ঢুকল অ্যাল্‌জার।

আর একজন খদ্দেরকে সিন্দুকের কাছে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতে-আসতে অ্যাল্‌জারকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ইরা। অ্যাল্‌জারের পরনে নতুন স্যুট, মাথায় নতুন হ্যাট। তার মানে ভাগের টাকা এখন থেকেই খরচা করতে শুরু করেছে। সে টাকার কোন হদিশও পাবে না কেউ।

হাসিমুখে অ্যাল্‌জার বলে উঠল, 'এই যে!' বেশ নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত মনে হলো তাকে। কাছে আসতে মুখে হুইস্কির গন্ধ পাওয়া গেল।

'চেঁচিও না। আরও তিনজন আছে ভেতরে।'

'বয়ে গেল। তারা তো আর আমার সিন্দুক চেনে না। চল, সোনামনি।'

গলি-পথ দিয়ে ল্যান্‌জা-র সিন্দুকের দিকে এগিয়ে গেল ইরা।

ইরা যখন পাশ কী ঘোরাচ্ছে, অ্যাল্‌জার বলে উঠল, 'ব্যাস! এবার বসগে যাও।'

চলে এসেছে ইরা। অ্যাল্‌জার পকেট থেকে নকল চাবিটা বার করছিল, সেই পর্যন্ত দেখে চলে এসেছে। আর একজন খদ্দের এসে পড়তে, তাকে তার সিন্দুকের কাছে পৌঁছে দিতে গেছে। আবার যখন ফিরে এসেছে, ল্যান্‌জার সিন্দুকের দিক থেকে অ্যাল্‌জারকে এগিয়ে আসতে দেখেছে। মুখটা টকটকে লাল, চোখদুটো জ্বলজ্বলে।

'কী হলো?' জিগ্যেস করলে ইরা।

'কিছু নেই!' দাঁতে দাঁত চেপে বললে অ্যাল্‌জার। 'সুধু দলিল-পত্তর আর শেয়ারের কাগজ! এত হাঙ্গামা সব জলে গেল!'

বুকটা বড় হাল্কা লাগল ইরার। 'আমার দোষ?'

'ভালোয়-ভালোয় আরও কয়েকটা চাবির ছাপ যোগাড় করে ফেল ফটাফট! লাঞ্চের মধ্যে অন্তত একটা! সামনের বার-এ থাকব!'

'দেখি, যদি পারি।'

অ্যাল্‌জার-এর দৃষ্টিতে এবার খুনের উন্মাদনা। 'পারি-টারি চলবে না! পারতে হবে!'

টেবিলে গিয়ে বসল ইরা! ভয়-ভয় করছে। এও দুর্বলতার লক্ষণ। মাসখানেক আগে হলে অ্যাল্‌জার-এর তড়পানি সহ্য করত না, মুখে থুতু দিত। এখন ওর ক্রোধ-কুটিল মুখখানা দেখেই বুক কাঁপছে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। নতুন খদ্দেরদের ভাড়া দেবার জন্যে যে-সব সিন্দুক খালি পড়ে আছে, তারই অনেকগুলো চাবি দেখেছে একটা ড্রয়ারে। সেই খান-তিন-

চার চাবির ছাপ নিলে কেমন হয়। কোন সিন্দুক খালি, কোন সিন্দুক ভর্তি, তা তো তার জানবার কথা নয়।

দুপুরে কফি বার-এ গিয়ে অ্যাল্‌জারকে সেই একই জায়গায় বসে থাকতে দেখল। ইরাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল অ্যাল্‌জার।

'কিছু পেলে?'

ঘাড় নাড়লে ইরা। 'দুটো।' খালি সিন্দুকের চাবির ছাপদুটো এগিয়ে দিলে ইরা বাক্সশুদ্ধ।

'কার-কার?'

'মিঃ ক্রুকশ্যান্‌ক আর মিসেস রিগু্‌ল্যাণ্ডার-এর'। চট করে যে কোনও দুটো নাম বলে দিলে ইরা। 'দুজনেই খুব বড়লোক, দুজনেই আজ রাত্তিরে চলে যাচ্ছে।'

'সিন্দুকের ভেতরটা দেখে রেখেছ?'

'না'।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল অ্যাল্‌জার। চোখে-চোখে তাকিয়ে থাকতে বেশ বেগ পেতে হলো ইরাকে।

'তা হলে ছাপ যোগাড় করলে কী করে?'

'চাবি দিয়েছিল কিন্তু ডালা খুলতে দেয় নি। হয়েছে?'

'ঠিক আছে। শুয়োরের বাচ্চা ল্যান্‌জার সিন্দুকের মতো না-হলেই ভালো—তোমারই ভালো।'

'কারও সিন্দুকে যদি টাকা না-থাকে, আমি কী করব?' ঝাঁঝিয়ে উঠল ইরা। 'টিকি যা বলেছে, করেছি। আমি তো আর ম্যাজিক করতে পারি না।'

অ্যাল্‌জার খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল ইরাকে। 'ওটা

আগেও শুনেছি। ছটার সময়ে টিকির ওখানে দেখা হবে।'
ইরাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল অ্যাল্‌জার।

টিকির ফ্ল্যাটে যেতে চায় না ইরা, না-যাবারও সাহস নেই। ওয়ানাসীর টাকার বখরা হবে। ভাগের টাকাটা কী করবে ইরা? ভেবে দেখতে চেষ্টা করলে। সম্ভব হলে ওয়ানাসীর সিন্দুকেই ফিরিয়ে রাখা যেত, কিন্তু নকল চাবিটা অ্যাল্‌জার-এর কাছে। টিকিকে বলবে চাবিটা দিতে, বলবে নিজের টাকাটা লুকিয়ে রাখবার মতো আর কোনও জায়গা পাচ্ছে না।

ছটার পর ব্যাঙ্ক থেকে বেরুবার সময় মেলকে দেখতে পেল ইরা। মেলও বেরুচ্ছে। থেমে পড়ে তার দিকে চেয়ে একটু হাসল সে।

হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়ি রাখবার জায়গার দিকে যেতে-যেতে মেল বললেন, 'আজ কি রকম গেল?'

'যেমন হয়।'

'তেমন একটা উৎসাহ দেখছি না তো?' ইরার কাঁধ-ঝাঁকানিটা লক্ষ্য করলেন মেল। 'ঐ অন্ধকূপে ব্যাজার লাগছে এবার, তাই না? নিশ্চিন্ত থাক, আর হপ্তা দুয়েক গেলেই তোমার ছুটি।'

সিঁটিয়ে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ইরা। 'দু সপ্তাহ? অত দিন পড়ে থাকতে হবে? এ সপ্তাহটা গেলে অ্যাকাউন্ট্‌স সেক্সনে ফিরে যেতে চাই, বাপি।'

হাসলেন মেল। 'দায়িত্ব নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই, নোরিনা। অন্তত আরও দুমাসের আগে মিস কার্বি আসতে

পারবে না। ক্রেশার ঠিক করেছে, এই সুযোগে একটা বদলা-বদলি করবে। আমাদের নিউ ইয়র্ক ব্রাঞ্চ থেকে একটি ছেলের আসবার কথা আছে। এ মাসের শেষ-নাগাদ আসবে, তার আগে পারবে না। তদ্দিন তোমাকেই চালাতে হবে।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল ইরা, মেল-এর চোখে বিস্ময় আর সন্দেহের লক্ষণ দেখে চুপ করে গেল।

'তুমি নিজেই কাজটা নিতে চেয়েছিলে, নোরিনা। আমি তো বলেই ছিলুম, ব্যাজার লাগবে। এখন তোমায় ছাড়া আমাদেরও গতি নেই।' হাসলেন মেল। 'ঠিক আছে?'

আরও দু-সপ্তাহ! ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠল ইরা। দু-সপ্তাহ ধরে টিকি আর অ্যাল্জারকে ধোঁকা দেওয়া অসম্ভব, অথচ না বলা চলে না। হেস-এর কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল, বিকেলে তার একটা টেলিগ্রাম পেয়েছে। আজ রাত্তিরে এসে পৌঁছচ্ছে। হেস কাছে থাকলে বিপদের পরওয়া নেই।

কাঁধ ঝাঁকালে ইরা। 'হ্যাঁ, ঠিকই আছে।'

'খুব ভালো কথা। আমি জয়-এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আজ বিয়ের কথা পাড়ব। আসবে না কি? জজ-সাহেবের সঙ্গে গল্প-গুজব করবে?'

মাথা নাড়ল ইরা। 'আজ নয়, বাপি, কাজ আছে।' নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে থমকে দাঁড়াল। মেল-এর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'গুড লাক!'

গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেল ইরা। মেল সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মনে মনে ভাবলেন, মেয়েটা সত্যিই পাল্টাচ্ছে একটু-

একটু করে। আস্তে-আস্তে থিতু হচ্ছে তো বটেই, তাঁকেও মেনে নিচ্ছে ক্রমে-ক্রমে।

তাড়াতাড়ি সীকম্ব-এ গিয়ে পৌঁছল ইরা। এড্রিস-এর বাসা-বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে ভিতরে ঢোকবার সময়ে বেশ টের পেতে লাগল, নাড়ী চঞ্চল, মনটা বে-এক্তিয়ার।

লিফ্‌টে চেপে ওপরে উঠতে-উঠতে মনে-মনে বার-বার বলতে লাগল, ভয় পাবার কিছু নেই! কাল সকালের আগে তো অ্যাল্‌জার টের পাচ্ছে না যে, সিন্দুক ফাঁকা, তার আগে ভয় কী? তার মধ্যে হেস-ই তো এসে পড়ছে, সে-ই যা করবার করবে।

এড্রিস-এর দরজার সামনে একটু দাঁড়াল। বুকটা এখনও দুরদুর করছে। বিপদের গন্ধ পায় ইরা, এখন তাই পেল। একটু ইতস্তত করলে, তারপর দাঁতে-দাঁত-চেপে বেল টিপে ধরলে।

সামান্য একটু বিরতি। পরক্ষণেই হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে গেল, এড্রিস মুখ বাড়ালে। মুখটা ফ্যাকাসে, চোখদুটো পালিশ-করা কাচের মতোই অভিব্যক্তিহীন।

'এই তো। এসে গেছ। দেরি হলো। ভেতরে এস।'

একটু দ্বিধা। দরজা দিয়ে দেখতে পেল, অ্যাল্‌জার দাঁড়িয়ে আছে খোলা জানলার সামনে। হাতদুটো পকেটে ভরা, ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট।

'আরে, ভেতরে আসবে তো!' এড্রিস-এর অসহিষ্ণু ভঙ্গীটা অত্যন্ত প্রকট লাগল ইরার কাছে।

বসবার ঘরে ঢুকল ইরা। এড্রিস দরজা বন্ধ করে দিলে।

দরজায় চাবি দেওয়ার শব্দটা অতি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল ইরার কানে। হৃদ্‌পিণ্ডটা একবার যেন চলকে উঠল! ঘরের মাঝ বরাবর এসে থামল। তারপর···

তারপর এক লহমায় ব্রুকলিন-এর সেই বস্তি-পাড়ার অন্ধকার গলির বেপরওয়া জীবনে ফিরে গেছে ইরা। বিপদের গন্ধ-পাওয়া বাঘের মতো মনে-মনে রুখে উঠেছে। আচম্বিত আশঙ্কার প্রবল তাড়নায় কয়েক সপ্তাহের জমে-ওঠা কোমলতার পাৎলা খোলসটা ফেটে চৌচির হয়ে খসে পড়ে গেছে। ইরা এখন আবার ব্রুকলিন-এর বস্তির মেয়ে।

আর কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দেওয়ালের কাছে পৌঁছে গেল। ঠ্যাসান দিয়ে দাঁড়িয়ে টিকি আর অ্যাল্‌জার-এর মুখোমুখি দাঁড়াল। চোখদুটো আরও কালো, আরও চকচকে হয়ে উঠল, ঠোঁটদুটো একটি মাত্র রেখায় সন্নিবদ্ধ।

'এগিয়ে আয়, কুত্তি!' রাগে ফ্যাস্‌ফ্যাসে শোনাচ্ছে অ্যাল্‌জার-এর গলা। 'এইবার হচ্ছে তোমার! সেই প্রথম দিন থেকে মুখিয়ে আছি হাতের সুখ করব বলে! এবার দেখ, কেমন করে ছাল-চামড়া তুলে নিই!'

বেল্টের বগলস খুলতে লাগল অ্যাল্‌জার। ইরা একটা হাতিয়ারের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। হাতের কাছে একটা ভারি ছাইদানি দেখতে পেয়ে যখন তুলে নিল, বেল্টটা খুলে হাতে নিয়েছে অ্যাল্‌জার।

'এক পা এগোও আমার দিকে, সঙ্গে-সঙ্গে জানলা গলিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দেব এইটা। তারপর পুলিশ এলে তাদের যা যা বলবার বোল।'

'থাম দিকিনি!' ঝাঁঝিয়ে উঠল এড্রিস। অ্যাল্‌জারকে ধমক দিলে 'যা করবার, আমি করছি।'

একবার ইতস্তত করলে অ্যাল্‌জার, ইরার দিকে চেয়ে দেখলে, গলা দিয়ে বিচ্ছিরি একটা শব্দ করে সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে বেল্টটা।

'ঠিক আছে।' আরাম চেয়ারে গিয়ে বসল এড্রিস। 'বস ইরা। ফিলি-চন্দর, তুমিও বস।'

এড্রিস-এর দিকে দেখলে ইরা, তার পর অ্যাল্‌জার-এর দিকে। ছাইদানিটা হাতে নিয়ে খাড়া-পিঠ একটা চেয়ারে গিয়ে বসল দেওয়াল ঘেঁষে। গলা শুকিয়ে গেছে, বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছে। কিসের গণ্ডগোল হলো ? অ্যাল্‌জার-এর চেয়ে এড্রিস-কেই বেশি ভয় : অ্যাল্‌জার-এর তর্জন-গর্জনের চেয়ে বামনটার সংযত শান্ত ধরনটাই বেশি ভয়ঙ্কর মনে হয় তার কাছে।

বিড়-বিড় করতে করতে বসল অ্যাল্‌জার। ইরার দিকে তাকাল এড্রিস। খুব নরমগলায় বললে, 'ভেবেছিলুম, তুমি বেশ চালাক। ফিলকে যা হোক ছুটো নাম বাৎলে ধোঁকা দেওয়া শক্ত নয় বটে, কিন্তু খুবই বোকার মতো কাজ হয়েছে। তোমার ঐ ক্রুক্‌শ্যান্‌ক বা রিঙ্‌ল্যাণ্ডার, কারুরই নামে ব্যাঙ্কে কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। আমি খোঁজ নিয়েছি।'

জোর করে মুখটা নির্বিকার রাখল ইরা। হ্যাঁ, খুবই বোকামি হয়ে গেছে, কিন্তু কী করে বুঝবে যে, ভাঁড়টা ইতিমধ্যেই সন্দেহ করতে শুরু করেছে তাকে ?

এড্রিস বলে চলেছে, 'কী মতলব বল তো ? ল্যান্‌জা-র সিন্দুকে যে কিছু নেই, তাও জানতে বোধ হয় ?'

'জানতুম না।'

'ফিলকে যে চাবিদুটো দিয়েছ···আসলে কার-কার?'

একটু ভাবলে ইরা। সব খোলাখুলি হয়ে যাওয়াই ভালো। একটু আগেই ব্যাপারটা ফাঁস করতে হচ্ছে, তা হোক, টিকির এই ফ্ল্যাটে তাকে ছুঁতে সাহস হবে না ওদের। ফার পৌঁছবার পর হলে ভালো হতো, কিন্তু উপায় কী? না, এখানে কিছু করতে সাহস পাবে না।

'কারুরই না।' শান্তগলায় জবাব দিলে ইরা। 'খালি সিন্দুক।'

অ্যাল্‌জার একটা জঘন্য গালাগাল দিয়ে উঠল। দেখে মনে হলো, ঝাঁপিয়ে পড়বে ইরার উপর। এড্রিস হাত নেড়ে আটকালে।

'ধক ফুরিয়ে গেল, ইরা?' পায়ের ওপর পা রেখে বসল এড্রিস। চোখদুটো ঝকঝকিয়ে উঠল।

'ঠিক তাই। আমি আর এর মধ্যে নেই। অন্য কোনও মতলব কর, আমায় বাদ দাও।'

'এ রকম যে হতে পারে, একদম ভাবিনি তা নয়, তবে তোমার হবে, সে আশঙ্কা করিনি। মনে হয়েছিল, একেবারে নিখুঁত মেয়ে পেয়েছি। মনে হয়েছিল, কাজের পক্ষে একদম ষোলো আনা কাবিল মেয়ে। এখনও মনে করি, ষোলো আনাই কাবিল, স্রধু নিজেই সেটা বুঝতে পারছ না।'

কোনও কথা বললে না ইরা।

শান্তগলায় এড্রিস বলে চলল, 'কাজ তুমি চালিয়ে যাবে, ইরা। কাল অন্তত দুটো চাবির ছাপ অ্যাল্‌জারকে দেবে

তুমি—টাকাওলা সিন্দুকের চাবি হওয়া চাই—ছুটোই। বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? কথামতো কাজ কর, আজকের সামান্য খুঁৎটা ভুলে যাবার চেষ্টা করব।'

'বললুম তো, আমি আর নেই।'

'কুত্তিটাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও তো একবার! আমি ওকে…' গর্জে উঠল অ্যাল্‌জার।

'একদম চুপ!' ধমকে উঠল এড্রিস, ইরার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাল না। 'যা চেয়েছিলে, সব পাওয়া হয়ে গেছে। তাই না ইরা? সংসার, টাকা, বাবা—সব পেয়ে গেছ। তাই, না? বড়লোক হবার ইচ্ছেটা আর তেমন খোঁচাচ্ছে না, তাই না?'

'ঠিক ধরেছ! আর, জেনে রাখ, কিছুই করবার নেই তোমার টিকি। আটকাতে পারবে না।'

'তাই না কি?' মুচকি হাসল এড্রিস। 'আমার খোঁচাটা কিন্তু এখনও থামেনি, সোনামণি। আমি যা চাই, তা এখনও পাইনি।'

'তা বেশ তো, পাবার চেষ্টা কর। আমায় বাদ দাও।'

'না, সোনামণি, তুমি আছ এবং থাকবে!'

অনেকক্ষণ এড্রিস-এর দিকে চেয়ে বসে রইল ইরা। তার পর উঠে দাঁড়াল।

'আমি যাচ্ছি। যদি কোনও বদ মতলব থাকে, এই ছাইদানিটা জানলা ভেঙে বাইরে গিয়ে পড়বে।'

'অত ব্যস্ত হয়ো না, সোনামণি।' নরমগলায় বললে এড্রিস। 'কেন যে তুমি এখনও আমাদের দলে থাকবে, সেটাই বুঝিয়ে বলতে চাইছিলুম। আমাদের সঙ্গে থাকতে

হবে, তার একমাত্র কারণ, না-থেকে তোমার উপায় নেই। ডিভনকে ভালো লাগে তো তোমার?'

পাথরের মতো বসে রইল ইরা। 'ভালো লাগে? কেন ভালো লাগবে?'

'চাপবার চেষ্টা কোর না, ইরা।' বলে হেসে উঠল এড্রিস। 'ভাবছ, তোমার পরিবর্তনটা আমার চোখে পড়েনি? বড় ভালো বাবা। ডিভন ভালো বাবা নয়? যা চাইছ তাই দিচ্ছে। তোমার আগের বাবার চেয়ে একদম অন্য রকমের। অন্য রকমের নয়?'

ইরার এবার শীত করে উঠল হঠাৎ।

এড্রিস তখনও বলে চলেছে, 'তোমার সেই মোদো-মাতাল বাবাটা হঠাৎ যদি ব্যাঙ্কে ঢুকে তোমায় মেয়ে বলে দাবি করে বসে, ডিভন কী বলবে, তাই ভাবছি। কত রকম আবোল-তাবোল বকতে হবে তোমায়, সোনামণি। তাতেও শেষ অবধি সামলাতে পারবে বলে মনে হয় না। আরও একটা ব্যাপার হলো, যখন ধরা পড়বে যে, তুমি ডিভন-এর মেয়ে নও, শালি, এবং দিনের পর দিন এক বাড়িতে ঘনিষ্ঠভাবে বাস করেছ, তখন শহরময় কী সুন্দর একটা পাঁকের গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে বল তো? তখন কাগজওলারাও মিউরিয়েল-এর আগেকার কীর্তি-কলাপ নিয়ে ঢাক পেটাতে শুরু করে দেবে। এত সব নোংরামির খবর জানাজানি হবার পর, ডিভন-এর চাকরি কত দিন টিকবে বলে মনে কর? তখন তোমার মজাটা থাকবে কোথায়, আহ্লাদি? কোথায় থাকবে?'

এবারও ইরা কোনও কথা বললে না। সারা শরীর সিঁটিয়ে

গেছে। লক্ষ্যকরে দেখলে এড্রিস। বুঝলে, ফল হয়েছে।

'কাজেই, এস, সব ভুলে যাওয়া যাক। কাল সকালে ফিলি-চন্দর কাফেতে যাবে, কমসে কম দুটো চাবির ছাপ পাবে তোমার কাছ থেকে। তৈরি রেখ, সোনামণি। যদি অবশ্য তোমার আগের বাবাকে দেখবার খুব ইচ্ছে হয়ে থাকে, আলাদা কথা। হ্যাঁ, আর একটা কথা, যদ্দিন না কাজ শেষ করছ, বখরার টাকাটা পাচ্ছ না। তবে, তাতে তোমার কিছু যাবে-আসবে না, কারণ ডিভন থাকতে তোমার ভাবনা কি, তাই না? কোলে শুইয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে হাতে টাকা গুঁজে দেবে। ঠিক বলেছি?'

অনেকক্ষণ এড্রিস-এর দিকে চেয়ে রইল ইরা। তারপর ছাইদানিটা নামিয়ে রেখে আস্তে-আস্তে উঠে চাবি খুলে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

অ্যাল্‌জার-এর দিকে ফিরে চোখ মটকালে এড্রিস।

'দেহের খোঁচার চেয়ে মনের খোঁচায় ঢের ভালো কাজ হয়, ফিলি-চন্দর। ক্যাবলা মেয়েটা ডিভনকে ভালোবেসে ফেলেছে হে! কাল চাবির ছাপ পাচ্ছ। বাজি রাখবে?'

মায়ামি এয়ারপোর্টে গিয়ে পৌঁছল ইরা সোয়া-আটটায়। হেস-এর প্লেন নামতে এখনও দশ মিনিট বাকি।

এড্রিস-এর ওখান থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সারা রাস্তাটা ভাবতে-ভাবতে এসেছে, ওদের জাল কেটে বেরুনো যায় কী করে। বিরুদ্ধাচরণ করলে যে নিজেও মুশকিলে পড়ে যাবে

ইরা, টিকি সেটা পরিষ্কার বুঝতে পেরে গেছে। এটাও ধরে ফেলেছে টিকি যে, ডিভন-এর ওপর একটা টান পড়ে গেছে ইরার—যতটা সত্যি, তার চেয়ে বেশিই মনে করছে হয়তো। এখন ইরার মনে হচ্ছে, হয়তো ততটাই সত্যি। একটা কেচ্ছা হয়ে মেল-এর মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে যাক, ব্যাঙ্ক থেকে তাকে তাড়িয়ে দিক, এ চিন্তাও অসহ্য। নতুন সংসার পেয়েছে, সেই সঙ্গে আরও যা কিছু, সে সব হারাতে হবে, তাও কল্পনা করা যায় না। কেবলই মনে হচ্ছে উপায় আছে, কিন্তু নাগাল পাচ্ছে না। একমাত্র আশা হলো হেস। খুব বুদ্ধি খেলে হেস-এর মাথায়, সব বুঝিয়ে বললে, ঠিক একটা রাস্তা বাৎলে দেবে। এই কথা ভাববার সময়ে ইচ্ছা করেই ভুলে রইল ইরা যে, হেস এ পর্যন্ত যা-কিছু মতলব করেছে, তার কোনোটাই টেকেনি। ইচ্ছে করেই ভুলে রইল যে, এড্রিস-এর অভিজ্ঞতা আর কূটবুদ্ধির কাছে হেস নেহাৎ ছেলেমানুষ। মনে-মনে কেবলই প্রবোধ দিতে লাগল নিজেকে, হেস একটা উপায় করে দেবেই। নিশ্চয়ই দেবে।

নিউ ইয়র্ক থেকে প্লেন এসে পৌঁছবার ঘোষণা শোনা গেল। এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল ইরা।

রানওয়ে দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে এগিয়ে আসছে বিরাট প্লেনখানা। একটু পরেই ফাঁকা চত্বর পার হয়ে হেঁটে আসতে লাগল যাত্রীরা।

হেসকে দেখতে পেল ইরা। সিঁটিয়ে উঠল, আঁৎকে উঠল। পোশাক কেনবার জন্যে টাকা পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল যে, হেস অন্তত একটু ভদ্রস্থ হয়ে আসবে, কিন্তু ভুলে

গিয়েছিল যে, হেস ওসব পরওয়া করে না একদম। এখনও সেই একই আঁট-সাঁট রঙ-চটা নীল জীন্‌স আর কালো চামড়ার জ্যাকেট—আসবার আগে যেমন দেখে এসেছিল, হুবহু তাই। সেই ছেঁড়া-ফাটা মেক্সিকান বুটজোড়াটাও বদলায়নি। একটা নোঙরা কমলা রঙের পাশবালিশ-মার্কা থলে ঝুলছে কাঁধ থেকে।

হেস বেশ ঢ্যাঙা, আড়া সরু, লম্বা-লম্বা হাত আর বকের মতো সরু লিকলিকে পা। তেল-চকচকে লম্বা-লম্বা চুলের গোছা কাঁধ পর্যন্ত নেমে শার্টের কলারের ভিতর ঢুকে গেছে, সামনের দিকে একগোছা চুল চোখের ওপর পর্যন্ত লটকানো। মুখটা খুব ছোট আর পাৎলা। চামড়ার রঙ একটু মেটে, ডান গালে একটা কাটা দাগ অতীত দিনের সাক্ষী হয়ে আছে। দেখে মনে হয় অনেক দিন চান করেনি, দাড়িটাও কামানো দরকার।

দেখতে-দেখতে বুঝতে পারলে, এই কয়েক সপ্তাহে কতখানি বদলে গেছে নিজে, এই নতুন পরিবেশ তার বিচার-বোধ আর দৃষ্টিভঙ্গীর কী মারাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। বিহ্বল হয়ে পড়ল ইরা। টের পেলে, মনের মধ্যে একটা সন্দেহের গুঞ্জরণ বেজে চলেছে—এই নোঙরা অপদার্থটাকে সত্যিই কি ভালোবেসেছিল কোনও দিন? এমন নিবিড় ভালোবাসা? এই হেস-কে কাছে পাবার জন্যে সত্যিই লড়াই করেছিল, ক্রীতদাসীর মতো তার ইচ্ছার পায়ে নিজের সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছিল দিনের পর দিন? এই হেস? আবার একবার সেই লজ্জা, সেই ধিক্কারে ভরে উঠল বুকের ভিতরটা।

চোখাচোখি হবার আগেই আস্তে-আস্তে সরে পড়বার ইচ্ছে হলো।

না তা হয় না। ঠিকানা আছে ওর কাছে, যদি এখানে দেখা না-পায়, বাড়ি যাবে। মেল কী ভাববে? কিন্তু আপাতত কোথায় নিয়ে তোলা যায়? যা হোক্ করে ওকে ভালো পোশাক পরানো দরকার, সাফ-সুতরো করা দরকার। মেল-এর বীচ ক্যাবিনটার কথা মাথায় এল। ওখানেই ঠিক হবে। রাতটা ওখানেই থাকুক। পোশাক-আশাক যোগাড় হয়ে যাবে এখন। রবিবারের আগে ওদিক মাড়াচ্ছে না মেল।

বেরুবার দরজা ঘেষে দাঁড়াল ইরা। একে-একে যাত্রীরা বাইরে আসছে। হেস আসছে। চোয়াল নেড়ে চিউয়িং গাম চিবুচ্ছে, মুখটা অসন্তোষে ভরা। ভীড়ের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে, যাকে-তাকে কনুয়ের গুঁতো মেরে দরজার ভীড় কাটিয়ে ফাঁকায় এসে পড়ল।

মনটাকে শক্ত করে নিলে ইরা। হেস-এর দিকে এগিয়ে গেল। 'হ্যাল্লো, হেস! এলে তা হলে।'

হেস-এর চোখ দেখে মনে হলো, প্রথমটায় চিনতে পারেনি। তারপর পারল। বিস্ময়ে প্রায় হাঁ হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলে।

'আরে সুসাবাশ! ইনি আবার কিনি? আগাগোড়া ভদ্দরলোক বনে গেছ দেখছি যে, অ্যাঁ!'

আফিসের পোশাক বদলবার সময় পায়নি ইরা। জানতো যে, হেস-এর ভালো লাগবে না—বড্ড পোশাকী, বড্ড ভদ্র, বড্ড ম্যাড়ম্যাড়ে ঠেকবে হেস-এর চোখে।

'ওটা ভেক'। মিথ্যে কথা বলে কোনও রকমে সামলালে ইরা। 'এস, হেস, অনেক কথা বলবার আছে। আগে বেরুই এখান থেকে।'

'আছে নাকি? ধর, আমি যদি শুনতে না চাই? আমাকে ফেলে যে চলে এলে, তার মানেটা কী?' হেস-এর ছোট্ট মুখটা কালো হয়ে উঠল। 'এইখানে এই হাটের মাঝখানে তোমার মুখখানা থেঁতো করে দিই যদি?'

'খোকাবিত্তি কোর না।' হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠল ইরা। 'না-পার, তো ঘরের ছেলে ঘরে যাও।' ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে পা বাড়াল। গাড়ির কাছে এগিয়ে গেল।

চমকে গেল হেস। তারপর একটু অবাক হয়ে ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে ইরাকে অনুসরণ করলে।

ইরা লক্ষ্য করলে, গাড়িটাকে খুঁটিয়ে দেখছে হেস। মুখে বিস্ময় আর ঈর্ষা।

'তোমার?'

'আমার।'

'শ্ শালা রে!' ঝোল টানলে হেস। 'কী ব্যাপার বল তো? সত্যি বলছ তোমার?' বড্ড বোকা-বোকা দেখাল হেসকে। হাসি পাচ্ছিল ইরার।

ওদিকের দরজাটা খুলে ধরলে ইরা। 'উঠে পড়, হেস।'

ঘুরে গিয়ে ইরার পাশে বসে দড়াম করে দরজা বন্ধ করলে হেস। ময়লা আর বাসি ঘামের দুর্গন্ধ ভেসে এল ইরার নাকে। সেই সঙ্গে ভেসে এল আরও অনেক স্মৃতি—সেই

কদর্য বস্তি-বাড়ি, মাতাল বাবা, জঞ্জালের গাদা, ছারপোকার কামড়—শিউরে উঠল।

বড়-বড় চোখে ড্যাশ্‌বোর্ডের দিকে চেয়ে হেস বললে, 'নিজেই চালাও? পার?'

'নিশ্চয়ই।'

মাথা চুলকাতে লাগল হেস। ইরা স্টার্ট দিল।

'আমায় যে অতগুলো টাকা পাঠালে, কোন চুলো থেকে বাগালে?'

'সে অনেক কথা। পরে বলব।' গাড়ি ছাড়ল ইরা। হেস-এর বিহ্বলতা আর অস্বস্তির ভাব দেখে মনে-মনে খুশি হলো। 'কিন্তু, তোমার খবর কী, হেস? আমি চলে আসার পর কী করে বেড়াচ্ছ?'

'করে বেড়াচ্ছি?' আবার খচে উঠেছে হেস। 'চিরকাল যা প্রাণ চেয়েছে তাই···বসে থেকেছি।'

কী বোকার মতো কথা, মনে-মনে ভাবতে লাগল ইরা। একটুও বদলাওনি, হেস। কী হাঁদা আর অকম্মা তুমি, এখন টের পাচ্ছি। একটুও বদলাওনি তুমি, অথচ আমি বদলেছি।

'দলের খবর কী?' কথার-কথা হিসাবেই জিগ্যেস করল ইরা।

'দলের জন্যে শালার তোমার কী মাথাব্যথা?'

'জানতেও পারি না?'

'দল ঠিক আছে। কিন্তু, মামলাটা কী, একটু ভেঙে বল। আমায় আবার ফিরে যেতে হবে। আমি ছাড়া দল চলবে না।'

'বয়ে গেল। দল ছাড়া তোমার তো চলবে?'

একটু নড়ে বসল হেস। 'তার মানে?'

'চাপা দাও। নতুন কিছু পোশাক-আশাক কিনলে না কেন? টাকা তো যথেষ্টই পাঠিয়েছিলুম।'

'পোশাক দিয়ে হবেটা কী?'

'প্যারাডাইস সিটি আর নিউ ইয়র্ক এক নয়। যে রকম চেহারা করেছ, দেখলেই পুলিশে ধরবে।'

'পুলিশের...... !'

'টাকাগুলো করলে কী? খুইয়েছ?'

'কিছু আছে এখনও...তাতে তোমার কী? আমারই তো টাকা।'

হাইওয়ে 4A দিয়ে গাড়ি ছুটছে এখন। বড়-বড় ক্যাডিল্যাক, বিউইক আর ফোর্ডগুলোকে সাঁ সাঁ করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ইরা, কিন্তু গতিসীমার বাঁধন ছাড়াচ্ছে না। হেসকে পাশে নিয়ে পুলিশের সঙ্গে মোলাকাৎ না-হওয়াই মঙ্গল।

'আরও জোরে চালাতে পার না বুঝি?' খুঁৎ বার করতে পেরে একটু ভালো লাগল হেস-এর। 'আমায় দাও, দেখিয়ে দিই, গাড়ি চালানো কাকে বলে!'

'বেশ জোরেই যাচ্ছি। এখানকার পুলিশরা একটু বেশি কড়া।'

গলা দিয়ে অসন্তোষের একটা শব্দ করল হেস। 'যাচ্ছি কোথায়?'

'যেখানে গিয়ে গুছিয়ে কথা বলা যাবে।'

বড় অস্বস্তি নিয়ে ইরার দিকে চেয়ে রইল হেস। কীভাবে নাগালে পাবে, বুঝতে পারছে না। এ-ইরাকে ঠিক চিনতে পারছে না। সিগারেট ধরিয়ে গোঁজ হয়ে বসে রইল।

এক ঘণ্টার কিছু বেশি লাগল বীচ ক্যাবিনে পৌঁছতে। তখন অন্ধকার, মসৃণ বেলাভূমি জনশূন্য।

পাইন কাঠের তৈরি তিন-ঘরের সাজানো-গোজানো এই বীচ ক্যাবিনটা একটু একটেরে, মাথার উপর তিনটে পাম গাছ। অন্য ক্যাবিনগুলো একটু দূরে, অন্ধকারে অস্পষ্ট। এমন বে-দিনে কেউ আসে না।

গাড়ি থেকে নামতে-নামতে ইরা বললে, 'ব্যাস, এসে গেছি। খিদে পেয়েছে?'

'কী মনে হয়?' গাড়ি থেকে নেমে অবিশ্বাস আর সন্দেহের দৃষ্টিতে ক্যাবিনটার দিকে তাকিয়ে রইল হেস। 'ভেঙে ঢুকবে নাকি?'

'চাবি আছে।' এগিয়ে গিয়ে চাবি খুলল ইরা, আলো জ্বালল, ইশারায় হেসকে ভিতরে ডাকলে।

বেড়াল যেমন অতি সন্তর্পণে নতুন জায়গায় চুরি করতে ঢোকে, তেমনি করে সামনের বড় ঘরটায় পা বাড়াল হেস। তাড়াতাড়ি জানলার কাছে গিয়ে পর্দা টেনে দিল ইরা।

'কী কাণ্ড রে বাবা!' ঘরের চারিদিকে চোখ বোলাতে-বোলাতে বিড়-বিড় করতে লাগল হেস। 'কী আস্তানাই বানিয়েছে। কার?'

'সেটাও বলব, আসল ব্যাপারটা শুনলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আরাম কর এখন। আমি খাবারের ব্যবস্থা করি।'

রেফ্রিজারেটর থেকে খাবারের জিনিসগুলো বার করতে করতে ইরা ভেবে দেখছিল, ঠিক কতখানি বলা উচিত হবে হেসকে। ব্যাঙ্ক থেকে মোট যত টাকা সরানো যাবে বলে এড্রিস আন্দাজ করছে তার সবটা হেসকে জানানো ঠিক হবে না। কমিয়ে বলতে হবে। কিন্তু হেস-এর সাহায্য পেতে হলে অন্য সব কথাই তার জানার দরকার। এখানে আসতে বলে মুশকিলে পড়ে গেছে ইরা, কিন্তু একজন কারও সাহায্যও যে দরকার ; একজন বলতে পাচ্ছেই বা আর কাকে।

খেতে-খেতে ইরা সমস্তটা খুলে বললে। জংলির মতো গাঁউ-গাঁউ করে ঠাণ্ডা মুর্গির মাংস গিলতে লাগল হেস, যেন কতদিন খায়নি। পাত খালি করে চেয়ারে হেলান দিয়ে আড় হলো, ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। ইরার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটি কথাও বললে না।

কাহিনী শেষ করে ইরা বলল, 'তা, এই হলো ব্যাপার। মাথায় ভূত চেপেছিল, তাই ভিড়ে ছিলুম। এখন চাইলেও বেরিয়ে আসতে পারছি না। কী করব, বল।'

'বেরিয়ে আসতে চাইছই বা কেন ?' হেস যেন জেরা করছে।

'আমার টাকার দরকার নেই। এমনিতেই তো সব জুটে গেছে আমার। বুঝতে পারছ না ? এই রকম ভাবে টাকা সরাতে থাকলে ধরা পড়তেই হবে, আর তখন কী মুশকিল হবে বল তো ?'

'তোমার বখরা কত ?'

'হাজার পাঁচেক। এড্রিস তাই কথা দিয়েছে। তখন মনে হয়েছিল অনেক, কিন্তু এখন ·····ক দিনই বা চলবে তাতে।'

হেস-এর চোখে অভিসন্ধির ছায়া। 'এড্রিস কত পাচ্ছে?'

'কুড়ি হাজার…ঐ রকম গোছের। ঠিক বলতে পারব না।'

'বটে? হতেই পারে না। কুড়ি হাজারের জন্যে এত ঝক্কি পোয়াতে ওর বয়ে গেছে। খুব ধোঁকা দিয়েছে তোমায়। বাজি রাখ, এক একবারে গাদা-গাদা টাকা সরাচ্ছে অ্যাল্‌জার।'

'একবারই তো নিয়েছে এ পর্যন্ত। পাঁচ হাজার ছ শো।' লোভে চকচকে হয়ে উঠেছে হেস-এর মুখটা, লক্ষ্য করে অস্বস্তি বোধ করল ইরা।

'রোজ একবার করে হলে ওতেই কুবেরের ভাঁড়ার হয়ে যায়। না, নির্ঘাৎ ঠকাচ্ছে তোমাকে। কী করা দরকার জান,…'

'ঠকাচ্ছে তো ঠকাচ্ছে, বয়েই গেল। আসল কথা, আমি বেরিয়ে আসতে চাই! যা পেয়েছি, তা-ই আমার ঢের! আমি বেরিয়ে আসব, তুমি ওদের রুখবে, এই আমি চাই, হেস।

নাক খুঁটছে হেস। শূন্যদৃষ্টিতে ইরার মুখের দিকে চেয়ে আছে। ইরার শেষ কথাগুলো কানে যায়নি।

'হেস! শুনলে, কী বললুম?'

'আঃ, ঘ্যান-ঘ্যান কোর না! মানুষকে একটু ভাবতে দেবে তো!'

চুপ করে বসে রইল ইরা। হেসকে দেখতে লাগল।

'হাতটা সরাবে নাক থেকে?' না-বলে থাকতে পারল না ইরা, গা ঘিন ঘিন করে।

'একদম চুপ! দুবার যেন বলতে না হয়!' পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল হেস। 'মতলবটা খাসা। এড্রিস লোকটার বুদ্ধি আছে।'

'কোন্ মতলব ?'

'বসে-থাকা সিন্দুকের প্যাঁচটা বড় জব্বর। মাথা খারাপ না-হলে ছেড়ে আসতে চাও ?'

'কিন্তু হেস, কতখানি ঝুঁকি রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না ? কত বছর ঘানি টানতে হবে, ভেবে দেখেছ ?'

'সেটা আগে ভাবলেই তো পারতে !' হেস-এর চোখদুটো কুঁচকে উঠল।

'তখন নগদ টাকার লোভে মাথার ঠিক ছিল না। এখন আর আমার টাকার দরকার নেই। আমার কোনও ঝুঁকি নেবার দরকার নেই। এক শো বার তো বলছি, বুঝছ না কেন ?'

সিগারেটে লম্বা টান মারল হেস। নাক দিয়ে আস্তে-আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। 'তাতে আমার কী লাভ হবে ? তুমি যদি ছেড়ে দাও, আমার কপালে ফক্কা। এড্রিস-এর সঙ্গে থেকে যাও, আমায় ভাগ দিয়ো।'

'পেরে উঠব না, হেস। অত টাকার ব্যাপারে মাথা গলানো ঠিক নয়। তুমি আমায় সাহায্য কর, তোমায় টাকা পাইয়ে দেব। দিব্যি গালছি, টাকা পাবে।

'কত ?'

'বলতে পারি না। দেখি, ডিভন-এর কাছ থেকে কত পাই। শো তিন-চার হবে, হেস।'

'ফালতু কথা যত সব। এই মাত্র বললে যে, এড্রিস পাঁচ হাজার দেবে বলে কথা দিয়েছে। শোন, ওর সঙ্গেই লটকে থাক! বুঝতে পেরেছ! সোজা কথা বলে দিলুম! যদি

বেগড়বাঁই করে, কড়কে দেব, কিন্তু ওর কথামতো চললে নিশ্চয়ই গণ্ডগোল করবে না, এবং তুমি ওর কথামতোই চলবে। তোমার ধক হচ্ছে না বলে পাঁচ হাজার ডলার আমি গলে যেতে দেব, এই যদি ভেবে থাক, তা হলে জেনে রেখ, আরও দুখ্খু কপালে আছে তোমার।'

হঠাৎ রাগে দিশাহারা হয়ে উঠল ইরা। চেঁচিয়ে উঠল. 'আমি কী করব না-করব, তা নিয়ে তোমার উপদেশ দেবার দরকার নেই! আমি তোমার·· ···'

হেস-এর হাতটা এত আচমকা উঠে এল যে, এড়ানো গেল না। পটকা ফাটার মতো আওয়াজ করে হেস-এর হাতের চেটোটা ওর গালের ওপর আছড়ে পড়ল এসে। ঘুরপাক খেয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল ইরা।

মাথা বোঁ-বোঁ করছে, তবু ওঠবার চেষ্টা করলে। নির্মমভাবে লাথি চালালে হেস, জুতোর ডগাটা ওর উরুতের মাংসের মধ্যে গেঁথে গেল বোধ হয়।

গড়িয়ে নাগালের বাইরে চলে গেল ইরা, হাঁচড়-পাঁচড় করতে-করতে উঠে দাঁড়াল। হেসও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখে সতর্ক দৃষ্টি, হাতদুটো শিথিল আলস্যে লম্বা হয়ে ঝুলে আছে: নিউ ইয়র্কের রাস্তায় মারামারির সময়ে অনেকবার হেস-এর এই চেহারা দেখেছে ইরা। জানে, এক পলকে চিতা বাঘের মতোই ক্ষিপ্র আর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। জানে বলেই আর এগোতে সাহস করলে না।

দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে চীৎকার করে উঠল, 'বেরিয়ে যাও, দূর হয়ে যাও! তোমাকে আনাই অন্যায় হয়ে গেছে

আমার। তোমার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি···জীবনে নয়! দূর হও তুমি।'

'সময় হলেই যাব।' চামড়ার জ্যাকেটটা সড়াৎ করে খুলে একটা চেয়ারের ওপর ছুড়ে দিলে হেস। 'ঘা কতক খাওয়া দরকার তোমার। বড্ড তেজ। আমি হেস—ভুলে গেছ? জামা-টামা সব টান মেরে খুলে ফেল! নিঙড়ে-নিঙড়ে রস বার করছি তোমার, দেখ না!'

মুখোমুখি দাঁড়াল ইরা। চোখদুটো ধক-ধক করছে।

'বেরিয়ে যা! থোড়াই ভয় করি তোকে, ঘেয়ো কুত্তা কোথাকার! তোর মতোন একটা ম্যাদার কাছে আবার উপকার চাইতে গিয়েছিলুম! এই মুহূর্তে বেরিয়ে যা!'

তিন পা এগিয়ে গেল হেস। ইরা দুহাত বাড়িয়ে খামচাতে গেল তাকে। মাথা সরিয়ে সেটাকে এড়াতে গিয়ে মুখে এসে লাগল। ইরার পাঁজরার ঠিক নিচেই প্রাণপণে একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিলে।

হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ইরা। হাত তুলে মাথার পাশে আরও একটা ঘুঁষি কষালে হেস। চোখে অন্ধকার দেখল ইরা, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল, এলিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। টের পেলে, তার জামার কলারের মধ্যে আঙুল ঢোকাচ্ছে হেস। হাতটা খামচে ধরতে চেষ্টা করলে। তার পরেই সারা শরীরে একটা হ্যাঁচকা টান। দুফালা হয়ে খুলে গেছে গায়ের ফ্রক। গড়িয়ে সরে যাবার চেষ্টা করলে, চোয়ালের পাশে আবার একটা ঘুঁষি এসে পড়ল।

বিড়-বিড় করে গালাগাল দিচ্ছে হেস, চেপে-বসা দুপাটি

দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিশ-এর মতো শব্দ করে দম নিচ্ছে, ইরার গা থেকে বাকি সব টান মেরে খুলে নিচ্ছে একে-একে।

গায়ের ওপর হেস-এর দেহের চাপ, কষ্ট, যন্ত্রণা—আবছা মতোন টের পেয়েছে ইরা, কিন্তু ও তখন অসাড়। খানিক পরে হেস-এর ভারটা অপসৃত হয়েছে ওর নিশ্চল দেহের ওপর থেকে।

কানে এসেছে, অনেক দূর থেকে যেন কানে এসেছে, 'ঠিক আছে, যাদুমণি, পরে আবার দেখা হবে। এড্রিস যা বলবে, মুখ বুজে করে যাবে। না-হলে আবার দোব। শুনতে পেয়েছ?'

চুপচাপ চোখ বুজে পড়ে থেকেছে ইরা। মাথায়, পাঁজরে আর তলপেটে যন্ত্রণা। ক্যাবিনময় হেস-এর চলা-ফেরার আওয়াজ পাচ্ছে। কী করতে চায় হেস? জানা দরকার, কিন্তু আগ্রহও স্তিমিত। চোখের কোণ থেকে গরম জলের ধারা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে। আশ্চর্য লেগেছে ইরার; বরাবর জানত, তার মতো শক্ত মেয়েরা কাঁদতে জানে না।

ফিরে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে হেস। টাটানো পাঁজরের নিচে আস্তে করে জুতোর ডগা দিয়ে একটা খোঁচা মেরেছে।

বলেছে, 'তোমার মালকড়ি যা ছিল, নিয়ে চললুম। তুমি আরও বাগাতে পারবে, আমি তো পারব না। চলি।'

তারপর ইরা ওকে চলে যেতে শুনেছে—বাইরের ঘর পার হলো, দরজা খুললো, সজোরে ঠেলে দিয়ে বন্ধ করল, বাইরের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

তারও পর, ক্যাবিনের মধ্যে অস্বস্তিকর একটা গভীর নীরবতা নেমে এসেছে। মাঝে-মাঝে সুধু ইরার বুক-ভাঙা কান্নার গোঙানি।

৭

…াম গাছের ছায়ার তলায় গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে হেস প্রায় এক ঘণ্টাটাক হতে চলল। এতক্ষণে ক্যাবিন থেকে বেরুল ইরা। পরনে ঢোলা প্যাণ্ট, বীচ জ্যাকেট। চুপচাপ লক্ষ্য করতে লাগল হেস। ক্যাবিনের দরজায় চাবি দিলে ইরা, ক্যাবিনের ঢালু ছাদের তলাকার কাঠের ফ্রেমের একটা জায়গায় গুঁজে রেখে দিলে চাবিটা। কষ্টে-সৃষ্টে গাড়িতে গিয়ে চড়ল। গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

দাঁড়িয়ে উঠে আড়-মোড়া ভাঙলে হেস। বেশ তৃপ্তি লাগছে, হাল্কা লাগছে। ক্যাবিনে গিয়ে লুকনো জায়গা থেকে চাবিটা বার করে দরজা খুলে বসবার ঘরে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে দিলে। আলো জ্বেলে কাঁধের থলেটা সোফার ওপর ফেলে দিলে।

গলায় কিছু ঢালা দরকার। আলমারি খুলে নির্জলা হুইস্কি নিলে গেলাসে! রান্নাঘরে গিয়ে রেফ্রিজারেটর থেকে বরফ নিলে। বসবার ঘরে এসে আরাম করে বসল।

কোঁৎ করে হুইস্কিটা শেষ করলে, ফোঁস করে দম ছাড়লে, গেলাসটা কার্পেটের ওপরেই ফেলে দিলে।

রাতটা এখানেই কাটানো যেতে পারে। শোবার ঘরটা দেখে রাখা যাক।

চাপা গলায় গুনগুন করতে করতে শোবার ঘরে ঢুকল হেস। দু-বিছানার খাট, গুছনো ঘর।

চমৎকার! জ্যাকেটটা খুলে চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে দিলে। গা-আলমারি খুলে হাল্কা বেড়ানোর পোশাকগুলো দেখতে লাগল। ওর সরু আড়ার পক্ষে বড্ড বড়; ব্যাজার মুখে টানার দিকে নজর দিলে।

শার্ট রয়েছে, রুমাল রয়েছে, মোজা রয়েছে, ওর লোভ নেই। একদম তলাকার টানাটা খুললে। সঙ্গে সঙ্গে সিঁটিয়ে কাঠ হয়ে গেল। তোয়ালের তলা থেকে উঁকি মারছে একটা '৩৮ কোল্ট অটোম্যাটিক। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেই দিকে, তারপর উত্তেজনার তাগিদে সাবধানে হাতে তুলে নিলে।

মোকাসিন দলের সর্দার হবার পর থেকে, পিস্তলের জন্যে বড় লোভ ছিল ওর। পিস্তলটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল, চ্যাপসানো নাকের ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাঁই-সাঁই শব্দ শোনা যেতে লাগল। নাড়া-চাড়া করতে-করতে ক্লিপ খোলবার কায়দাটা বুঝে নিলে। পাঁচটা গুলি ভরা যায়। বিছানায় গিয়ে বসল হেস, এক হাতে ক্লিপ, আর এক হাতে পিস্তল, শূন্য দৃষ্টি সামনের ফাঁকা দেওয়ালের দিকে।

অনেকক্ষণ অনড় বসে রইল; মনের মধ্যে হরেক চিন্তার ঘূর্ণিপাক। এক সময়ে কুটিল একটা হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে, ধীরে-ধীরে, ঘাড়টা সামনের দিকে দোলালে বার দুয়েক। কী করবে, পাকা হয়ে গেছে। হাতে পিস্তল থাকলে সবার সঙ্গেই যোঝা যায়। ইরাকে মোচড় দিয়ে টাকা আদায়ের

এলেবেলে খেলাটার আর দরকার নেই। এক কোপে অনেক বড় শিকার করতে পারে সে এখন।

ক্লিপ লাগিয়ে পিস্তলটা খাটের লাগোয়া টেবিলের ওপর রেখে দিলে হেস, পা ঝাঁকিয়ে জুতোজোড়া ছুঁড়ে দিয়ে ঝপ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচটা বন্ধ করে দিলে—ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসিটা লেগে রয়েছে তখনও।

ইরা যখন বারান্দায় এল, ডিভন-এর প্রাতরাশ তখন প্রায় শেষ। কাল রাত এগারোটার কিছু পরেই বাড়ি ফিরেছিলেন ডিভন, ফিরে একটু হতাশ হয়েছিলেন। আলো-টালো নিবিয়ে যে-যার শুয়ে পড়েছে, ইরাও জেগে ছিল না। একবার ভেবেছিলেন ডেকে তুলে খবরটা দেবেন, কিন্তু বিরক্ত করতে চাননি। ভালোই করেছিলেন। ইরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। মেল যে বাড়ি ফিরেছে, আওয়াজে টের পেয়েছে ইরা, আর কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছে, যেন এঘরে না আসেন। সারারাত জেগে কাটিয়েছে বিধ্বস্ত দেহ আর বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে।

ইরাকে আসতে দেখে চোখ তুলে তাকালেন ডিভন। ইরার ফ্যাকাসে চেহারা দেখে চমকে উঠলেন।

খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'এই যে। একটু কাহিল দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে। রাত করে শুয়েছিলে?'

'না'। বসল ইরা। নিতান্ত অভ্যাসবশেই কাপে কফি

ঢাললা। 'আমি ঠিক আছি। মাথা ঘামাবার কিছু নেই।' জোর করে মেল-এর দিকে তাকাল। 'তারপর, জয় কী বললে?'

মেল-এর মুখে খুশির ঝিলিক। 'এ মাসের শেষেই বিয়ে। তখন হানিমুন-এর জন্যে দিনকয়েকের ছুটি পাব। মাসখানেক একা থাকতে তোমার অসুবিধে হবে?'

এই তো সুযোগ! মেল যখন থাকবে না, তখন মিসেস স্টার্লিংকে (সংসারের দেখাশোনা করেন যিনি) বললেই হবে যে, দিনকতক এক বন্ধুর সঙ্গে থাকতে যাচ্ছে। তার পর চুপিসাড়ে প্যারাডাইস সিটির বাইরে। মেল ফিরে আসতে-আসতে অনেক দূরে চলে যাবে সে: কোথায় যাবে এখনও জানে না, তবে যাবে ঠিকই।

'না, মোটেই না। কোথায় যাবে কিছু ঠিক করেছ না কি?'

'ভেনিস যাব, ইটালি। হনিমুন-এর পক্ষে একেবারে না-কি আদর্শ।'

কফি শেষ করল ইরা। 'ম্ ম্ ম্···খুব ভালো। শুভেচ্ছা রইল, বাপি!'

'ধন্যবাদ।' উঠে পড়লেন ডিভন। ঘুরে ইরার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আলতো করে কাঁধে হাত রাখলেন। 'তোমাতে আর জয়-এতে খুব মিল হবে।' ওর গালে একটু চুমু খেলেন।

অনাস্বাদিত আবেগের একটা দমকা বয়ে গেল ইরার সর্বাঙ্গে। আচমকা উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'এবার বেরুতে হবে। রাত্তিরে দেখা হবে, বাপি।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইরা।

একটু অবাক হয়ে ওর গমনপথের দিকে চেয়ে রইলেন ডিভন। মাথা নেড়ে ব্রীফকেসটা তুলে নিলেন। বাইরে ইরার গাড়ির শব্দ পেলেন।

এগারোটার একটু পরেই দীর্ঘাঙ্গিনী সুবেশা এক বর্ষিয়সী মহিলা সিঁড়ি বেয়ে ভল্টে এসে নামলেন। কোটিপতি লৌহ-ব্যবসায়ীর স্ত্রী, মিসেস মার্ক গার্ল্যাণ্ড। গার্ডেদের একজন আগেই বলে রেখেছিল ইরাকে।

মিসেস গার্ল্যাণ্ড সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিতেই উঠে দাঁড়াল ইরা। খুব বিনীতভাবে বললে, 'গুড মর্নিং, মিসেস গার্ল্যাণ্ড।'

'তুমিই মেল-এর বেটি না? তোমার কথা অনেক শুনেছি।' চেয়ারে বসলেন। 'অনেক বছর আগে তোমার মায়ের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, নোরিনা।' ইরার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলেন। 'চেহারার খুব মিল। শুনলুম, মেল বিয়ে করছে। তোমার ভালো লাগবে?'

'নিশ্চয়ই লাগবে, মিসেস গার্ল্যাণ্ড। আমি খুব খুশি।'

'জয়-এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ মেয়ে, না?'

'খুব ভালো।'

'তোমার সঙ্গে আগে আলাপ হয়নি বলে দুখ্খু হচ্ছে। আমাদের ওখানে সব সময়েই ছেলেমেয়েদের দঙ্গল। পরের বছর আমার ছেলে যখন বেড়াতে আসবে, নিশ্চয়ই আলাপ কোর।' বিশাল একটা হাতব্যাগ থেকে সিল-করা একটা

খাম বার করলেন। 'আমার সিন্দুকে ভরে রেখে আসবে? এই নাও চাবি।'

'নিশ্চয়ই, মিসেস গার্ল্যাণ্ড।' ইরার বুকটা হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠল। খাম আর চাবিটা নিলে। ঘুরে টেবিলের ওপাশে গিয়ে টানা খুলে পাশ কী বার করলে। একটু ইতস্তত করে পুটিং-এর ড্যালাটাও তুলে নিলে টানা থেকে। তাড়াতাড়ি গলিপথের মধ্যে ঢুকে পড়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে মিসেস গার্ল্যাণ্ড-এর সিন্দুকের সামনে এসে দাঁড়াল। সিন্দুক খোলবার আগে সাবধানে চাবির ছাপটা তুলে নিলে। হাত ওঠাতে গিয়ে আচমকা থেমে গেল। ছাপ তোলবার দরকারটাই বা কী? নিজের টাইট জাঙিয়ার সামনের দিকে খামটা গুঁজে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, অ্যাল্‌জারকে চাবি তৈরির ঝক্কি পোহাতে হয় না।

পোহাক ঝক্কি! চাবি তৈরি করে মরুক! সোমবারের আগে টাকায় হাত দিতে পারছে না। খামটা রাখবার সময়ে সিন্দুকের ভিতরটায় চোখ বোলালে। অনেকগুলো জড়োয়ার বাক্স, আর অনেকগুলো একই রকমের খাম—হুবহু আজকেরটার মতোন। সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলে।

পিছন ফিরতেই চোখে পড়ল, মিসেস গার্ল্যাণ্ড কখন গলির মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন, ওরই দিকে চেয়ে রয়েছেন আনমনে। শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা কিসের স্রোত বয়ে গেল। কী বাঁচান বেঁচে গেছে! খামটা যদি সিন্দুকে না-রাখত, মিসেস গার্ল্যাণ্ড পরিষ্কার দেখতে পেতেন, ও চুরি করছে!

কাছাকাছি এসে পড়তেই মিসেস গার্ল্যাণ্ড বললেন, 'নিউ ইয়র্কে যদি আস, নিশ্চয়ই দেখা কোর। তোমার বাবাকে কতবার বলেছি আমাদের কাছে কদিন কাটিয়ে আসতে, কিন্তু সময় আর হয় না।'

'নিশ্চয়ই দেখা করব।' প্রাণপণে গলাটা স্থির রাখতে চেষ্টা করল ইরা। 'কিন্তু নিউ ইয়র্ক যাওয়া হয়ে উঠবে বলে তো মনে হয় না।'

'যাই হোক, গেলে মনে রেখ। গুডবাই, নোরিনা।' দ্রুতপায়ে ফিরে চলে গেছেন মিসেস গার্ল্যাণ্ড।

লাঞ্চের সময়ে কাফেতে গেল ইরা।

অ্যাল্‌জার-এর পাশে গিয়ে বসতেই প্রশ্ন হলো, 'কী হলো?'

চাবির ছাপের বাক্সটা বিনা বাক্যব্যয়ে অ্যাল্‌জার-এর হাতে তুলে দিলে ইরা।

'কার সিন্দুক?'

'মিসেস মার্ক গার্ল্যাণ্ড।'

'টাকা আছে?'

'আছে···প্রচুর।'

'ঠিক আছে। মিথ্যে কথার পরিণাম কী, তা খুলে বলার দরকার নেই নিশ্চয়ই? এই শেষ বার···মনে রেখ!'

মুখ ঘুরিয়ে কাফে থেকে বেরিয়ে এল ইরা। নিজের চিন্তায় এতই আত্মমগ্ন যে, দেখতেই পেল না, রাস্তার ওপারে ভাড়াকরা একটা ঝড়ঝড়ে ফোর্ড গাড়ির ভিতরে স্টিয়ারিং হাতে বসে রয়েছে হেস ফার।

অ্যাল্‌জার-এর গাড়ির পিছু পিছু চলতে লাগল হেস-এর গাড়ি—এড্রিস-এর বাসাবাড়ির দিকে।

প্যারাডাইস সিটি পুলিশের ফ্রেড হেস বালিয়াড়ির গায়ে হেলান দিয়ে বসে এতক্ষণে একটু আয়েস পেলে, পরম পরিতৃপ্তির একটা আমেজি ঢেকুর তুলে আরও মৌজ লাগল। সবে পিকনিকের ভুরিভোজন সারা হয়েছে, রোদের আঁচটি ভারি মিঠে লাগছে, হাওয়াটা ফুরফুরে, ঢেউয়ের নিরবচ্ছিন্ন গুড়গুড় শব্দটা ঘুমপাড়ানি গানের মতো ঝিম-ধরানো।

অনেক দিন বাদে শনি-রবিবারের ছুটি পেয়েছে এবার। আজ সবে শনিবারের সকাল। ভোর থাকতেই ঠিক করে ফেলেছিল, চমৎকার শান্ত সমুদ্রতীরের এই চানের জায়গাটিতে সারাটা দিন কাটিয়ে যাবে।

আঙুলে আঙুল জড়িয়ে হাতদুটো ভুঁড়ির ওপর আলতো করে তুলে রাখতে রাখতে ভেবে দেখলে, এত সাধের টাটকা দুধে একটি মাত্র চোনা যা আছে, তা হলো তেএঁটে ছেলেটা। অন্যদের ছেলেপিলেদের ভালোই লাগে, কেবল নিজের ছেলেটাকেই মানাতে পারে না। মুশকিল হলো, অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেছে ফ্রেড, হারামজাদাটা একেবারে বিগড়ে গেছে। মা হিসাবে মারিয়ার যত আদিখ্যেতা, গিন্নি হিসাবে তেমনি কড়া-শাসন—ছোঁড়াটার গায়ে হাত দেবার পর্যন্ত উপায় নেই। অথচ এসব ছেলেকে শায়েস্তা করার একমাত্র দাওয়াই হোল,

গোব্‌দা-গোব্‌দা দাবনার ওপর দেখ-না-দেখ কষে থাপ্পড় কষানো।

যাই হোক, আপাতত সব দিক থেকে শান্তি। মারিয়া ব্যাটাকে জলের ধারে টেনে নিয়ে গেছে। সেখানে মার পোশাকে জল ছেটাতে-ছেটাতে ফুর্তিতে গলে পড়ছে একেবারে।

ফ্রেড সাফ বলে দিয়েছে, একটু গড়িয়ে নেবে। নেবেই। ছেলে বলে, বল খেলবে। তাই নিয়ে চেঁচামেচি কম হয়নি। শেষকালে কর্তার ব্লাডপ্রেসার চড়ে যাবার ভয়ে ব্যাটার নড়া ধরে হিড়-হিড় করে সরিয়ে নিয়ে গেছে মারিয়া অনেকখানি তফাতে, যাতে ফ্রেড-এর চোখা-চোখা বুকনিগুলো কচি ছেলেটার কানে না-যায়।

একেই বলে জীবন! চোখের পাতা বন্ধ করতে-করতে ভেবে দেখল ফ্রেড—একেই বলে জীবন! আর কী চাইবার আছে? হেড্‌কোয়ার্টারের ভ্যাপ্‌সানির মধ্যে ডিটেক্‌টিভ্‌দের গুমোট ঘরটায় বসে-বসে যারা গলদঘর্ম হচ্ছে এখন, তাদের কথা ভেবেও শান্তি। গলা দিয়ে তৃপ্তির একটা শব্দ বার করল ফ্রেড, তন্দ্রার মধ্যে ডুবে যেতে লাগল।

মিনিট পনেরো ঘুমিয়েছিল। তার পরই পুত্রের উদয় এবং পরিণামে বিকৃতমুখে ফ্রেড-এর নিদ্রাভঙ্গ।

'ভাগ এখান থেকে!' ছেলের দিকে চেয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল ফ্রেড। নাদুস-নুদুস বাচ্চা ছেলে, থুঁৎনিটা একটু বেশি খুঁচিয়ে-ওঠা, ভাব-ভঙ্গী প্রায় বাপের মতোই একরোখা। 'দেখি তো, কতদূর দৌড়তে পারিস। পা দুটো খসে না-পড়া পর্যন্ত দৌড়ো, দেখি, কতক্ষণ হয়।'

কানই দিলে না ছেলেটা। বালি-খোঁড়া খোন্তাটা তুলে নিয়ে সোজা মার কাছে গিয়ে বললে, 'বাবাকে বালিচাপা দেব।'

একটু ছায়ায় বসে ছিল মারিয়া। ছেলেকে বলল, 'বেশ, ঠিক আছে। কিন্তু গোলমাল করবে না। তোমার বাবা খুব ক্লান্ত, একটু আরাম করবে এখন।'

'আরে!' প্রতিবাদ করে উঠল ফ্রেড। 'একটুখানি শান্তিতে থাকতে চাইছি রে বাবা, চাপা-টাপা চলবে না!'

থুঁৎনিটা আরও খানিকটা এগিয়ে দিয়ে খোকা বললে, 'বাবাকে বালিচাপা দেব।'

'দেখ, ফ্রেড,' মারিয়া বোঝাতে চেষ্টা করলে, 'ছোট ছেলে মাত্রই লোককে বালি চাপা দিতে ভালোবাসে।'

'তাই বুঝি? তা তোমায় চাপা দিক।' ফ্রেড-এর থুঁৎনিটাও ঠেলে বেরিয়ে এল।

'আমি বাবাকেই চাপা দেব।' খোকার গলা এবার আরও চড়া।

মারিয়া আবার বোঝাতে গেল, 'ও তো আমায় চাপা দিতে চাইছে না, তোমাকেই চাপা দিতে চাইছে।'

'জানি, কালা নই। কাছে আসুক না, একবার, এমন কান মলে দেব, ফুলে কলা গাছ হয়ে যাবে একেবারে!'

'শোন ফ্রেড, বুঝে দেখ। স্বার্থপরের মতো কথা বোল না। তোমারও যেমন ছুটির আমোদ, খোকারও তাই। গায়ের ওপর একটু-আধটু বালি ছড়ালে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়, জানি না বাপু। ছোটরা অমন করতে ভালোবাসে।'

'ছোটরা কী ভালোবাসে না-বাসে, তাতে আমার শালার কী? আমি ভালোবাসি না, ব্যস।' বলতে-বলতে মুখটা লাল হয়ে উঠল।

'ফ্রেড হেস! নিজের ছেলের সামনে অমন অসভ্য কথা বলতে পারলে? শুনে আমারই লজ্জা হচ্ছে।' কথার ভঙ্গীতে বোঝা গেল, সত্যিই ক্ষুব্ধ হয়েছে মারিয়া।

ছেলে ওদিকে ততক্ষণে তারস্বরে বলে চলেছে, 'শালা! শালা! শালা!' চেঁচাচ্ছে আর তালে-তালে লাফাচ্ছে। বাবা দোষ করেছে, এবার বেকায়দায় ফেলবার সুবিধা হবে, তাই তার ভারি আনন্দ।

প্রচণ্ড রাগে ধমকে উঠল মারিয়া, 'একদম চুপ কর, খোকা! আর যেন কোনও দিন তোমার মুখে ওকথা না-শুনি!'

'কেন বলব না। বাবা তো বলে!' বাবার দিকে চতুর দৃষ্টি হেনে উত্তর দিলে খোকা।

'তোমার বাবারও বলা উচিত হয়নি।'

'দুষ্টু বাবা, দুষ্টু বাবা!' আবার নাচতে-নাচতে চেঁচাতে লাগল খোকা। 'শালা বলতে নেই, তবু বলে!'

ফ্রেড-এর দিকে চেয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল মারিয়া, 'কী সর্বনাশটা করলে এবার দেখ।'

মজাই লাগছিল ফ্রেড-এর। অতিকষ্টে মুখখানা গম্ভীর করে রাখলে।

'একদিন না একদিন তো শিখবেই,' মারিয়ার দিকে চেয়ে সর্বজ্ঞের ঢঙে বললে ফ্রেড। 'যাক গে, এবার থাম দিকিনি খোকা! একটু ঘুমতে দে!'

'বাবাকে বালি চাপা দেব,' নাকি সুরে ঘ্যানঘেনিয়ে উঠল খোকা। তারপর চুপ করে দেখতে লাগল, কী হয়।

মারিয়া এবার সত্যিই চটে গেছে। 'যদি নিশ্চিন্তে থাকতে চাও, ফ্রেড, যা বলছে করুক। জানোই তো কীরকম গোঁয়ার; সারা বিকেল ঘ্যান-ঘ্যান করবে কানের কাছে।'

'আমি বাবাকে বালি চাপা দেব!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে এবার খোকা, জিৎ যে হবেই, তার আভাস পেয়ে গেছে।

হঠাৎ ফিসফিসে চিঁড়ে-ভেজানো গলায় কথা বলতে লাগল ফ্রেড। 'একটা থাপ্পড় কষালে কেমন হয়? কিছু না, ধর, কানটাই একটু মুচড়ে দিই যদি। বেশি লাগবে না। একটু ভয় দেখানো আর কি। তোমার কী মত?'

'ফ্রেড হেস!' মারিয়ার গলাটা চিরে গেল বোধ হয়!

কাঁধ ঝাঁকালে ফ্রেড। 'ঠিক আছে; জিগ্যেস করতে তো দোষ নেই!'

খোকা জানে, মা কাছে থাকলে বাবার হাত উঠবে না, তাই মুখ-চোখ লাল করে তারস্বরে ঐকান্তিক ইচ্ছাটা ঘোষণা করে চলেছে, বাবাকে সে বালি চাপা দেবেই।

হঠাৎ বেশ খোশমেজাজে বলে উঠল ফ্রেড, 'এই, খোকা! একটা কথা বলি, শোন!'

চীৎকার থামিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে বাপের দিকে তাকাল খোকা।

'কী বলবে?'

'ঐ যে বড় বালিয়াড়িটা দেখছিস···ঐ যে খুব 'উঁচুটা?'

শ খানেক গজ দূরে বেশ বড়-সড় বালির ঢিবিটার দিকে আঙুল দেখাল ফ্রেড।

ফিরে দেখল খোকা। 'হ্যাঁ।'

'একটা ভীষণ লুকনো কথা বলতে পারি ; ঐ ঢিবিটার কথা। কিন্তু, আগে কথা দিতে হবে, কারুকে বলবি না। ভীষণ রহস্যময় গোপন কথা।'

খোকার চোখে কৌতূহলের আভাস। 'কী ভীষণ রহস্য ?'

ভাবতে লাগল হেস।

'কাছে আয়। শুধু তোকে বলব।'

কৌতূহল সামলাতে পারলে না খোকা, বাপের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ফ্রেড-এর হাতটা একবার নিশপিশ করে উঠল, কোনও রকমে চেপে গেল। নিচুগলায় ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল, 'কাল রাত্তিরে একটা বুড়ো ঐখানে ঘুমচ্ছিল শুয়ে শুয়ে! বুড়ো বড় ভালো লোক। ছোট ছেলেদের কী ভালোই যে বাসে! সব সময়ে বড়-বড় খাস্তা মাংসের পাই সঙ্গে নিয়ে ফেরে, ছোট ছেলে দেখলেই দেয়।'

ফ্রেড জানে, মাংসের পাই হলো খোকার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। খোকার মুখটা জ্বলজ্বল করে উঠল।

'তারপর বুড়োর কী হলো ?' সাগ্রহে জিগ্যেস করলে, চোখটা কিন্তু সেই বালিয়াড়ির দিকে।

ফ্রেড বললে, 'বালি চাপা পড়ে গেল। ঐ ঢিবিটার তলায় বেমালুম চাপা পড়ে গেল বেচারা বুড়ো। ঘুমচ্ছিল তো, আর এদিকে সারা রাত ধরে বালি উড়ে এসে-এসে ওর সারা গা ছেয়ে ফেলতে লাগল ; বালি জমতে, জমতে, জমতে, জমতে,

উঁচু ঢিবি হয়ে গেল, আর চাপা পড়ে গেল বুড়ো···সেই সঙ্গে যত মাংসের পাই ছিল, তাও। যা না, খুঁড়ে তোল না।'

'পাইগুলো এখনও আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে! যাবে কোথায়! সুন্দর খাস্তা মচমচে পাই, থকথকে কাই-মাখা-মাখা টসটসে মাংসের ডেলা, তার সঙ্গে গাদা-গাদা মাখন!' বলতে-বলতে নিজেরই জিভে জল এসে গেল ফ্রেড-এর। মনে হলো, বিকেলের জল খাবারের মতো কিছু মাংসের পাই আনবার কথা খেয়াল করলে বড় ভালো করতো মারিয়া।

'ইস!' খোকার চোখদুটো বড়-বড় হয়ে উঠল। 'কিন্তু, বুড়োর কী হলো? মরে গেল না···ঐ অত বালির তলায় চাপা পড়ে?'

'বুড়ো ঠিকই আছে, কিচ্ছু হয়নি। বালি খুঁড়ে যদি তুলতে পারিস, কী খুশিই যে হবে। সব পাই দিয়ে দেবে তোকে। যা-না, গিয়ে দেখ।'

একটু দোনা-মনা করলে খোকা। বাবা ঠাট্টা করছে কিনা, ঠিক ঠাহর করতে পারলে না। 'তুমিও এস না, আমার সঙ্গে খুঁড়বে চল!'

'তা গেলেই হয়।' ওঠবার ভঙ্গী করলে ফ্রেড। এ রকম কথা যে উঠতে পারে, আগেই আঁচ করেছে, জবাবও তৈরি। 'আমায় দিয়ে কাজ করালে কিন্তু ভাগ দিতে হবে। আমি বেশি ভাগ পাব, কারণ আমি বড়, তুমি ছোট।'

ভুরু কোঁচকাল খোকা। 'তুমি কেন বেশি পাবে? কেনই বা?'

'পাবই তো। আমি বড়, আমার খিদেও বেশি।'

একটু ভাবলে খোকা। 'তা হলে একাই খুঁড়ি।' বলেই খোন্তাটা তুলে নিয়ে বালিয়াড়িটার দিকে টেনে দৌড় লাগালে।

'ছিঃ, লজ্জা করে না!' মুখে বললে বটে মারিয়া, কিন্তু হাসি চাপতে কষ্টও হলো। 'ছেলেকে কেউ এমন মিথ্যে কথা বলে! একটু পরেই মজা টের পাবে। খুঁড়ে যখন দেখবে পাই-ফাই কিছু নেই, তখন দেখবে কী হয়!'

মুচকি হেসে আবার আড় হলো হেস।

'ততক্ষণে বাড়ি ফেরার সময় হয়ে যাবে। থাক গে, এবার ঘুমুব।' খোকা হন্যে হয়ে বালি খুঁড়ে চলেছে, সেই দিকে একবার দেখলে, আবার একটু হেসে চোখ বন্ধ করে ফেললে।

দশ মিনিটও ঘুমোয়নি, খোকার আকুল চীৎকারে চটকা ভেঙে গেল। রাগে চোখ-মুখ লাল করে অতি কষ্টে উঠে বসল ফ্রেড।

লাফাতে-লাফাতে হাত নেড়ে বাবাকে ডাকছে খোকা।

প্রাণপণে চীৎকার করে বলছে, 'ও বাবা! শিগগির এস! বুড়ো নয় গো, বাবা, বুড়ো নয়···একটা মেয়ে, পচে গন্ধ বেরুচ্ছে!'

পুলিশ-ফোটোগ্রাফারের কাজ সারা হতেই ডঃ লোয়িস এগিয়ে এলেন বালি ভাঙতে ভাঙতে।

টেরেল, বেগলার আর হেস দাঁড়িয়ে রয়েছে বালিয়াড়ির

ধারে, হোমিসাইড বিভাগের লোকেরা লাশটা সন্তর্পণে বালি খুঁড়ে উদ্ধার করছে।

ডঃ লোয়িসকে টেরেল বললেন, 'এবার তোমার ভার। তাড়াতাড়ি রিপোর্ট চাই, ডাক্তার। গলা টিপে খুন করেছে বোধ হচ্ছে।'

মৃতদেহের কাছে এগিয়ে গেলেন লোয়িস।

টেরেল-এর গলা শোনা গেল, 'কাজে লেগে পড় এবার। ফ্রেড, আরও কিছু লোক আনাও। চারধারের প্রত্যেক ইঞ্চি জমি তল্লাশ করে দেখা চাই।'

ঘাড় নেড়ে ছুটল ফ্রেড।

বেগ্‌লার বললে, 'মুখখানার যা অবস্থা, সনাক্ত করা মুশকিল, চীফ। খুনিই পোশাক-আষাক খুলে নিয়ে গেছে, না-হয় অন্য কোথাও পুঁতে রেখেছে।'

টেরেল বললেন, 'মাস দেড়েকের মধ্যে কোনও মেয়ে বেপাত্তা হয়েছে?'

'আমাদের ডিস্ট্রিক্ট-এ নয়।'

'ডাক্তার কী বলে, শুনি, তারপর হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাব। কাল সকালে চেহারার বর্ণনা দিয়ে কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, রেডিও আর টেলিভিশনে আজ রাত্তিরেই। তোমারই ওপর ভার দিলুম, জো।'

'ঠিক আছে।' বেগ্‌লার দেখছে, হাওয়ায় ঘুরপাক খেতে খেতে কেমন করে বালি উড়ে চলেছে। 'মুশকিল হবে, ছাপ-টাপ পাওয়ার আশা কম। নিশ্চয়ই গাড়িতে চাপিয়ে এনেছিল মেয়েটাকে, তৈরি হয়েই এসেছিল। কেননা, ঐ জায়গাটার

বালি এত ঠাস, যে হাতে করে সরানো অসম্ভব। খোন্তা-টোন্তা কিছু সঙ্গে ছিল নিশ্চয়ই।'

ঘাড় নাড়লেন টেরেল।

'ঠিক বলেছ। আর, ইচ্ছে করেই এমন ব্যবস্থা করছে, যাতে সনাক্ত করা না-যায়। মামুলি যারা মেয়েদের জোর করে ধর্ষণ করে, তারা কাপড়-জামা খুলে নিয়ে যায় না। নিশ্চয়ই বুঝেছে যে, মেয়েটাকে সনাক্ত করতে পারলে, ওকেও গাঁথা যাবে। তার মানে ওরা পরস্পরের চেনা।'

মেটো রাস্তা দিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে থামল। স্ট্রেচার নিয়ে নেমে এল দুজন। ফ্রেড শর্টওয়েভ রেডিও-য় খবর পাঠাচ্ছিল এতক্ষণ, কাজ সেরে কাছে এসে দাঁড়াল।

'বেরিয়ে পড়েছে, এখুনি এসে পড়বে সবাই।'

লোয়িস প্রাথমিক পরীক্ষা সারছেন, স্ট্রেচার নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। লোয়িস ওদের দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়তেই এগিয়ে এসে লাশটা স্ট্রেচারে তুললে, একটা চাদর চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্সের দিকে নিয়ে গেল।

টেরেল আর বেগ্‌লার লোয়িস-এর কাছে এসে দাঁড়াল। লোয়িস তখন ব্যাগ বন্ধ করছেন।

'কী বুঝছ, ডাক্তার?'

'খুন···গলা টিপে খুন, ধস্তাধস্তির চিহ্নও রয়েছে। মাস দেড়েক আগের ঘটনা। পচে ভেপসে গেছে একেবারে। বাঁচবার জন্যে যুঝেও ছিল মেয়েটা। মুখের তো এখন কিছুই নেই বলতে গেলে, তবু বেশ কিছু কাটা-ছড়ার লক্ষণ পেয়েছি। মর্গে ভালো করে দেখে আরও কিছু খবর দিতে পারব।'

'ওর ওপর ধর্ষণ হয়েছিল কি ?' টেরেল জিগ্যেস করলেন।

'না।'

বেগলার আর টেরেল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। কাঁধ ঝাঁকালেন টেরেল। খুনের অন্য উদ্দেশ্য খুঁজে বার করতে হবে।

'বয়েস কত হয়েছিল বলে মনে হয়, ডাক্তার ?'

'সতেরো থেকে উনিশের মধ্যে।'

'চুলের রঙ কি সত্যিই সোনালি, না রঙ করা ?'

'স্বাভাবিক।'

'ঠিক আছে। তা হলে রিপোর্টটা যত তাড়াতাড়ি হয় দিয়ে দিও। হ্যাঁ, পোয়াতি নয় তো ?'

'নিখুঁত কুমারী মেয়ে।' গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন লোয়িস। /

টেরেল বললেন, 'তাহলে, জো, তুমি বেরিয়ে পড়। এই বয়েসের কোনও মেয়ে বেপাত্তা হয়েছে কি না, মায়ামিতে একবার খোঁজ নিয়ে দেখ। যদি ওখানে কোনও খবর না-থাকে, আরও ছড়িয়ে জাল ফেলতে হবে। কাগজে-কাগজে খবর দাও, রেডিও আর টেলিভিশনে খবরের ব্যবস্থা করতে বল। খুব বেশি করে চাউর হোক খবরটা। সনাক্ত করার এই একটামাত্রই রাস্তা দেখছি।'

বেগ্লার চলে যেতেই ফ্রেড-এর কাছে এগিয়ে গেলেন টেরেল।

'পেলে কিছু ?'

উবু হয়ে বসে বালি ঘাঁটছিল ফ্রেড। মুখ তুলে জবাব দিলে, 'খুনটা এখানে হয়নি। নাক আর মুখ থেকে রক্তপাত

হয়েছিল, অথচ এখানে রক্তের চিহ্ন নেই। দল-বল এসে পড়লেই ঐ ঝোপ-ঝাড়ের ভেতরটা খোঁজ করাব। হয়তো ওরই মধ্যে কোথাও কাজ সেরেছে।'

ঘনায়মান সন্ধ্যার আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে টেরেল বললেন, 'আজ আর বেশি দূর এগোনো যাবে না। ঘণ্টাখানেক পরেই অন্ধকারে কিছুই দেখা যাবে না ঝোপের মধ্যে। যাই হোক, যা পার, কোর। আমি হেডকোয়ার্টারে ফিরে চললুম।'

চার ঘণ্টা পর অফিস থেকে বৌকে ফোন করলেন টেরেল।

'আমার দেরি হবে গো। আরও ঘণ্টা দুয়েক তো বটেই।' মোটামুটি ঘটনাটা বলে দিলেন। 'বড় জটিল ব্যাপার।'

'ঠিক আছে, ফ্র্যাঙ্ক।' ক্যারোলাইন-এর জবাব শোনা গেল, 'ওভেন-এ রেখে দেব কিছু, এলে খেয়ো। মেয়েটি কে, জানতে পেরেছ?'

'ওইখানেই তো মুশকিল। কোনও কিনারা করতে পারছি না।' ইতিমধ্যে বেগ্লার ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে একবার ভুরু নাচালেন তার দিকে চেয়ে। বেগ্লার মাথা নাড়লে। 'যাই হোক, কিছু তো করা দরকার। আচ্ছা, ফিরে দেখা হবে।' টেলিফোন রাখলেন টেরেল। বেগ্লার-এর দিকে চেয়ে বললেন, 'একেবারে কিচ্ছু না?'

'এখনও পর্যন্ত কিচ্ছু না। মায়ামি বা জ্যাক্সন্ভিল-এ কোনও মেয়ে হারানোর খবর নেই। ওরা এখনও গাঁ-গঞ্জে খোঁজ-খবর নিচ্ছে অবশ্য। ডাক্তারের রিপোর্ট এসেছে?'

'হ্যাঁ, ঐ যে।' টেবিলের ওপর একগোছা টাইপ করা কাগজের দিকে ইশারা করলেন টেরেল। 'কাজে লাগবার মতো তেমন কিছুই নেই। গলা টিপেই মেরেছে। কণ্ঠনালীর তরুণাস্থি আর জিভের গোড়ার দিকের পাৎলা হাড় সব ফেটে গেছে। নাকের হাড় ভেঙেছে। যে মেরেছে, তার ঘুষির খুব জোর। সারা দেহে কোথাও অপারেশনের দাগ পাওয়া যায়নি······জন্মগত কোনও জড়ুল-টড়ুল বা চিহ্ন-টিহ্নও নয়। ভালো পরিবারের মেয়ে। নোখ আর চুল দেখেই বোঝা যায়।'

'দাঁত ?'

'সেদিকেও কোনও আশা নেই। দুপাটিই নিখুঁত। কারি-কুরি বাঁধাই-টাঁধাই কিচ্ছু নেই। ফ্রেড-এর কাছ থেকে কোনও খবর এল ?'

'এখনও ফেরেনি। ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিয়ে বড়-বড় আলো আনিয়ে নিয়েছে।' হাসল বেগ্‌লার। 'ফ্রেডকে তো জানেনেই। খুনের গন্ধ পেলে একেবারে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে, শুধু হাতে ওঠবার পাত্তরই নয়।'

'ঠিক'। ডাক্তারের রিপোর্টটা টেনে নিয়ে আবার একবার পড়তে লাগলেন টেরেল।

একটা সিগারেট ধরাল বেগ্‌লার। হেলান দেওয়া ছেড়ে, দেওয়াল থেকে সরে দাঁড়াল। 'আমি বরং টেবিলে গিয়ে বসি গে।'

একটু আয়েস করে নড়ে বসলেন টেরেল। ভাবতে লাগলেন। কোনও সূত্র বা ধারণা মাথায় এলেই, একটা

কাগজে লিখে রাখতে লাগলেন। খানিক বাদে প্যাডটা সরিয়ে রেখে উঠে পড়লেন। ডিটেক্‌টিভদের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

বেগ্‌লার একটা রিপোর্ট পড়ছে, লেপ্‌স্কি ধাঁই-ধাঁই টাইপ করছে। জ্যাকবি টেলিফোনে কথা বলছে। ঘড়িতে নটা বেজে পাঁচ। তিনজনেই টেরেলের দিকে তাকাল কাজ থামিয়ে।

'আমি বাড়ি যাচ্ছি।' বেগ্‌লারকে বললেন টেরেল। 'ঘণ্টা দুয়েক বাদে ফিরে আসব, তখন তোমরা যেয়ো। আজ রাত্তিরে করবার বিশেষ কিছু নেই। টেলিভিশন থেকে বা কালকের খবরের কাগজ থেকে খবর পেয়ে কেউ হয়তো কোনও সন্ধান দিতে পারে। কেউ-না-কেউ দেখেছে হয়তো মেয়েটাকে, তবে দেড় মাস তো চাট্টিখানি কথা নয়।' দরজার দিকে ফিরলেন টেরেল, আর তখনই দরজা খুলে ঢুকল ফ্রেড হেস। অত বড় মুখটা ঘামে চকচক করছে, চোখে উত্তেজনার আভাস।

বললে, 'যেখানে খুন করেছিল, সেই জায়গাটা বার করেছি, চীফ। তা ছাড়া আরও একটা জিনিস পেয়েছি।' ফিকে নীল রঙের প্ল্যাস্টিক ফ্রেমের একটা চশমা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। ডান দিকের কাঁচটা নেই, বাঁ দিকেরটা ভাঙা। 'যেখানে প্রথম মরে পড়েছিল, তারই হাত দুয়েক তফাতে একটা ঝোপের গোড়ায় পেয়েছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে চশমাটার দিকে উঁকি মারলে বেগ্‌লার। লেপ্‌স্কিও দেখবার চেষ্টা করলে।

টেবিলের কিনারায় বসে পড়লেন টেরেল। চশমাটা তুলে নিয়ে বললেন, 'খুলে বল, ফ্রেড।'

'আমরা তো ঐ ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর ঢুকলুম। আলোর ব্যবস্থা করেছিলুম, কাজেই বিশেষ অসুবিধে হয়নি। খানিক বাদে একটা পায়ে-চলা রাস্তা পেলুম—মেটো রাস্তাটার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। ঐ পায়ে-চলা রাস্তাটার শেষ-বরাবর দেখলুম ঘাসগুলো রগড়ানো, বালি এলোমেলো—ধস্তাধস্তি হলে যা হয়। বালির ওপর আর ঘাস-পাতার গায়ে রক্তের ছিটে। এরই কাছাকাছি একটা ঘন ঝোপের পেছনে পুরুষের জুতোর ছাপ পেয়েছি। জমলেই প্ল্যাস্টারের ছাপটা নিয়ে আসবে জ্যাক। মনে হচ্ছে, খুনি ঐ ঝোপের আড়ালেই লুকিয়ে ছিল, মেয়েটি কাছাকাছি আসতেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রথম চোটেই বোধ হয় চশমাটা ছিটকে পড়ে যায়।'

চোখ কুঁচকে চশমার আধ-ভাঙা কাঁচটার মধ্যে দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন টেরেল।

'ব্বাবা, ভীষণ বড় দেখাচ্ছে। লেপ্‌স্কি, ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে এখ্‌খুনি ওদের দাও তো। কপাল-গুণে যদি বিশেষ ধরনের কোনও লেন্স হয়, তা হলে মন্দ হয় না। আর, ফ্রেম থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা, দেখ।' হেস-এর দিকে তাকালেন টেরেল। 'অন্য কাঁচটার টুকরো-টাকরা পেয়েছ কিছু?'

'এই যে।' পকেট থেকে একটা খাম বার করে লেপ্‌স্কির হাতে দিতেই, সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'আমি আমার ঘরেই আছি।' মনে-মনে ভাবতে লাগলেন টেরেল, ওভেনে খাবার ঢাকা আছে। 'ফ্রেড, তাড়াতাড়ি রিপোর্টটা টাইপ করে ফেলে আমায় দাও।' ক্যারোলাইনকে টেলিফোন করতে হবে। অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন টেরেল।

৮

ঘুম ভেঙে ঘড়ির দিকে পিটপিট করে তাকাল টিকি এড্রিস। সাড়ে-আটটা, জানলার পর্দার পিছনে খর রৌদ্রের আভাস।

খোলা দরজা দিয়ে অ্যাল্‌জারের নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসছে। ভোর তিনটে নাগাদ লা-কোকুইল থেকে যখন ফিরেছে এড্রিস, অ্যাল্‌জার তখনও চাবি নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

আবার চোখ বন্ধ করলে এড্রিস। তন্দ্রা আসছে, কিন্তু হাজার রকমের চিন্তা মাথায় নিয়ে নতুন করে ঘুম আসে না। চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে খাট থেকে নেমে পড়ল।

নিঃশব্দে বসবার ঘরে এসে ঢুকল। সোফার ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে অ্যাল্‌জার। এড্রিস কলঘরে গিয়ে ঢুকল।

দশ মিনিট বাদে, চান করে, দাড়ি কামিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুললে এড্রিস—দুধের বোতল আর খবরের কাগজ নিলে।

বসবার ঘর পার হবার সময়ে ঘুম ভেঙে উঠে বসল অ্যাল্‌জার। আড়ামোড়া ভাঙতে-ভাঙতে বললে, 'কফি হচ্ছে না কি?'

'হুঁ।' রান্নাঘরে গিয়ে কফি বানাবার পার্কোলেটারটা চালু করে দিলে এড্রিস। তারপর দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজের ভাঁজ খুললে।

প্রথম পাতাটার হেডলাইনটা চোখে পড়তেই দম আটকে এল তার। একদৃষ্টে লেখাগুলোর দিকে চেয়ে রইল, হাতদুটো

কাঁপতে শুরু করতেই খবরের কাগজটা খড়খড় করে উঠল।

অজ্ঞাত রমণীর মৃতদেহ

কোরাল কোভ-এর সমুদ্রতীরে

শ্বাস রোধ করে হত্যা

খবরটা পড়তে লাগল এড্রিস। ফ্রেড-এর ছেলের ছবিটাও দেখলে। কফি ফুটে উঠেছে। সুইচটা বন্ধ করে দিলে। বসবার ঘরে গিয়ে যখন ঢুকল, তখন অ্যাল্‌জারকে খুন করতে ইচ্ছে করছে।

অ্যাল্‌জার তখন বসে-বসে কফির জন্যে অপেক্ষা করছে। হাল্কা একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে হাই তুলতে-তুলতে মাথা চুলকচ্ছে। এড্রিস-এর মুখ-চোখের অবস্থা দেখে থতমত খেয়ে গেল।

'কী ব্যাপার ?'

কোনও কথা না-বলে খবরের কাগজটা এগিয়ে দিল এড্রিস।

হেডলাইন পড়েই মুখটা সাদা হয়ে গেল, টলতে-টলতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাল্‌জার।

'সব্বনাশ! খোঁজ পেয়ে গেছে!' ভিতরের বিশদ খবরটা পড়বার চেষ্টা করলে; হাত কাঁপছে, চোখে অন্ধকার, পড়তে পারলে না। গালাগাল বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। ছুঁড়ে ফেলে দিলে কাগজটা। এড্রিস-এর দিকে তাকিয়ে বললে, 'কী লিখেছে ?"

আলমারি খুলে দু গেলাস নির্জলা হুইস্কি নিলে এড্রিস।

'কী লিখছে বল না ছাই!' চীৎকার করে উঠল অ্যাল্‌জার।

'চুলোয় যাক !' দাঁতে দাঁত ঘষছে এড্রিস। 'নাও, ধর !'

একচুমুকে গেলাসটা খালি করলে অ্যাল্জার। উঠে গিয়ে আর-এক পাত্তর ঢেলে নিলে। বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'আমি কাটছি ! চুলোয় যাও তুমি ! ঘাড়ে ভূত চেপেছিল, তাই মরতে কান দিয়েছিলুম তোমার কথায় ! আমি···'

'চুপ কর !' এড্রিস-এর গলাটা ভীষণ শোনাচ্ছে এখন। 'সব দোষ তোমার ! অন্য কোথাও পুঁততে বলেছিলুম না ? বলেছিলুম না, এমন জায়গায় পুঁতবে, যেখানে লোকজনের যাতায়াত নেই ? মুখ্খু জানোয়ার কোথাকার ! পুঁতেছি ! এমন পুঁতেছি যে, একটা বাচ্চা ছেলে খেলা করতে-করতে বার করে ফেলে ! ওকে পোঁতা বলে !'

গেলাসটা খালি করে আবার একপাত্তর ঢেলে নিলে অ্যাল্জার। আস্তে-আস্তে গা গরম হতে লাগল, সম্বিত ফিরে পেলে। বসে কাগজটা তুলে নিলে। 'ঠিকই পুঁতেছিলুম। কপাল খারাপ, তা করব কী ?'

'বটে ? তোমায় খুন করতে পারি, জান ?' রাগে ছটফট করে বেড়াচ্ছে এড্রিস। 'এমন চমৎকার একটা মতলব, আর তার বারোটা বাজিয়ে বসে আছ ! চুলোয় যাও, হতভাগা ! ওঃ, নিজে করলেই হতো !'

চুপ করে বসে খবরটা পড়ে দেখতে লাগল অ্যাল্জার। বললে, 'তা সনাক্ত তো করতে পারেনি দেখছি, কোনও সূত্রও পায়নি বলছে। ইরা যদি ঠিকমতো চালিয়ে যায়, ওরা জানবেই বা কী করে যে, ছুঁড়িটা নোরিনা ?'

কোনও রকমে মাথা ঠাণ্ডা রাখলে এড্রিস। অ্যাল্জার-এর

হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে আবার একবার খুঁটিয়ে পড়তে লাগল।

পড়ে দেখে বললে, 'হুঁ। এখনও কাজ চালানো যাবে। হয়তো কোনও দিনই মেয়েটার পরিচয় পাবে না।'

'তা হোক! আমি কিন্তু আর থাকছি না! আর একদম ভরসা নেই। পুলিশ কী চীজ, খুব জানি। কাগজওয়ালাদের কাছে রেখে-ঢেকে বলে। হয়তো মেয়েটার পাত্তা হয়েই গেছে ইতিমধ্যে।'

'কোনও দিনই পাত্তা করতে পারবে না, সেই সম্ভাবনাটাই বেশি, অ্যাল্জার। কোনও সূত্র পায়নি। খবরে বলছে, মুখের আধখানাই প্রায় পিঁপড়েয় খেয়েছে, বাকি যেটুকু আছে, তাতে চেনা অসম্ভব। বলছে, সনাক্ত করার মতো কোনও চিহ্নও নেই। তা হলে সনাক্তটা করবে কী করে?'

ভাবতে লাগল অ্যাল্জার। তবু স্বস্তি পেল না। 'কিন্তু ধর, কোনও সূত্র পেয়েছে হয়তো, বলছে, না?'

'কী পেতে পারে। পেলে কাগজে ছাপাত। ওরা তো সনাক্ত করতেই চায়, না কী?'

গাল ফুলিয়ে হাওয়া ছাড়লে অ্যাল্জার। একটু নেশা হয়েছে। ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। 'সে যাই হোক, আমি কেটে পড়ছি, টিকি। কুড়ি হাজার ডলার পেয়েছি, তাতেই চালিয়ে নেব কিছু দিন। আজ বিকেলেই কিউবার প্লেন ধরব।'

অ্যাল্জারকে যেতে দেওয়া চলে না। আর যাই হোক, অ্যাল্জারকে রাখা দরকার। ও না-থাকলে গার্ল্যাণ্ড-এর

টাকাটার কোনও কিনারাই করতে পারবে না এড্রিস। অনেব কষ্টে মেজাজটাকে ঠাণ্ডা রাখল। টেবিলের ওপর গার্ল্যাণ্ড-এর সিন্দুকের চাবিটা পড়ে ছিল, সেটা দু আঙুলে তুলে ধরে দোলাতে লাগল অ্যাল্‌জার-এর মুখের সামনে।

সরু গলায় সুর করে বলে উঠল, 'চাবিটার দাম লাখখানেক ডলার হবে, অ্যাল্‌জার! ছেড়ে দেবে বলছ?'

থতিয়ে গেল অ্যাল্‌জার। 'কালকের আগে তো আর টাকাটা তোলা যাচ্ছে না, তার মধ্যে যদি ওরা মেয়েটার পরিচয় জেনে ফেলতে পারে? জানতে পারলেই স্কুলে চলে যাবে, সেখান থেকে আমার চেহারার বর্ণনা পাবে। তখন আমাকে গাঁথতে আর কতক্ষণ? না, চুলোয় যাক টাকা! ভালোয়-ভালোয় চলেই যাই।'

'পঞ্চাশ হাজার ডলার চুলোয় যাবে? মাথা খারাপ?' লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে উঠল এড্রিস। 'কুড়ি হাজার ডলারে কদ্দিন চলবে তোমার? শোন, ফিল, আমার কথা শোন। আমি যা করছি, তাই কর। দুজনেই যাব, তবে আজ নয়, কাল বিকেলে। কিউবা-ই যাব, তবে সঙ্গে থাকবে গার্ল্যাণ্ড-এর টাকা।'

চোখ পাকিয়ে এড্রিস-এর দিকে তাকাল অ্যাল্‌জার। 'তোমার সঙ্গে সগ্‌গেও যাচ্ছি না! বেঁটে কোথাকার! পুলিশ তো দেখলেই চিনে নেবে! তোমার সঙ্গে থাকা মানে তো পিঠে সাইনবোর্ড লটকে বেড়ানো!'

রাগে এড্রিস-এর দম বন্ধ হয়ে এল। পিন-পিন করে ঘাম ফুটে উঠল সারা মুখে। কোনও রকমে সামলে নিলে। ধরা

গলায় বললে, 'ঠিক আছে। আলাদাই যাব। তবে গার্ল্যাণ্ড-এর টাকাটা তুলে নেব আগে।'

'আমি ওতে নেই! আমি আজ বিকেলেই সরে পড়ছি।'

একদৃষ্টে অ্যাল্‌জার-এর দিকে তাকিয়ে রইল এড্রিস। ঘৃণায় লাল হয়ে উঠেছে চোখদুটো। মনে-মনে ভাবছে, এই অকর্মার ধাড়িটাকে যা হোক করে পটাতেই হবে।

'ঠিক আছে, তোমার যদি তাই মনে হয়, তাই কর। টাকাটা আমি একাই নেব।'

পায়চারি থামিয়ে এড্রিস-এর দিকে ফিরে দাঁড়াল অ্যাল্‌জার। 'তার মানে?'

'আমরা দুজনে বখরাদার, ঠিকই। কিন্তু তুমি যদি আমায় ছেড়ে চলেই যাও, তা হলে গার্ল্যাণ্ড-এর টাকাটা একা আমার ভাগেই আসে।'

'বোকা! পাচ্ছ কী করে? আমি না-থাকলে তুলছ কী করে?'

'তাই বুঝি? ভুল করছ। ইরাকে দিয়ে আনাব। খামের মধ্যে ভরা আছে টাকাটা। কিছুই নয়, খামটা প্যান্টের ভেতর গুঁজে নেবে, নিয়ে সোজা বেরিয়ে চলে আসবে। বললেই করবে, না-করলে নিস্তার নেই!'

'শোন রে হাঁদা, শোন। কাল সকালেই পুলিশ এসে ধরবে তোকে। বুঝতে পারছিস না? যে মুহূর্তে টের পাবে যে, ইরা নোরিনা নয়, সঙ্গে-সঙ্গে .... ইরা ফাঁস করে দেবেই, আর সঙ্গে-সঙ্গে তোর দফা গয়া।'

খুব শান্তগলায় এড্রিস উত্তর করলে, 'আমি বলছি, অত

তাড়াতাড়ি হবে না। তা ছাড়া, অত টাকার জন্যে, ঝুঁকি নিতে আমি পেছপা নই। টেরেল যে কাজের লোক, তা জানি। যা ধরে তা ছাড়ে না, ঠিকই, কিন্তু খুব ধীরে সুস্থে কাজ করে। তাড়াহুড়ো তার ধাতে নেই। আরও এক সপ্তাহও যদি এই ফ্ল্যাটে থাকি, ভয়ের কিছু নেই।'

আরও একপাত্তর হুইস্কি ঢাললে অ্যাল্‌জার। মুখে চিন্তার ছাপ। লক্ষ্য করে এড্রিস বুঝলে, টোপ গিলব-গিলব করছে।

এড্রিস-এর সামনে এসে দাঁড়িয়ে অ্যাল্‌জার বললে, 'সত্যিই তাই মনে কর?'

'এক শো বার। খুব নিশ্চয় না-হলে এমন করে গলা বাড়াই?'

হুইস্কিটা সোজা গলায় ঢেলে দিলে অ্যাল্‌জার। মনে-মনে ভাবলে, লাখ ডলারের সবটাই এড্রিসকে নিতে দেওয়া মানে বোকামি। অর্ধেকটা তো ওরই ন্যায্য পাওনা। আস্তে আস্তে বললে, 'কাল অবধি দেখেই যাই বরং। কাল বিকেলের প্লেনেও যেতে পারি তা হলে।'

'যদি ভয় করে, আজই চলে যাওয়া ভালো। তা ছাড়া, তাতে তোমার বখরাটাও পাব। তুমি বরং আজই কেটে পড় ফিলি-চন্দর!'

'চুপ কর, পাপ কোথাকার! আদ্দেকটা আমার, আমি নেব!'

'বেশ, যদি আক্কেল হয়ে থাকে, তাই কর।' রান্নাঘরে গিয়ে পার্কোলেটারের সুইচটা আবার টিপে দিল এড্রিস।

একটা কথা ঠিকই ধরেছে অ্যাল্‌জার—টাকাটা হাতে

পেলেই প্যারাডাইস সিটি থেকে ভাগতে হবে। রাস্তায় বেরুলেই ধরা পড়ে যাবে, পুলিশের খপ্পরে চলে যাবে। তবে, এখনও একটা আশা, লাশটাকে হয়তো সনাক্ত করতে পারবে না। একটু গা ঢাকা দিয়ে দেখতে হবে কিছুদিন। বেশ কয়েক মাস যদি চুপচাপ থাকে, আবার ফিরে আসবে। ইরা তো তখনও ব্যাঙ্কেই কাজ করবে। অ্যাল্‌জার-এর জায়গায় অন্য লোক ঠিক করা যাবে এখন। নাঃ, মতলবটা এখনও পুরোপুরি কেঁচে যায়নি।

কিন্তু আপাততঃ যাবে কোথায়? নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কি না, দেখবার জন্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে তো কিছু দিন? মেক্সিকো? মন্দ নয়। দু কাপ কফি ঢাললে এড্রিস। টাকা যা আছে, কুলিয়ে যাবে। ভালো ভাবেই চলে যাবে মেক্সিকোয়। অ্যাল্‌জার যদি ভেবে থাকে যে, বখরা পাবে, তা হলে……ভুল ভাঙলে কী অবাকই না হবে!

এত বাহাদুরি আর এলেম দেখাবার পুরস্কার একটা পাবেই— মাথার পিছনে একটা সিসের গুলি।

রবিবারের দিনটা বড় গরম গেল। কারও পক্ষে বড় মন্থর, বড় দীর্ঘ; কারও কাছে খুব দ্রুত, খুব ছোট।

অনন্ত বলে মনে হলো ইরার কাছে। জয়-এর সঙ্গে দেখা করতে গেছে মেল, বীচ্ ক্যাবিনে কাটাবে ওরা সারাটা দিন। ইরাকে সঙ্গে নেবার কথা উঠেছিল, ইরা যায়নি।

মেল বেরুবার পর নিজের ঘরে জানলার সামনে গিয়ে

বসল। এখনও বারোটা দিন পড়ে রয়েছে, তার আগে যাবার উপায় নেই। কোথায় যাবে, ঠিক করা হয়ে ওঠেনি। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে না। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারে সে, কিন্তু মেলকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে, এই বাড়ি, নিজের এই ঘর ছেড়ে যেতে ব্যথা পাবে।

মেল আর জয় মধুবন্দ্রিমায় গেলে কী করবে, অনেক চিন্তার পর সেটা ঠিক করে ফেললে ইরা। বীচ ক্যাবিনে যাবে গাড়ি নিয়ে, প্যারাডাইস সিটিতে যে পোশাক পরে প্রথম এসেছিল, সেই পোশাকটা পরে নেবে, চুলে কালো কলপ লাগাবে, গাড়িটা আর নেবে না, বড় রাস্তায় গিয়ে বাস ধরে সোজা চলে যাবে মায়ামি। সেখান থেকে অন্য বাসে টেক্সাস। হাতে যা টাকাকড়ি আছে, তাতেই কুলিয়ে যাবে, আর টেক্সাসে পৌঁছে একটা কাজ জোটাতে অসুবিধা হবে না।

অ্যাল্‌জার-এর সময় আর কাটে না। বসে বসে রেডিওর প্রতিটি খবর শুনছে আর এড্রিস-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার জন্যে নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছে সারাটা দিন।

বেলা দশটা নাগাদ এয়ারপোর্টে ফোন করে কাল বিকেলের জন্যে হাভানা যাবার একটা টিকিট বুক করে রেখেছে। ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছে। আবার রেডিও নিয়ে বসেছে। খবরের কাগজ থেকে নোরিনার মৃতদেহ পাবার ঘটনাটা বার-বার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েছে, আর ঘেমেছে বসে-বসে।

এড্রিস সে তুলনায় শক্ত আছে। অ্যাল্‌জার যখন এয়ার-পোর্টে টেলিফোন করছিল, তখন ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেছে। লা-কোকুইল-এ গিয়ে দেখল হেড-বাবুর্চি লুই তখন রাতের মেনু তৈরি করছে। বলেছে, তাকে নিউ ইয়র্ক যেতে হবে, এক পুরনো বন্ধু মৃত্যুশয্যায়, এড্রিসকে দেখতে চায়। লুই বলেছে, নেহাৎ না-গেলে নয় যখন, তখন যেতে পারে, তবে ক দিনের মাইনে পাবে না।

শুনে লুইয়ের মুখে থুতু ছিটোতে ইচ্ছে করেছে তার, কিন্তু সামলে নিয়ে ভদ্রভাবে বলেছে, 'ঠিক আছে, তা তো বটেই। যত তাড়াতাড়ি হয়, আসবার চেষ্টা করব, তবে দিন দশেক লাগবে বোধ হয়।'

লুয়ের ঘরের বাইরে এসে কুশ্রী অঙ্গভঙ্গী করেছে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, তারপর নেমে চলে গেছে নিচে গাড়ি রাখবার জায়গায়। এয়ারপোর্টে গিয়ে কালকের মেক্সিকোগামী প্লেনের একটা টিকিট করে রেখেছে।

হেস ফার-এর সময় আর কাটে না। সমুদ্রের ধারে পোড়ো নির্জন একটা জায়গা বেছে নিয়ে সারা দিনটা একলা কাটিয়ে দিচ্ছে। লোকজনের চোখে না-পড়াই ভালো। কাল সকালে যে কাজে হাত দেবে, সেটা সারা হবার পর, কেউ যেন ওকে দেখলেও চিনতে না-পারে ; আগে কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে না-পারে। তা ছাড়া, ওর সাজগোজের যা ছিরি, দেখলেই না কি পুলিশের টনক নড়বে—ইরার এই

মন্তব্যটা সে ভোলেনি। কাজেই, লোকের চোখে যত কম পড়া যায় ততই ভালো।

সেইজন্যে সাগরসৈকতের এই ফাঁকা জায়গাটাতেই দিন-ভোর থাকবে বলে ঠিক করছে, রাত্তিরে গাড়িতেই শোবে। খাবার সঙ্গেই আছে। সাঁতার কেটেছে, সিগারেট খেয়েছে, এন্তার মদ গিলেছে। একা থাকতে বিচ্ছিরি লাগে। দিনটা যেন আর শেষ হবে না।

পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের কর্মীদের কাছে রবিবারটা যেন বড় চট করে ফুরিয়ে গেল। ভাঙা চশমাটার খোঁজ-খবর করবার জন্যে কাউকে আর লাগাতে বাকি নেই। ল্যাবরেটরি থেকে কিছু কাজের খবর পাওয়া গেছে; ভাঙা চশমার মতো ক্ষীণ সূত্র থেকে এটুকু পাওয়াও কম কথা নয়।

সকাল পৌনে আটটার সময়েও টেরেল অফিসে বসে। সঙ্গে বেগ্‌লার আর ফ্রেড। টেরেল ল্যাবরেটরির রিপোর্ট পড়ছিলেন—এই নিয়ে তিনবার হলো। একটা কিছু সূত্র পেতেই হবে যে করে হোক। লেন্স দুটোর পাওয়ার আর বিশেষত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে ল্যাবরেটরি থেকে। লিখেছে যে, এ চশমা যে পরে বা পরতো, তার চোখ ভীষণ খারাপ। চশমা ছাড়া খালি চোখে এত ঝাপসা দেখবে যে, না-দেখারই সামিল। সদা-সর্বদা চশমা পরে থাকতে হয়। বাঁ চোখের চেয়ে ডান চোখটা বেশি খারাপ।

সূত্রটাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। টেরেল-এর একটু

আশা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোককে পাঠিয়েছেন পাইকারি চশমার দোকানে খোঁজ নিতে—এক শো মাইলের মধ্যে চারিদিকে যত দোকান আছে, সব জায়গায় খোঁজ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বলেছেন, 'রবিবার, তো হয়েছে কী? দোকানের মালিকের ঠিকানা যোগাড় করে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করবে। দরকার হলে দোকান বা কারখানা খোলাবে। এই লেন্স কাকে বিক্রি করা হয়েছে জানতে চাই, আজই!'

টেলিফোন-বইয়ের শ্রেণীগত নম্বরের তালিকা থেকে সমস্ত হাসপাতাল আর চোখের ডাক্তারদের কাছে টেলিফোনে খোঁজ নেবার ভার দিয়েছেন জ্যকবি-র ওপর।

কোন কারখানায় চশমার ফ্রেমটা তৈরি হয়েছে, তারই সন্ধান নিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন আরও তিনজন কর্মীকে। এ-ক্ষেত্রেও অসুবিধা আছে—রবিবার কারখানা বন্ধ থাকার কথা। কিন্তু ওসব ওজর টেরেল-এর কাছে খাটেনি।

কোরাল কোভ-এর ঝোপ-ঝাড়ের পিছনে যে পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, তার ছাঁচ সম্বন্ধে রিপোর্ট এসেছে, এবার তাই নিয়ে পড়েছেন টেরেল। ছোট্ট রিপোর্ট, কিন্তু কাজের। যার জুতোর ছাপ, সে লম্বায় ছ ফুট, ওজন ১৯০ পাউণ্ড। দশ নম্বর মাপের যে জুতোটা পরেছিল, সেটা আনকোরা নতুন। "দি ম্যান্‌স শপ" বলে প্যারাডাইস সিটির একটা শৌখিন দোকান থেকে কেনা। দোকানের যে কর্মচারীটি জুতোজোড়া বিক্রি করেছিল, তার সন্ধান করবার জন্যে ইতিমধ্যেই একজন পুলিশ অফিসারকে পাঠিয়ে দিয়েছেন টেরেল।

রিপোর্টটা নামিয়ে রেখে বলেছেন, 'এর পর কী করবে ফ্রেড ?'

'ভাবছি কোরাল কোভ-এ গিয়ে দেখি, ওরা কদ্দুর কী করতে পারল। এতক্ষণে বেশ আলোও তো হয়েছে। আপনার আপত্তি নেই তো ?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছেন টেরেল। ফ্রেড বেরিয়ে যেতে আর এককাপ কফি ঢেলে নিয়ে বেগ্‌লার-এর দিকে চেয়ে বলেছেন, 'কাল রাত্তিরে রেডিওর খবরের পর কিছু খোঁজ পাব ভেবেছিলুম।'

'শনিবার সন্ধেটা রেডিওর পক্ষে বড় বাজে। অধিকাংশ লোকই বাড়ি থাকে না। আর মিনিট পাঁচেক বাদেই আবার বলবে। আমি টেবিলে গিয়ে বসি বরং।' দরজার দিকে এগিয়ে গেছে বেগ্‌লার।

তার পর টানা থেকে তোয়ালে আর দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম বার করে কলঘরে ঢুকেছেন টেরেল।

বেগ্‌লার অফিসঘরে ঢুকে দেখেছে, লেপ্‌স্কি সিগারেট ফুঁকছে আর ঝিমোচ্ছে। জ্যাকবি টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত।

বেগ্‌লার চেয়ারে বসতেই টেলিফোন রেখে ঘুরে বসেছে লেপ্‌স্কি। 'ডক্টর হান্‌স্টেইন-এর দুজন রুগি আছে, যাদের চশমার লেন্স আমাদের সঙ্গে মিলছে। একজনের বয়েস তেইশ, আর একজনের পঁচিশ। দুজনেরই চুল সোনালি। দুজনেই এখানকার মেয়ে।'

'খোঁজ নাও, ওদের কেউ নিখোঁজ হয়েছে কি না, আর ফিকে নীল প্ল্যাস্টিকের ফ্রেম পরত কি না।'

মিনিট দশেক টেলিফোন নিয়ে ধস্তাধস্তির পর জ্যাকবি খবর পেয়েছে যে ঐ দুটি মেয়ের কেউই নিখোঁজ হয়নি এবং কারুরই চশমার ফ্রেম নীল প্ল্যাস্টিকের নয়।

'অন্য সব ডাক্তারদের কাছে খোঁজ করতে থাক।' ডক্টর হান্‌স্টেইন-এর নামটা লিস্টি থেকে কেটে দিয়েছে বেগ্‌লার।

লাঞ্চের সময়ে স্যাণ্ডউইচ দিয়েই খাওয়া সেরেছেন টেরেল, তার পর, ফ্রেড হেস কদ্দুর কী করতে পারল, কোরাল কোভ-এ গিয়ে একবার দেখে আসতে চেয়েছেন। গাড়িতে উঠতে-উঠতে মনে হয়েছে, সকালটা যেন হুস করে ফুরিয়ে গেল। মনে হয়েছে, সারা রাত অফিসে কাটিয়ে কিছুই লাভ হলো না। মেয়েটির পরিচয় তেমনিই অজ্ঞাত রয়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে আরামে ঘুমলেও কিছু ক্ষতি ছিল না।

ফ্রেড-এর সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়েছেন কোরাল কোভ-এ। ঝোপ-ঝাড় এবং আশপাশের প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কোনও সূত্রই মেলেনি।

তার পর, দুজনে হেড্‌কোয়ার্টারে ফিরে এসেছে। ততক্ষণে প্রথম দফার একটা নামের লিস্ট তৈরি করে রেখেছে বেগ্‌লার।

বলেছে, 'বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, আমাদের ঐ ভাঙা চশমার মতো লেন্স ব্যবহার করে এমন বত্রিশ জন মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের বয়েস পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে। তিনজন এই সহরেরই মেয়ে। দশজন মায়ামিতে থাকে। জ্যাক্‌শন্‌ভিল্‌-এ বারোজন। ট্যাম্পা-তে তিনজন। বাকি সব ফ্লরিডার আশপাশের ছোট ছোট দ্বীপে।

কেউই নিখোঁজ বলে খবর নেই, তবে তার মানে যে নিখোঁজ নয়, কে বলতে পারে।'

'জ্যাকবিকে বল, দেখুক খোঁজ নিয়ে। দেখা যাক, চশমাটা ওদের কারুর কি না।'

জ্যাকবিকে লিস্টিটা দিয়েছে বেগ্‌লার। গত্যন্তর নেই বলেই নেহাৎ নিরুৎসাহের সঙ্গেই টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেছে জ্যাকবি।

বেগলার আরও জানিয়েছে, 'একজন ভদ্রলোক আসবেন, হয়তো কিছু দরকারি খবর পাওয়া যাবে, চীফ। বলছেন, গত মাসের ১৭ তারিখে সকাল আটটা নাগাদ না কি একটি মেয়ে আর একটা লোককে কোরাল কোভ-এর দিকে যেতে দেখেছেন ··· ··· তার মানে দেড় মাস আগে।'

টেরেল-এর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'খুব ভালো কথা। এলেই সোজা আমার ঘরে নিয়ে এস।' লেপ্‌স্কিকে সিগারেট ধরাতে দেখে ধমকে বলে উঠেছেন, 'জ্যাকবির সঙ্গে একটু হাত লাগাও না! লিস্টি দেখে নিজেও দু-একটা টেলিফোন করলে তো পার!'

ঘর থেকে চলে গেছেন টেরেল। তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকেছে লেপ্‌স্কি। 'বুড়ো খচেছে।'

'বুড়ো কেন, আমিও খচেছি!' তড়পে উঠেছে বেগ্‌লার। 'কাজে হাত লাগাও!'

জ্যাকবির কাছে গিয়ে আর-একটা টেলিফোন টেনে নিয়েছে লেপ্‌স্কি। নাম ঠিকানা-লেখা লিস্টিটার ওপর চোখ বোলাতে-বোলাতে হঠাৎ বলে উঠেছে, 'এই,

জো! দেখেছ, লিস্টে ডিভন-এর মেয়েটার নাম রয়েছে!'

লেপ্স্কির দিকে তাকালে বেগ্লার। চোখে পরিষ্কার বিরক্তি আর রাগ। 'হ্যাঁ, আমি পড়তে পারি। রয়েছে, তাতে হলোটা কী? সে তো আর নিখোঁজ হয়নি? তা হলে?'

শেষ-হয়ে-আসা সিগারেটটা দুমড়ে নিবিয়ে ফেলে নতুন একটা সিগারেট ধরাবার পর জবাব দিলে লেপ্স্কি, 'হয়েছে এই যে, মেয়েটা চশমা পরে না।'

'তাতে কী এল-গেল?' আবার তড়পে উঠেছে বেগ্লার। 'ভগবানের দোহাই, কাজ সুরু কর টম! তোমার মুশকিলটা কী জান, বকবক করতে পারলে আর কিচ্ছু চাও না! এদিকে কাজের নামে ঢুঁঢুঁ!'

খুব শান্তগলায় লেপ্স্কি আবার বলেছে, 'মেয়েটা চশমা পরে না, এই তো সুধু বলেছি বাবা। বার চার-পাঁচ গাড়ি চালিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছি তো মেয়েটাকে ··· কখনও চশমা পরতে দেখিনি। মেয়েটা চশমা পারে না, জো!'

বেগ্লার লেপ্স্কির দিকেই চেয়ে আছে, এখন চোখে একটু কৌতূহল। উঠে ল্যাবরেটরির রিপোর্টটা তুলে নিয়েছে। ফিরে আবার লেপ্স্কির দিকে তাকিয়েছে।

কাটা কাটা করে লেপ্স্কি বলেছে, 'বকর-বকর করি বটে, তবে পুলিশ হিসেবে খুব হাঁদা নই বোধ হয়। মাথায় ঢুকল এতক্ষণে?'

ভুরু কুঁচকে বেগ্লার বলেছে, 'রিপোর্টে বলছে, যার চশমা, তার সবসময়ে পরে থাকা ছাড়া উপায় নেই। বিশেষ ধরনের চোখ খারাপ না-হলে, এ ধরনের লেন্স লাগে না। এদিকে

তুমি বলছ, ডক্টর ওয়াইড্ম্যান-এর রুগিদের মধ্যে ডিভনের মেয়ের নাম রয়েছে, অথচ সে কখ্খনও চশমা পারে না?'

'মাথাটা আস্তে-আস্তে সাফ হচ্ছে, জো। সাবধান ভায়া, বেশি বুঝতে গিয়ে মগজের শির-টির ছিঁড়ে ফেল না যেন!'

লেপ্স্কির কাছে উঠে গেছে বেগ্লার। লিস্টিটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে।

'ঠিকই তো! নোরিনা ডিভন, গ্র্যাহাম কো-এড স্কুল, মায়ামি।' গাল চুলকোল বেগলার। 'ভুল নয় তো? ডক্টর ওয়াইড্ম্যান-এর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

নিজের টেবিলে ফিরে গিয়ে ডক্টর ওয়াইড্ম্যান-এর চেম্বারে ফোন করেছে বেগ্লার।

নার্স জানিয়েছে, ডক্টর ওয়াইড্ম্যান নেই, ন'টার আগে ফিরবেন না। রবিবারের এমন একটা সুন্দর বিকেলে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবার দরকার হলো বলে একটু ক্ষুব্ধও হয়েছে মনে হলো।

সশব্দে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছে বেগ্লার। 'এই, টম! একটু গতর নেড়ে ওঠ। মায়ামিতে গিয়ে ডক্টর ওয়াইড্-ম্যান-এর পাত্তা লাগাও। কখন তিনি ফিরবেন, সেই অপেক্ষায় তো আর বসে থাকা যায় না। কী জিগ্যেস করতে হবে, জানোই তো।'

টম লেপ্স্কি দুপায়ে খাড়া। এই ভ্যাপসা গুমোট ঘরে বসে থাকার চেয়ে জাহান্নামে যাওয়াও ভালো।

'ও. কে. সার্জেন্ট, খুঁজে বার করতে চললুম।' হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেছে লেপ্স্কি।

আবার টেলিফোন বেজে উঠেছে। ডেস্ক সার্জেন্ট চার্লির গলা শোনা গেছে, 'মিঃ হ্যারি টুলাস এসেছেন, জো। বলছেন, তুমি না কি দেখা করতে বলেছিলে।'

'এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও, চার্লি।'

হ্যারি টুলাস লোকটি লম্বা, শক্ত-সমর্থ। গায়ে সস্তার স্যুট, কিন্তু পরিপাটি। হ্যাণ্ডশেক করতে-করতে ব্যাগ্‌লার অনুমান করলে, কোনও দোকানি-পসারি জাতের লোক হবে। অনুমানটা মিলেও গেল।

বললে, 'আপনি কষ্ট করে এসেছেন, তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ, মিঃ টুলাস। চীফ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমার সঙ্গে আসবেন একটু?'

টুলাস বললেন, 'নিশ্চয়ই। কী জানি, হয়তো শুধু-শুধু সময় নষ্ট করছি আপনাদের।'

টেরেল-এর ঘরে নিয়ে গিয়ে টুলাস-এর পরিচয় দিলে বেগ্‌লার।

চেয়ার দেখিয়ে টেরেল বললেন, 'বসুন, মিঃ টুলাস। শুনলুম, আপনি না কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন।'

'আজ সকালে রেডিওর খবরটা শুনলুম। মেয়েটিকে আমার বেশ মনে আছে। তাই ভাবলুম, একবার টেলিফোন করে বলি আপনাদের··· ক্ষতি তো আর কিছু নেই?'

'সবাই আপনার মতো কর্তব্যপরায়ণ হলে সুখের কথা হতো। একটু কফি নিন না?'

'ধন্যবাদ। কফি খাই না।'

টেরেল-এর ইঙ্গিত পেয়ে দুকাপ কফি ঢাললে বেগ্‌লার

নিজেদের জন্যে। হাতের কাছে কফির পেয়ালা থাকলে কথা বলতে ব্যাজার লাগে না।

'এবার বলুন, মিঃ টুলাস··· '

'আমি মেলর প্রোডাক্টস-এ কাজ করি, ক্যাপ্টেন। মুদি-খানা আর খাবার-দাবারের ব্যাবসা। মায়ামি থেকে কী ওয়েস্ট পর্যন্ত যত ছোটখাট দোকান, সব জায়গায় ঢুঁ মারতে হয় আমাকে কাজের খাতিরে। গত মাসের ১৭ তারিখে খুব সকাল-সকাল বেরিয়েছিলুম। মায়ামি থেকে বেরিয়েছিলুম সকাল সাড়ে সাতটায়··· '

এক মিনিট, মিঃ টুলাস। আগে সবটা পাকা করে নিই। আপনার ঠিকানাটা ?

'৩৭৭ বিস্‌কেইন স্ট্রীট, মায়ামি।'

'ধন্যবাদ। এবার বলে যান।'

'হাইওয়ে 4A দিয়ে যাচ্ছিলুম। সীকম্ব-এ আসব, কয়েকটা জায়গায় যাবার ছিল। রাস্তায় বেশ গাড়ির ভীড়। আমার সামনেই ছিল একটা রোড্‌মাস্টার বিউইক; মাথায় হুড লাগানো, তখন খোলা ছিল। একজন পুরুষ মানুষ চালাচ্ছেন, পাশে একটি মেয়ে, সোনালি চুল। প্রায় পঞ্চাশ মাইল গতিতে গাড়ি চালাচ্ছি সবাই। সবাই পর পর দিব্যি সোজা যাচ্ছি, হঠাৎ খুব আচমকা সামনের গাড়িটা ডান দিকে বেঁকবার সিগ্‌ন্যাল দিল।— একেবারে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষতে হলো আমায়, কারণ ও যে অমন করে ডান দিকে বেঁকবে, ভাবতেই পারিনি।'

'কেন পারেননি ?'

সব গাড়িই সীকম্ব-এর দিকে যাচ্ছে সোজা। সামনের গাড়িটা যেখানে বাঁক নিল, সেটা মেটো রাস্তা, কোরাল কোভ-এ গিয়ে শেষ হয়েছে। ছুটি-ছাটার দিন ছাড়া কেউ কোরাল কোভ-এ যায় না। পথে আর অন্য কোনও জায়গাও পড়ে না, সোজ্জা সুমুদ্দুরের ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে। শনি রবিবার বেড়াতে যায় লোকে। আমিও রোববার দেখে মাঝে-মাঝে ছেলেপিলেদের নিয়ে গেছি।'

'তখন কটা হবে?'

'আটটার একটু পরে। দুজনেরই সাজ-পোশাক কিন্তু বেড়াতে যাবার বা চান করতে যাবার মতো নয়। দেখে অবাক লাগল। চান করতে যাচ্ছে, অথচ ফিটফাট সেজেছে। তার পর, রেডিওয় খবর শুনে, ভাবলুম আপনাদের জানাই।'

'ভালো করেছেন। ওরা ঐ মেটো রাস্তা ধরে চলে গেল, আপনি আর দেখতে পেলেন না, তাই তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু পরে সীকম্ব-এ আবার লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'মেয়েটির কথা বলুন তো। দেখতে কেমন?'

'বয়েস সতেরো-আঠারো হবে। সাদা সার্ট আর ছোট্ট কালো টুপি। ও, হ্যাঁ··· চোখে নীল ফ্রেমের চশমা ছিল।'

টেরেন্স আর বেগ্লার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। 'লোকটাকে আবার দেখেছিলেন, বলছেন?'

'হ্যাঁ। সীকম্ব-এ কাজ সেরে বাস-এর আড্ডার কাছে গাড়িতে তেল ভরছিলুম। লোকটাও দেখলুম আমারই কাছা-কাছি এক জায়গায় গাড়ি রাখল। গাড়িটাকে দেখেই চিনতে

পারলুম, লোকটাকেও চিনতে পারলুম। লোকটা গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে একটা মেয়ের দিকে এগিয়ে গেল—কাছেই একটা বেঞ্চির ওপর বসে ছিল মেয়েটা।'

'এক মিনিট, মিঃ টুলাস। আগের মেয়েটির কী হলো?'

'এবার তো তাকে আর দেখলুম না।'

আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে বেগ্লার আর টেরেল। 'তার মানে, আবার একটা নতুন মেয়ে জোটাল বলছেন?'

'ঠিক বলেছেন।' একটু হাসলেন টুলাস।

'যাই হোক, লোকটা মেয়েটার কাছে গিয়ে কী যেন বললে। মেয়েটাও কী বললে। যাই বলুক, লোকটা খুব চটে গেল। মুখ-চোখ লাল করে সোজা গটগট করে গাড়ির কাছে ফিরে এল। এরকম চট করে এত রাগতে কাউকে দেখিনি কখনও। আমার একটু কৌতূহল হচ্ছিল, বুঝতেই পারছেন—একটু আগেই দেখলুম অন্য একটা মেয়েকে নিয়ে মেটো রাস্তা ধরে সুমুদ্দুরের দিকে যাচ্ছে, আবার এই দেখছি অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে রাগারাগি করছে—বুঝতেই পারছেন। হ্যাঁ, যা বলছিলুম। লোকটা তো রেগে কাঁই হয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল; ভাবলুম মেয়েটা বোধ হয় বেশ কড়কে দিয়েছে লোকটাকে। ওমা, তারপর দেখি, তা নয়! মেয়েটাও দেখি গুটি-গুটি গাড়িতে এসে ঢুকল। তারপর গাড়ি চালিয়ে ওরা প্যারাডাইস সিটির দিকে চলে গেল। এই শেষ, তারপর আর দেখিনি।'

'গাড়ির নম্বর মনে আছে?'

'না তো। গাড়ির দিকে বিশেষ খেয়াল করিনি। তবে গাড়িটা বিউইক রোড্মাস্টার, হুডওলা।'

'রঙ?'

দুরঙা : লাল আর নীল।'

'নতুন?'

'বছরখানেক হবে।'

'আর, লোকটা? বর্ণনা দিতে পারেন?'

'খুব। অফিসার-অফিসার দেখতে। আমার আন্দাজ অবশ্য, ব্যাঙ্কের কর্তাব্যক্তিও হতে পারে। ছ ফুটের মতো হবে, কাঁধ বেশ চওড়া; ওজন হবে, ধরুন, ২০০ পাউণ্ডের মতন। সুদর্শন, মাথার চুল হলদেটে, গায়ের রঙ তামাটে। ছাঁটা গোঁফ আছে। মাথায় খয়েরি স্ট্র-হ্যাট, গায়ে হাল্কা খয়েরি স্যুট : বেশ ফিটফাট।'

হঠাৎ ঝুঁকে বসল বেগ্লার। একটা কথা মনে পড়ে গেছে।

'লোকটার বয়স কত হবে, মিঃ টুলাস?'

'তা···আটত্রিশ···চল্লিশ।'

'মুখে আর কোনও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন : বিশেষ ধরনের কিছু?'

ভুরু কোঁচকালেন টুলাস।

'বিশেষ ধরন বলতে কী বোঝাতে চাইছেন ধরতে পারছি না···তবে থুঁতনির মাঝখানের খাঁজটা খুব গভীর, সেটা চোখে পড়েছে···বুঝতে পারছেন···অনেকটা ফিল্ম স্টার ধাঁচের চেহারা।'

চট করে টেলিফোন তুলে নিল বেগ্লার। 'নিউ ইয়র্ক পুলিশ থেকে ফিল অ্যাল্‌জার-এর যে ফোটোটা পাঠিয়েছে, সেটা একবার পাঠিয়ে দাও তো, জ্যাকবি। সেই যে··· যাকে ধরবার জন্যে হুলিয়া বেরিয়েছে।'

'অ্যাল্‌জার ?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন টেরেল।

'হয়তো ভুল হচ্ছে আমার, তবে বর্ণনাটা মিলে যাচ্ছে। নিউ ইয়র্ক পুলিশ ওকে খুঁজছে, এদিকে লোকটা হাওয়া।'

'আচ্ছা, ছবি আসুক, ততক্ষণ···আপনি এই পরের মেয়েটার একটু বর্ণনা দিতে পারবেন, মিঃ টুলাস ?'

'হাজার বার পারব! প্রথম যখন দেখি, তখন মায়ামি এয়ারপোর্টের বাস থেকে সবে নামছে। আমি তখন একটা দোকানে ঢুকছি। নেমে কাছেই একটা বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসল। চোখে পড়ল, তার কারণ মেয়েটার ছুলকি চলন। যাকে বলে হংসগমন।' মুচকি হাসলেন টুলাস। 'এ রকম কোমর-দোলানো বড় একটা দেখা যায় না, ক্যাপ্টেন। মেরেলিন মনরো-র পর এমনটি আর চোখে পড়েনি।'

'বয়েস কত হবে ?'

'আঠারো···উনিশ। সাড়ে পাঁচ ফুটের মতোন, সুন্দর স্বাস্থ্য। ঘন সবুজ রঙের সোয়েডের জ্যাকেট গায়ে, টাইট কালো প্যান্ট। মাথায় সাদা স্কার্ফ ছিল।'

'এয়ারপোর্টের বাস থেকে নামল ?'

'হুঁ। যখন কাজ শেষ হলো আমার, দোকান থেকে বেরিয়ে এলুম, তখনও বেঞ্চিতেই বসে ছিল। তারপর ঐ লোকটা এল···'

টেবিলের ওপর একটা ফাইল রেখে গেল জ্যাকবি।

ফাইল থেকে একটা ফোটো বার করে টুলাস-এর সামনে ধরলে বেগ্‌লার।

জিগ্যেস করলে, 'এই লোক?'

ফোটোটার দিকে চেয়ে রইলেন টুলাস। তারপর ঘাড় নাড়লেন।

'হ্যাঁ···এই লোকটাই।'

টুলাসকে বিদায় দেবার পর টেরেল বললেন, 'যাক, এতক্ষণে একটা হদিশ পাওয়া গেল মনে হচ্ছে। অ্যাল্‌জার-এর পাত্তা লাগাও, জো। হয়তো এখনও প্যারাডাইস সিটিতেই আছে। তবে, সন্দেহ হয়। আর, ফ্রেডকে ডেকে দিয়ে যাও।'

কয়েক মিনিট বাদেই এল ফ্রেড হেস। টুলাস-এর কথা সব শুনলে টেরেল-এর কাছ থেকে।

'অ্যাল্‌জার-এর সঙ্গের দ্বিতীয় মেয়েটা কে, জানা যাচ্ছে না। খোঁজ নিয়ে জানবার চেষ্টা কর। মেয়েটাকে পেলে, তার কাছ থেকেই হয়তো অ্যাল্‌জার-এর পাত্তা করা যাবে। সওয়া আটটা নাগাদ মায়ামি এয়ারপোর্টের বাস থেকে নেমেছে। তার মানে নিউ ইয়র্ক থেকে প্লেনে এসেছে। ঐ রকম সময়ে এক নিউ ইয়র্ক থেকেই প্লেন আসে। খোঁজ নাও, ফ্রেড, এক্ষুনি খোঁজ নাও।'

মায়ামি এয়ারপোর্টের কণ্ট্রোল অফিসে হাজির হলো ফ্রেড

হেস। একটি মেয়ে টাইপ করছিল, কাজ থামিয়ে মুখ তুলে তাকাল।

ব্যাজ দেখিয়ে ফ্রেড বললে, 'প্যারাডাইস সিটি পুলিশ।' মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠে কাউণ্টারের কাছে এগিয়ে এল। ফ্রেড বললে, 'গত মাসের ১৭ তারিখে নিউ ইয়র্ক থেকে যে প্লেনটা সকাল সাড়ে সাতটায় মায়ামি এসে পৌঁচেছিল, তার প্যাসেঞ্জারদের তালিকাটা একবার দেখতে হবে।'

'হ্যাঁ, স্যার, দেখাচ্ছি।'

মেয়েটি ভিতরে চলে যেতে বেঞ্চিতে বসল ফ্রেড। হেড-কোয়ার্টার থেকে যখন বেরোয়, টেরেল তখন নিউ ইয়র্ক পুলিশের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন। অ্যাল্‌জার সম্বন্ধে নিউ ইয়র্ক পুলিশের যে রিপোর্ট আছে, তাতে লোকটা খুন-টুন করতে পারে বলে মনে হয় না। অথচ···। বহুদিন থেকেই পুলিশের খাতায় নাম আছে তার, কিন্তু খুন-টুন দূরে থাক, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা মার-পিটের উল্লেখ নেই। অ্যাল্‌জার-এর কাজ খুব পরিষ্কার। চালাকিতেই কাজ সারে বরাবর।

প্যাসেঞ্জারদের নামের তালিকা নিয়ে ফিরে এল মেয়েটি। ফ্রেড-এর হাতে দিয়ে বললে, 'আপনি রেখে দিতে পারেন দরকার হলে।'

বত্রিশটা নাম। পড়তে লাগল ফ্রেড। একটা নাম বিশেষ করে চোখে পড়ল, ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল তার।

ইরা মার্শ।

আশ্চর্য ব্যাপার। মার্শ? কাকতালীয়? মিউরিয়েল মার্শ···ইরা মার্শ···আত্মীয়?

'এই মেয়েটির সম্বন্ধে কিছু জানা যায়···ইরা মার্শ?'

'ওর টিকিটের একটা কপি আছে; দেখতে পারেন, যদি কিছু সুরাহা হয়।'

'তাই দিন, দেখা যাক।'

মেয়েটি ফাইল ঘেঁটে টিকিটের কপি বার করে দিলে। দেখা গেল, ইরা মার্শ একাই যাত্রী হিসাবে প্লেনে চড়েছে; ঠিকানা হলো ৫৭৯ ঈস্ট ব্যাটারি স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক।

'ধন্যবাদ,' বলে ফ্রেড সেখান থেকে বেরিয়ে হাজির হলো এয়ারপোর্টের পুলিশ কণ্ট্রোল দপ্তরে।

আরও আধঘণ্টা বাদে পুলিশ হেড্‌কোয়ার্টারে ফিরে টেরেল-এর কাছে রিপোর্ট দিলে।

'মিঃ টুলাস সীকম্ব-এর বাস টার্মিনাসে যাকে দেখেছেন, সে হলো ইরা মার্শ।' এক কাপ কফি ঢেলে নিলে ফ্রেড। তারপর বলতে লাগল, 'কণ্ট্রোল আফিসের সবাই ওকে দেখেছে। অনেকেরই চোখে পড়েছে। নিউ ইয়র্ক-এর প্লেনেই ছিল ইরা মার্শ। এয়ারপোর্ট থেকে সীকম্ব-এর বাসে চড়ে। এখন কথা হলো, কে এই ইরা মার্শ? ঠিকানা পেয়েছি। নিউ ইয়র্কে খোঁজ করে একটু খবরাখবর নিলে কেমন হয়?'

টেরেল বললেন, 'তাই কর। তাড়াতাড়ি। ডিভন-এর বৌ-এর কেউ হয় কি না, খোঁজ নাও। হয়তো অন্ত্যেষ্টির সময়ে এসে থাকবে। কিন্তু অ্যাল্‌জার-এর সঙ্গে করছিলটা কী?'

ফ্রেড ঘর ছেড়ে বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই বেগ্‌লার আর লেপ্‌স্কি এসে ঢুকল।

বেগ্লার বললে ; 'লেপ্স্কি একটা ব্যাপারের কথা বলছে, চীফ, হয়তো কাজে আসবে। ঐ রকম চশমা পরে, এমন যে সব মেয়েদের নাম আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে নোরিনা ডিভন-এর নাম রয়েছে। গত সাত দিনে লেপ্স্কি অন্ততঃ চার-পাঁচবার ওকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছে, একবারও চোখে চশমা ছিল না। ডক্টর ওয়াইড্ম্যান-এর রুগি হিসেবেই নোরিনার নামটা পেয়েছি, তাই লেপ্স্কিকে পাঠিয়েছিলুম তাঁর সঙ্গে কথা বলতে।—এবার তুমি বল লেপ্স্কি।'

লেপ্স্কি শুরু করলে, 'দেখা তো করলুম। আমরা ঠিকই ধরেছি, নোরিনা ডিভন-এর চোখ খুব খারাপ। বেশি খারাপ ডান চোখটা। লেন্স-এর টুকরোটা ডাক্তারকে দেখালুম, প্রেসক্রিপশান দেখে বললেন, মিলে যাচ্ছে। যে দোকান থেকে চশমাটা করানো হয়েছিল, তার ঠিকানাও দিলেন, কিন্তু যে লোকটা কাঁচ লাগিয়েছিল, সে ছুটিতে বাইরে গেছে। মঙ্গলবার সকালে ফিরবে।'

ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে ভুরু কুঁচকে লেপ্স্কির দিকে তাকালেন টেরেল। 'আমার মাথায় ঢুকছে না যে, এ রকম সুধু-সুধু সময় নষ্ট করছ কেন তোমরা? যখন জানি যে, নোরিনা বহাল-তবিয়তে বেঁচে রয়েছে, তখন এ নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয়?'

লেপ্স্কি একটু নড়ে দাঁড়াল। 'একটু খটকা লাগছিল আমার। মিস ডিভন চশমা পরে না।'

'কখ্খনও পারে না?'

'তা ঠিক বলা যায় না, তবে ডাক্তার বলছেন যে, চশমা না-পরা মানে প্রায় অন্ধ হয়ে থাকা।'

অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন টেরেল। 'মেয়েরা চশমা পরা পছন্দ করে না, সেটা জান? দেখবার অসুবিধে হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছে করেই চশমা পারে না হয়তো!···মেয়েরা ঐ রকমই হয়!'

'বিনা-চশমায় গাড়ি চালায়।'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে। সময় মতো ওর বাবার সঙ্গে কথা বলে দেখব এখন। ভগবানের দোহাই, লেপ্‌স্কি, এবার কাজের কাজ কিছু কর।' ঘড়ির দিকে তাকালেন টেরেল। 'যাঃ, নটা বাজল, রেডিওর খবরটা হয়ে গেল! কাল সকাল সাড়ে সাতটার খবরে যাতে অ্যাল্‌জার-এর চেহারার বর্ণনাটা যায়, তার ব্যবস্থা কর। ফোটোটা নিয়ে হোটেলে-হোটেলে খোঁজ কর। দেখ, শহরেই কোথাও আছে কি-না এখনও।' যাও, যাও, লেগে পড়!'

ফোটোটা তুলে নিয়ে বেগ্‌লার-এর দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লেপ্‌স্কি।

টেরেল বললেন, 'দেখ, জো, অ্যাল্‌জার-এর সন্ধান করবার জন্যে লোকের পর লোক লাগাতে লাগাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি সবাই, আর এদিকে আবোলতাবোল কাজে তুমি লোককে, আটকে রাখছ—এটা কোর না। মেল ডিভন-এর মেয়েকে নিয়ে ফ্যাচাং না-করে, সত্যিকারের কিছু দরকারি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালে ভালো হতো না?'

'হ্যাঁ, চীফ!' অপ্রস্তুতে পড়ল বেগ্‌লার। 'কেমন যেন খটকা লাগল···'

'হয়েছে···বাদ দাও ও কথা!' ছিটকে উঠলেন টেরেল। 'বরং দেখ দিকিনি, ঐ বামনটার কাছ থেকে সন্ধান নাও যে, মিউরিয়েল ডিভন-এর মুখ থেকে কোনও দিন ইরা মার্শ বলে কোনও মেয়ের নাম শুনেছে কি না?'

'এখন তো রেস্টুরেন্টে থাকবে।'

'রেস্টুরেন্টেই ফোন করে কথা বল তা হলে!'

নিজের ঘরে ফিরে গেল বেগ্‌লার। ফ্রেড তখন টেলি-ফোন সেরে রিসিভার নামিয়ে রাখছে।

'নিউ ইয়র্ক পুলিশের সঙ্গে কথা বললুম। ইস্ট ব্যাটারি স্ট্রীটের ঠিকানায় খোঁজ-খবর করে আমাদের জানাবে।' হাই তুলে আড়ামোড়া ভাঙলে ফ্রেড। 'আজও রাত হবে মনে হচ্ছে।'

বিরক্তির একটা শব্দ বেরিয়ে এল বেগ্‌লার-এর গলা দিয়ে। লা কোকুইল রেস্টুরেন্টে ফোন করলে। একটু পরে লুই-র সাড়া পাওয়া গেল।

'সিটি পুলিশ। এড্রিস-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ও এখানে নেই।'

'তা হলে কোথায় আছে?'

'নিউ ইয়র্ক। দিন দশেক পরে আসবে। এক পুরনো বন্ধু মৃত্যুশয্যায়, তারই সঙ্গে দেখা করতে গেছে।'

'যাক, ওরও বন্ধু আছে তা হলে!' টেলিফোন রেখে দিলে বেগ্‌লার।

ফ্রেড বললেন, 'একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না—অ্যাল্‌জার হঠাৎ খুনি বনে গেল কী করে! মাথায়

পলিশের হুলিয়া নিয়ে, কেউ খুন করে? শুনেছ কখনও? উদ্দেশ্যই বা কী? খুব একটা লাভের ব্যাপার হবে নিশ্চয়ই, নইলে পুলিশের খাতায় নাম ওঠার পরেও কেউ এমন ঝুঁকি নেয়!'

টেলিফোনটা কাছে টেনে নিতে নিতে বেগ্‌লা বললে, 'ইচ্ছে হয়, ভেবে মর। আমার নিজের জ্বালায় মরছি এখন।'

জেনারেল মোটরস নাইট সার্ভিস-এ ফোন করলে। সাড়া পেতে বললে, 'প্যারাডাইস সিটি পুলিশ। একটা হুডওলা বিউইক রোড্‌মাস্টার গাড়ির সন্ধান চাই। তুরঙা: নীল আর লাল, সম্ভবতঃ গত বছরের মডেল। কোনও খোঁজ দিতে পারেন?'

ওদিক থেকে জবাব এল, 'আপাততঃ তিনখানা ওই রকম গাড়ি রয়েছে আমাদের গ্যারাজে।'

'আমি যে গাড়িটার খোঁজ করছি, তার মালিক ছ ফুটের মতো লম্বা, শক্ত-সমর্থ, নীল চোখ, হলদেটে চুল, সাজ-পোশাকে ফিটফাট।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। মিঃ হ্যারি চেম্বার্স। এখানে আসেন।'

'সে গাড়িটা এখন আপনাদের ওখানে নেই, না?'

'না। গত সপ্তাহে ছিল। তার পর থেকে আর আসেনি।'

'পয়সা-কড়ি কিছু পাওনা আছে?'

'বলতে পারছি না। জেনে বলছি। ধরুন।'

ফ্রেড-এর দিকে চোখ মটকে তাকিয়ে বেগ্‌লার বললে, 'প্রথম দানেই মেরে দিয়েছি!'

ফ্রেড বললে, 'মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।'

ওদিক থেকে আওয়াজ এল, 'না। ন তারিখে সব মিটিয়ে দিয়ে গেছে। কেরানিবাবু বলছে, প্যারাডাইস সিটিতে আর থাকবে না, তাই এখানে আর গাড়ি রাখেননি ভদ্রলোক।'

'ঠিকানা জানেন?'

'রিজেণ্ট হোটেলে থাকতেন।'

'ভদ্রলোকের থুঁৎনির মাঝখানটা খুব টোল-খাওয়া কিনা, মনে পড়ে?'

'খুব পড়ে। গোটা একটা সুপুরি ঢুকে যায়, এত বড় ঘাঁজ।'

'ধন্যবাদ।' খুশি মনে টেলিফোন নামিয়ে রাখল বেগ্‌লার। 'রিজেণ্ট হোটেলে থাকে, কিম্বা থাকত লোকটা, আর এদিকে লেপ্‌স্কি বেচারা কোথায়-না-কোথায় ঘুরে মরছে দেখ দিকিনি!'

টেলিফোন নিলে ফ্রেড। রেডিও রুম-এ নির্দেশ দিলে, লেপ্‌স্কির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে রিজেণ্ট হোটেলে যেতে বলে দিতে।

প্রমিনেড দিয়ে যেতে যেতে গাড়িতে বসে খবরটা পেলে লেপ্‌স্কি। সঙ্গে-সঙ্গে পাশের গলির মধ্যে গাড়ি ঘুরিয়ে রিজেণ্ট হোটেলের দিকে গাড়ি চালালে সে।

দশ মিনিট বাদে লেপ্‌স্কি টেলিফোন করল টেরেলকে।

'ন তারিখে অ্যাল্‌জার রিজেণ্ট হোটেল থেকে কেটেছে। কোনও ঠিকানা রেখে যায়নি। মনে হচ্ছে, সহরে নেই।'

টেরেল বললেন, 'হয়তো পয়সার টানাটানি পড়েছিল। সস্তার হোটেলে-টোটেল খোঁজ কর। হয়ত এখানেই কোথাও আছে এখনও।'

'আচ্ছা, স্যার।' টেলিফোন নামিয়ে রেখে গজ্‌গজ্‌ করে উঠল লেপস্কি।

৯

রান্নাঘর থেকে কফির কেৎলি হাতে বেড়িয়ে এল এড্রিস; টেবিলের ওপর রাখলে। ঘুম হয়নি, মেজাজটা তিরিক্ষি। সারারাত অন্ধকারের দিকে চেয়ে-চেয়ে ভেবেছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কোন কূল-কিনারা পায়নি। কুত্তার বাচ্চা অ্যাল্‌জার-এর বোকামি আর ধ্যাড়ানির জন্যে এই ঘর-দোর, সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে, এ চিন্তাটাই অসহ্য। দুটো কাপে কফি ঢালতে লাগল এড্রিস। অ্যাল্‌জার-এর দিকে যখন আড়চোখে তাকাল, তখন সে দৃষ্টিতে ঘৃণা ঝরে পড়ছে।

সিগারেট খেতে-খেতে হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে ছিল অ্যাল্‌জার। সেও ঘুমতে পারেনি সারারাত, চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে। সাতটা চৌত্রিশ মিনিটে রেডিওয় খবর হবে, তারই অপেক্ষায় বার-বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

কফির কাপটা হাতে তুলে নিতে-নিতে বললে, 'এখনও কাগজ এল না?'

'না!' আলমারি খুলে নিজের কফিতে বেশ খানিকটা ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে নিলে এড্রিস।

অ্যাল্‌জার বলে উঠল, 'আমাকেও দাও একটু।'

এড্রিস ব্র্যাণ্ডির বোতলটা এগিয়ে দিলে। কাপে ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে আবার ঘড়ির দিকে তাকাল অ্যাল্‌জার। সাতটা

সাড়ে দশ। ঘড়িটা কি বন্ধ হয়ে গেল? হাতঘড়ির দিকে চেয়ে ঘড়ঘড় করে উঠল অ্যাল্‌জার।

'আঃ চুপ করে বোস!' খিঁচিয়ে উঠল এড্রিন। 'বলছি তো, কোনও ভয় নেই! কোনও সূত্র পাওয়া যায় নি। মেয়েটার পরিচয় কোনও দিনই জানা যাবে না।'

কফিতে চুমুক দিলে অ্যাল্‌জার, ঝুঁকে বসে রেডিওর সুইচটা ঘুরিয়ে দিলে।

একটা বাজনা সবে শেষ হলো, তারপর হলো রাজনৈতিক সংবাদ। অসহনীয় ধৈর্যে অপেক্ষা করে থাকতে হলো ওদের। শেষ পর্যন্ত সিঁটিয়ে বসলে ওরা। ঘোষক তখন বলছে, 'কোরাল কোভ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে নতুন খবর আছে। পুলিশ ফিলিপ অ্যাল্‌জার ওরফে হ্যারি চেম্বার্স-এর সন্ধান করছে। রিজেণ্ট হোটেলের ঠিকানা পাওয়া গেছে, বর্তমান ঠিকানা অজ্ঞাত। অ্যাল্‌জার-এর চেহারার বর্ণনা: উচ্চতা ছ-ফুট; ওজন ১৯০ পাউণ্ড; চওড়া কাঁধ, হলদেটে চুল, ছোট গোঁফ, নীল চোখ, থুঁৎনির মাঝখানে গভীর খাঁজ। শেষ যখন দেখা গিয়েছিল, তখন পরনে ফিকে খয়েরি স্যুট, চকলেট রঙের স্ট্র-হ্যাট, তাতে লাল পটি। যে গাড়ীতে তাকে দেখা যায়, সেটি হুডওলা বিউইক রোডমাস্টার, দুরঙা: নীল এবং লাল, নম্বর NY 4599। সন্ধান জানতে পারলে পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে দয়া করে অবিলম্বে খবর দেবেন। টেলিফোন: প্যারাডাইস 00 1 0।'

প্রায় আধ মিনিট পাথরের মতো চুপ করে বসে রইল দুজনে। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে রেডিওতে নাচের বাজনা বেজে

চলল তারস্বরে। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল অ্যাল্‌জার। অস্ফুটে একটা গালাগাল দিয়ে সজোরে কফির কাপটা ছুঁড়ে মারলে এড্রিস-এর দিকে। এড্রিস-এর বুকে লেগে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল কাপটা, মুখময় কফি ছিটকে লাগল।

উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল অ্যাল্‌জার, 'নচ্ছার কোথাকার! খুন করে ফেলব একেবারে! নিপাত যা তুই! নাড়ি-ভুঁড়ি নেটে ছিঁড়ে নেব তোর, হতভাগা কোথাকার!'

অ্যাল্‌জার এগিয়ে আসতেই সোফা থেকে হড়কে নেমে পড়ল এড্রিস। গিরগিটির মতো সপিলভঙ্গিতে অ্যাল্‌জার-এর হাত এড়িয়ে তীরের বেগে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল, সজোরে দরজা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে দিলে।

গালাগাল দিতে দিতে বন্ধ দরজার গায়ে কাঁধ লাগিয়ে ঠ্যালা দিতে লাগল অ্যাল্‌জার। নড়বড় করে উঠল পাল্লা, কিন্তু খুলল না। সরে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে দরজার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, বার-বার হাতের মুঠো পাকাতে লাগল। তারপর হঠাৎ আসন্ন বিপদের ছবিটা খুব পরিষ্কার হয়ে উঠল তার কাছে, রেডিওর খবরের তাৎপর্যটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারল। পেটটা মোচড দিয়ে বমি উঠে আসতে চাইল যেন। ধপ করে বসে পড়ল। ঢোক গিলতে দিয়ে সারা মুখটা তেতো লাগল। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা কনকন করছে, ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমেছে সারা মুখে, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে।

শোবার ঘরে এড্রিসও তখন আতঙ্কে বিহ্বল। হাতে পেলে অ্যাল্‌জার যে ওকে খতম করবেই, তাতে কোনও সন্দেহ

নেই। তাড়াতাড়ি টানার দিকে ছুটে গিয়ে নিচের টানাটা হড়হড় করে টেনে বার করে ফেলে হন্যের মতন হাতড়াতে লাগল, ·25 অটোম্যাটিক বন্দুকটার সন্ধানে। নেই। বন্দুকটা নেই। টানার সমস্ত জিনিস পাগলের মতো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে এড্রিস। শূন্য টানা। বন্দুক নেই। বুঝলে, অ্যাল্‌জার-ই হাতিয়েছে। অ্যাল্‌জার ছাড়া আর কেউ নিতে পারে না। কাঁপা-কাঁপা পায়ে এগিয়ে গিয়ে খাটের ওপর বসে পড়ল এড্রিস। পাথরের মতো চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল—সাপের সামনে বাচ্চা পাখির মতো স্তম্ভিত দৃষ্টিতে।

আরও কুড়ি মিনিট পার হলো; আধ বোতল ব্র্যাণ্ডি খালি করে অ্যাল্‌জার একটু ধাতস্থ হলো।

মনে-মনে ভাবলে, এখনও তো ধরা পড়েনি। খুব বেকায়দায় পড়েছে ঠিকই, তবে বুদ্ধি খাটালে এখনও নিস্তার পেতে পারে। এয়ারপোর্ট আর রেল স্টেশনে নিশ্চয়ই নজর রেখেছে পুলিশ। রাস্তা-ঘাটে ওর গাড়ির খোঁজ করছে। হাভানা যাওয়া মাথায় উঠল। রাস্তায় যদি পুলিশ নজর নাও রাখে, বিউইক নিয়ে পথে বেরুতে ভরসা করা উচিত নয়। এড্রিস-এর তালা-বন্ধ গ্যারাজে গাড়িটা অবশ্য আপাততঃ নিরাপদ।

ঠিক আছে, ওই হারামজাদা বামনটার জন্যেই যখন এমন বেকায়দায় পড়তে হলো, তখন সুরাহা করার দায়টাও ওরই!

উঠে শোবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল অ্যাল্‌জার। চেঁচিয়ে বললে, 'ঠিক আছে, টিকি। বাইরে এস। গায়ে হাত দেব না। একটু কথা বলা দরকার। বেরিয়ে এস!'

এড্রিস বললে, 'আমি ঘরেই রইলুম।' জামা বদলাচ্ছিল সে। 'তোমায় বিশ্বাস নেই।'

'মুখ্যু কোথাকার! সময় নষ্ট কোর না। দুজনেরই একই হাল। পরামর্শ করা দরকার।'

ইতস্তত: করল এড্রিস। অ্যাল্‌জার-এর গলার আওয়াজটা এখন অনেক শান্ত। এড্রিস জানে, ঝট করে যেমন চটে যায় অ্যাল্‌জার, তেমনি চট করে ঠাণ্ডাও হয়ে যায়। তবু, হাতে বন্দুকটা থাকলে ভালো হতো। স্যুটটাও বদলে নিলে এড্রিস। বাইরে থেকে আবার তাগাদা দিলে অ্যাল্‌জার, তখন আস্তে-আস্তে দরজা ফাঁক করলে।

অ্যাল্‌জার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ডান হাতে এড্রিস-এর বন্দুকটা। মেঝের দিকে তাগ-করা।

একটু থমকে রইল এড্রিস। বন্দুকটার দিকে দেখে মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, হলদে পোকা কোথাকার!' দাঁতে-দাঁত ঘষে বললে অ্যাল্‌জার, 'গায়ে আঁচড়টুকুও লাগাব না, কথা দিচ্ছি।'

ঘরে ঢুকে এসে এড্রিস বললে, 'বন্দুকটা দাও। ওটা আমার।'

বন্দুকটা পকেটে পুরে অ্যাল্‌জার বললে, 'তোমার হাতে বন্দুক না-থাকাই ভালো। বোস! কথা আছে।'

বসল এড্রিস, মনের মধ্যে ঝড় বয়ে চলছে। অ্যাল্‌জার-এর খোঁজ পেল কী করে পুলিশ? যদি ধরতে পারে, মুখ খুলিয়ে ছাড়বে। এড্রিসকে জড়াতে কোন সঙ্কোচ করবে না অ্যাল্‌জার

খুশি মনেই সব ফাঁস করে দেবে। রাস্তা একটাই। অ্যাল্‌জারকে একটু অন্যমনস্ক করে দিয়ে মওকামতো ওকে খতম করে দেওয়া—পুলিশ এসে পড়ার আগেই।

অ্যাল্‌জার তখন বলছে, 'আমরা দুজনেই ফেঁসে গেছি, টিকি। তোমার ওপর এখনও ওদের নজর পড়েনি, নইলে এতক্ষণে এখানে এসে হাজির হয়ে যেত। ইরার ব্যাপারটাও টের পায়নি, এটা পরিষ্কার। ইরা যে নোরিনা নয়, সেটা টের পেলে খবরটা চেপে রাখতে পারত না। এখন, শোন, এই জাল কেটে বেরুবার সামান্য একটু সম্ভাবনা এখনও আছে। তোমার ছোট্ট মিনি গাড়িটা নিয়ে এখনও হাওয়া হতে পারি হয়তো। যদি মায়ামি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারি কোনও রকমে, তা হলে গা ঢাকা দেবার ব্যবস্থা করা যায়। জানা-শোনা একজন ওস্তাদ লোক আছে, যদ্দিন না গোলমাল মেটে, লুকিয়ে রাখতে পারবে। অনেক শুলুক-সন্ধান জানে, দরকার হলে জাহাজে করে কিউবা যাবার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু খরচ আছে। তার টাকার খাঁইটা বড্ড বেশি। যাবার আগে যতটা সম্ভব টাকা যোগাড় করে নিতে হবে। কাজেই গার্ল্যাণ্ড-এর টাকাটা হাতাবার চেষ্টা না-করলেই নয়।'

একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে ছিল এড্রিস। বেশ কিছু টাকা যোগাড় করা যে দরকার, সেটা খুবই ঠিক কথা, কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে? কিছুতেই নয়! পাগলামি না কি?

দাঁতে-দাঁত চেপে বললে, 'তুমি ব্যাঙ্কে যাবে? হাঁদা কোথাকার! সঙ্গে-সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে।'

'আমি ব্যাঙ্কে যাব, তা তো বলিনি। পালাবার আগে

পর্যন্ত আমি ঘরের বাইরে বেরুচ্ছি না মোটেই।' টেলিফোনের দিকে ইশারা করল অ্যাল্‌জার। 'ইরাকে ডাক! বল যেন ব্যাঙ্কের সামনের কাফেতে আধ ঘণ্টার মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করে। কাল আমায় বলছিলে না, আমি যদি কেটে পড়ি, তা হলে ইরাই টাকা তুলে আনতে পারবে? তা, বেশ তো, তাই করুক এবার! কী করে ওকে রাজি করাবে, সেটা আমার মাথাব্যথা নয়, রাজি করাতেই হবে! বলবে, ভল্ট খুললেই যেন টাকাটা হাতিয়ে রাখে, তার পর গার্ডকে বলে যেন, শরীর খারাপ, বাড়ি যাওয়া দরকার। তুমি কাফেতে থাকবে। নাও, টেলিফোন কর। এক্ষুনি!'

ইতস্তত: করতে লাগল এড্রিস।

গালাগাল দিয়ে উঠে পকেট থেকে অটোম্যাটিকটা বার করে এড্রিস-এর দিকে বাগিয়ে ধরল অ্যাল্‌জার।

'যদি না-কর, খুন করে ফেলব তোমায়! টেলিফোন কর, হারামজাদা!'

আস্তে-আস্তে উঠে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল এড্রিস। গাইড দেখে নম্বর ডায়াল করলে। নারীকণ্ঠে আওয়াজ এল: 'মিঃ ডিভন-এর বাড়ি থেকে বলছি।'

'মিস ডিভন-এর সঙ্গে কথা বলব।'

ধরে থাকতে বললে। একটু সময় গেল। ইরা এসে টেলিফান ধরলে।

'টিকি বলছি। আধ ঘণ্টার ভেতর ব্যাঙ্কের সামনের কাফেতে দেখা কর।'

'কেন?' ইরার গলাটা খুব তীক্ষ্ণ শোনাল।

'চুলোয় যাক তোমার কেন··· যা বলছি কর, নইলে কপালে অনেক দুখ্‌খু আছে!' টেলিফোন রেখে দিলে এড্রিস।

উঠে দাঁড়াল অ্যাল্‌জার। বন্দুকটা এড্রিস-এর দিকেই তাগ-করা।

'ওয়ানাসীর দরুন যে টাকাটা পেয়েছ, সেটা আমায় দিতে হবে, টিকি। পঁচিশ হাজার। ঝটপট বার কর! ওটা জামিন থাকবে আমার কাছে। গার্ল্যাণ্ড-এর টাকাটা নিয়ে যে সরে পড়বে, সেটি হচ্ছে না! দাও!'

অ্যাল্‌জার-এর চাউনিটা ভালো লাগল-না এড্রিসের। টেবিলের টানাটা খুলে বাইরে বার করে রাখলে; ভিতরে একেবারে পিছন দিকে হাত ঢুকিয়ে একটা সীল-করা মোটা খাম বার করে আনলে। ছুঁড়ে দিলে অ্যাল্‌জার-এর দিকে।

'ফেরৎ দেব, টিকি। নাও, বেরিয়ে পড়, সময় নষ্ট হচ্ছে।'

সশব্দে দরজা বন্ধ করে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল এড্রিস—মাথায় খুন, প্রচণ্ড রাগে মুখখান বীভৎস।

জো বেগ্‌লার টেবিলে বসে আছে—মুখে শ্রান্তির ছাপ, চোখদুটো একটু বসা। পুরো আট ঘণ্টা ধরে কাগজের রিপোর্টার, টেলিফোন আর রেডিওর খবর নিয়ে ধস্তাধস্তি করেছে একনাগাড়ে।

টেলিফোন বেজে উঠল। এই নিয়ে গত এক ঘণ্টায় তেরোবার হলো। বিরক্তির অস্ফুট একটা আওয়াজ করে রিসিভার তুললে বেগ্‌লার।

'জো না কি ? আমি অ্যাল্‌ডুইক, ফ্লরিডা সেফ ডিপজিট ব্যাঙ্কের সিকিউরিটি গার্ড।'

'হ্যালো, জিম। বল, কী চাই ?'

'অ্যাল্‌জার-এর কথা বলছি। আমরা ওকে এখানে দেখেছি। চেনা লোক। একটা সিন্দুক ভাড়া নিয়েছে, রোজই আসা-যাওয়া করে।'

'তাই না কি ?' উৎসুক হয়ে উঠল বেগ্‌লার। 'সিন্দুক ভাড়া নিতে গেল কেন হঠাৎ ?'

'বলে না কি খুব বড় জুয়াড়ি। এখানে নাম লিখিয়েছে, লসন ফরেস্টার, কিন্তু তোমাদের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, কাগজের ছবিটা দেখেই চিনতে পেরেছি। অ্যাল্‌জার ছাড়া কেউ নয়।'

'শোন, জিম, লোক পেলেই পাঠাব। সিন্দুকটা একবার দেখা দরকার।'

'সে গুড়ে বালি। ওর চাবি ছাড়া সিন্দুক খোলবার উপায় নেই।'

'ভেঙে তো খোলা যায় ?'

'সেটা মিঃ ডিভন বলতে পারেন।'

'যাই হোক, লোক পেলেই পাঠাচ্ছি, কিন্তু অ্যাল্‌জার যদি তার আগেই এসে পড়ে, সামলাতে পারবে না ?'

'নিশ্চিন্ত থাক। আচ্ছা, ছাড়ি। বেশি খাটা-খাটুনি করে অসুখ-বিসুখ বাধিয়ো না যেন।' টেলিফোন কেটে দিল অ্যাল্‌ডুইক।

টুকরো কাগজে তাড়াতাড়ি একটা নোট লিখে তারে গুঁজে

মুখুল বেগলার। আবার টেলিফোন বেজে উঠল, বিরক্তিতে মাথা নাড়তে নাড়তে রিসিভার তুলে নিল সে।

বাইরের চড়া রোদ থেকে কাফের ভিতরে ঢুকে অন্ধকারটা সইয়ে নিতে হলো ইরাকে। বার-এর একদম শেষ দিক থেকে এড্রিসকে হাত নেড়ে ডাকতে লক্ষ্য করলে, অনিচ্ছা-সত্বেও এগিয়ে গেল তার কাছে।

এড্রিস-এর তটস্থ ভাব আর মুখের অবস্থা দেখে বুঝতে দেরি হয় না যে, খুব খারাপ কিছু ঘটে গেছে। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। অনেকক্ষণ কেউই কোনও কথা বলতে পারলে না। বারম্যান এসে কফির অর্ডার নিয়ে গেল।

সোজাসুজি কথা শুরু করলে এড্রিস।

'সকালের কাগজ দেখেছ?'

মাথা নাড়ল ইরা।

'ফিল খুব মুশকিলে পড়েছে। পুলিশ লেগেছে পেছনে। সময় বড় কম,কাজেই খুব মন দিয়ে শোন, বলি। গার্ল্যাণ্ড-এর টাকাটা এনে দাও।' বলতে-বলতে নকল চাবিটা এগিয়ে দিলে এড্রিস।

'না, না!' চাবিটার কাছ থেকে যেন দূরে সরে যেতে চাইল ইরা।

'চুপ! ফিল-এর দ্বারা আর হবে না। ওকে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে, কাজেই তোমাকেই করতে হবে!'

'আমি পারব না! বড্ড বিপদের কাজ!'

দাঁত কিড়মিড় করে উঠল এড্রিস। ফাঁদে-পড়া হিংস্র জানোয়ারের মতো দেখতে লাগল তাকে।

'কথা কয়ো না!' সেদিনের "প্যারাডাই সিটি সান" পত্রিকাটা এগিয়ে দিল ইরার দিকে। বললে, 'চোখ বুলিয়ে দেখে নাও!'

প্রথম পাতায় অ্যাল্‌জার-এর ছবি আর বড় বড় হেড্‌-লাইনের ওপরেই ইরার দৃষ্টিটা থমকে রয়ে গেল। তারপর একটু-একটু করে বিশদ খবরটা পড়তে পড়তে ক্রমশই আতঙ্কে আঁৎকে উঠতে হলো তাকে—কোরাল কোভ-এ অজ্ঞাত-পরিচয় একটি মেয়ের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে অ্যাল্‌-জারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে শহরের পুলিশ।

খুন! অ্যাল্‌জার!

বোকার মতো এড্রিস-এর দিকে চেয়ে রইল ইরা। 'কিছু বুঝতে পারছি না। অ্যাল্‌জার কি···?'

'এতদিনে বোঝা উচিত ছিল।' সাপের মতো হিসহিসিয়ে কথা বলতে লাগল এড্রিস। 'নোরিনা জলে ডুবে মারা গেছে, এটা ডাহা মিথ্যে কথা বলেছিলুম তোমায়। ও ছিল পথের কাঁটা, তাই অ্যাল্‌জার ওকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে গলা টিপে মেরে ফেলে—ঠিক তোমাকে বাস টার্মিনাস থেকে তোলবার আগেই। বুদ্ধু ব্যাটা বেশি গভীর করে পোঁতেনি লাশটাকে, তাই বেরিয়ে পড়েছে!'

ইরার মনে হলো, অজ্ঞান হয়ে যাবে। দুহাত দিয়ে টেবিলের কানাটা আঁকড়ে ধরলে। টাল সামলে টের পেতে লাগল মুখ

থেকে সমস্ত রক্ত কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে আবার বলে চলল এড্রিস, 'এখন ওরা ওকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। পালাবার জন্যে ওর টাকার দরকার। টাকার যোগাড় তোমাকেই করতে হবে, নইলে সকলেই মারা পড়ব। বুঝেছ? ধরা পড়লে ও মুখ খুলবেই। তখন তোমার বা আমার, কারোরই নিস্তার নেই।'

'আমার দ্বারা হবে না। পারব না।' ভীষণ ফ্যাসফ্যাসে শোনাল ইরার গলাটা। 'আমার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আমি তো জানতুমই না যে··· '

'আঃ, বাজে বোক না! তোমাকে। ডিভন-এর মেয়ে সাজাবার জন্যে অ্যাল্জার যে নোরিনাকে সরিয়েছে, তুমি তা জানতে না বললেই পুলিশ তা বিশ্বাস করবে ভেবেছ? মানুষ খুনের মামলা, যাদুমণি; তোমাকেও জড়াবে ওরা। নিজের হাতে খুন না-করলেও খুনিকে মদত দিয়েছ— যাবজ্জীবন শ্রীঘর। আমার কপালে গ্যাস-চেম্বার, আর তোমার কপালে জীবনভোর অন্য চেম্বার—গরাদ-দেওয়া চেম্বার। আমি হলে গ্যাস চেম্বারই বেছে নিতুম!'

থর থর করে হঠাৎ একবার কেঁপে উঠল ইরা।

এড্রিস বলে চলল, 'ভেবে দেখ। টাকাটা এনে দাও, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবে। ফিলকে ধরতে না-পারলে ওরা কোনও দিনই জানতে পারবে না, মেয়েটা আসলে কে। তোমারই তো সবচেয়ে লাভ! ফিল আর আমি টাকা পেয়ে সড়ে পড়ব, আর তার পরেও তুমি নিশ্চিন্তে চালিয়ে

যেতে পারবে—ঘর পাবে, বাড়ি পাবে, সংসার পাবে—যেমন আছ তেমনি থাকবে। বুঝতে পারছ তো? এ রকম সুযোগ আর পাবে না। তবে তার দামও তো দিতে হবে।' হাতঘড়ির দিকে তাকালে এড্রিস। আটটা পঞ্চাশ। 'নাও, এবার বল তো যাদুমণি। বল, রাজি আছ?'

নিশ্চল বসে রইল ইরা কিছুক্ষণ। এই দুটো জানোয়ারের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে বোধহয় সবকিছু করা যায়!

খানিকবাদে ঘাড় নাড়লে ইরা। 'চেষ্টা করব।' এড্রিস-এর দিকে চাইলে না।

'শুধু চেষ্টা করলেই চলবে না। মন দিয়ে শোন: ভল্ট খুললেই টাকাটা সরাবে। প্যান্টের মধ্যে গুঁজে রাখবে। কাকে বলতে হয় জানি না,—বলবে, শরীর খারাপ লাগছে। বাড়ি যেতে চাইবে। আমি ঠিক এইখানেই থাকব। আমার হাতে টাকাটা দিয়ে বাড়ি যাবে, ব্যাস, তারপর ছুটি। চির-কালের মতো ছুটি। নিশ্চিন্তে দিন কাটাও। বেলা এগারটার ভেতর ফিল আর আমি শহর ছেড়ে চলে যাব। মাথায় ঢুকল?'

এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে ইরা, আতঙ্কের বিহ্বলতা অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছে। ভেবে দেখলে, হয় এস্পার না-হয় ওস্পার। এদের দুজনের হাত থেকে রেহাই পেলে, এই নতুন পাওয়া আকাঙ্খিত জীবনটাকেই স্থায়ীভাবে বজায় রাখা যেতে পারে হয়তো।

'করব। টাকা এনে দেব।' উঠে দাঁড়াল ইরা।

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে চেয়ে দেখল এড্রিস। 'অপেক্ষা করে

রইলুম, খুকুমণি! মনে রেখ, ভণ্ডুল করেছ কি সব্বাই গাড্ডায় পড়েছি··· খেয়াল রেখ!'

অসম্বৃত চরণে কাফে থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকল ইরা। আতঙ্কে গা ঝিমঝিম করছে। অ্যাল্‌জার যে মেল-এর মেয়েকে গলা টিপে খুন করেছে, এ সত্যটাকে মেনে নেবার চেষ্টা করছে একটু-একটু করে। মেল যদি জানতে পারে, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না যে, ইরা নিরপরাধ, ইরা সত্যিই কিছু জানত না, খুনের ব্যাপারে ইরার কোনও হাত ছিল না। ওদের কাছ থেকে নিস্তার পেতে গেলে টাকা আনা ছাড়া গতি নেই। যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় ওরা? নোরিনাকে খুন করার কথা কিছুই যে জানত না, মেল আর পুলিশকে কোন যুক্তিতে বোঝাবে সে? ভাবতেই শিউরে উঠল ইরা। এড্রিস ঠিকই বলেছে·· কেউ বিশ্বাস করবে না তাকে।

সময় বড় দীর্ঘ, বড় মন্থর। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেণ্টের টেবিলে বসে বসে অনাবশ্যক কাগজের পর কাগজ উল্টে যাওয়া! এই একটা ঘণ্টা কী যে করেছে, নিজেই জানে না।

ঘড়ির কাটা নটা পঁয়তাল্লিশের ঘরে গিয়ে পৌঁছল বড় মন্থর গতিতে। উঠে দাঁড়াল ইরা। হল পেরিয়ে ভল্টের দিকে এগিয়ে গেল। দেখে অবাক হলো, অ্যাল্‌ড়ুইক নেই। অন্য গার্ড দরজার তালা খুলছে।

দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে জিগ্যেস করলে, 'অ্যাল্‌ড়ুইক কই?'

ছোট্ট করে জবাব এল, 'কাজে গেছে।' পাশ কী-টা তুলে দিল ইরার হাতে।

আলোর সুইচগুলো জ্বেলে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল ইরা। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল। বুকে যেন হাতুড়ি পিঠছে, মুখের ভিতরটা শুকনো কাঠ৺ ওপর থেকে অস্ফুট কথাবার্তার আওয়াজ আর সামান্য পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না এখন। গার্ল্যাণ্ড এর সিন্দুকের দিকে গলি-পথ বেয়ে এগিয়ে গেল।

এড্রিস-এর দেওয়া চাবিটা পকেট থেকে প্রথম ফোকরে গছিয়ে দিয়ে ক্লিক করে ঘোরালে। পাশ কী দিয়ে দ্বিতীয় কলটা খুললে। ঘাড় ফিরিয়ে লম্বা গলি-পথের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দেখে নিলে একবার। কেউ নেই। সিন্দুকের ডালা খুললে। মোটা খামখানা টেনে বার করে নিলে, সিন্দুক বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলে।

স্কার্ট তুলে জাঙ্গিয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলে খামটা। চেপে চেপে তলপেটের গায়ে চেপ্টে নিলে। ইলাস্টিক লাগানো কোমর-পটিটা নাড়িয়ে-চাড়িয়ে ঠিক করে নিলে, যাতে খামটা পড়ে না-যায়, তারপর স্কার্ট-এর তলাটা নামিয়ে দিলে।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে টেবিলে ফিরে গেল—মুখটা ফ্যাকাসে, হাতদুটো থর থর করে কাঁপছে। টানার মধ্যে পাশ কী-টা রেখে চাবি বন্ধ করে দিলে। ঠিক সেই সময়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল অ্যালড্রুইক।

'মর্নিং, মিস ডিভন।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ইরার দিকে। 'মিঃ ডিভন ডাকছেন আপনাকে। বললেন এক্ষুনি যেতে।' আবার একবার ইরার দিকে ভালো করে দেখল অ্যালড্রুইক। 'কিছু হয়নি তো, মিস?'

'না, কিছু না। আমি···আমার শরীরটা কেমন যেন ভালো লাগছে না। বাবা ডাকছেন?'

'হ্যাঁ, মিস।'

'পাশ কী-টা টানায় রইল। টানার চাবিটা লাগিয়েই রেখে গেলুম।' তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে হল-ঘরে উঠে গেল ইরা। মেল-এর ঘরের কাছে এসে দরজায় টোকা মেরে ভিতরে ঢুকল। মেল একা নয়! আর একজন যে রয়েছে, তাকে দেখে পা দুটো জমে পাথর হয়ে গেল। জানলার দিকে পিছন ফিরে ইরার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন। দেখেই বুঝেছে, পুলিশের লোক। পাদুটো বিদ্রোহ করছে, তবু প্রাণপণ চেষ্টায় ঘরের আরও খানিকটা ভিতরে এগিয়ে এল ইরা।

'আমায়···আমায় ডাকছিলে, বাপি?'

উঠে দাঁড়ালেন ডিভন। 'হ্যাঁ। ইনি ডিটেকটিভ লেপস্কি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে আসছেন।' মেয়ের ফ্যাকাসে ভয়াতুর মুখের দিকে লক্ষ্য করে হেসে বললেন, 'ভয় পাবার কিছু নেই, মামণি। কয়েকটা প্রশ্ন করবেন কেবল।'

একটু ধাঁধায় পড়ে গেল লেপস্কি। মেয়েটা এত ভয় পেয়ে গেছে কেন? ভয়ানক অসুস্থ দেখাচ্ছে···মনে হচ্ছে, যে কোনও মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। কেন?

পুলিশি গলাটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললে, 'বসুন, মিস ডিভন। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

মনে-মনে ভাবলে, এই সেই মেয়ে, যার সর্বক্ষণ চশমা

পরে থাকার কথা, অথচ ব্যাঙ্কে কাজ করতে এসেও চশমা পরে না! বোঝ ব্যাপার!

'এই লোকটাকে দেখেছেন কখনও?' অ্যাল্‌জার-এর একটা ফোটো ইরার হাতে তুলে দিলে লেপ্‌স্কি।

'হ্যাঁ! মিঃ ফরেস্টার।'

'ব্যাঙ্কে কত ঘন ঘন আসতেন এই ভদ্রলোক?' কথা বলতে বলতে ছবিটা ব্যাগে রেখে একটা নোটবই বার করলে লেপ্‌স্কি!

'রোজই।'

'সিন্দুক খোলবার সময়ে ওঁর সঙ্গে যেতেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'সিন্দুকের ভেতরে কী আছে, দেখবার সুযোগ পেয়েছেন কখনও?'

'না। প্রথম চাবিটা খুলে দেবার পর আর থাকি না।'

'সিন্দুকে কী রাখেন, বা সিন্দুক থেকে কী তোলেন, সে সম্বন্ধে কোনও আভাস পেয়েছেন ওঁর কথাবার্তা থেকে?'

'না।'

জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এবং উত্তর, দুইই নোটবুকে লিখে রাখছিল লেপ্‌স্কি। লিখতে-লিখতে হঠাৎ একটা মতলব এল। দেখা যাক লাগে কি না!

'এ মাসের নউই তারিখে রিজেন্ট হোটেল থেকে কোথায় জানি চলে গেছেন উনি। নতুন ঠিকানার কথা আপনাকে কিছু বলেননি?'

'না।'

'কোনও বন্ধু-বান্ধবের নাম করতেন কখনও ?'

'না।'

এইবার তুরুপের তাস ফেলল লেপ্‌স্কি।

'মায়ামির ডক্টর ওয়াইড্‌ম্যান বলে কারও নাম করেছেন আপনার কাছে কোনও দিন ?'

'না।'

'ডক্টর ওয়াইড্‌ম্যানকে কি আপনি চেনেন, মিস ডিভন ?'

সিঁটিয়ে উঠল ইরা। লেপ্‌স্কির দিকে তাকিয়ে দেখলে। নির্বিকার মুখে ঘাড় নিচু করে লিখে যাচ্ছে সে।

'না, চিনি না!'

বোঝ ব্যাপার! মনে-মনে ভাবলে লেপ্‌স্কি। ওয়াইড্‌-ম্যান-এর ফাইলে নোরিনা ডিভনের নাম রয়েছে; চোখ দেখে চশমা দিয়েছেন, অথচ মেয়ে বলে কিনা তাঁর নামটাও শোনেনি। ব্যাপারটা কী ?

মাথা ঠাণ্ডা রেখে এগোতে হবে। গুলিয়ে ফেললে চলবে না। মেল ডিভন যে ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, সেটা টের পেয়েছে লেপ্‌স্কি।

'মিঃ ফরেস্টার যখনই ব্যাঙ্কে আসতেন, সঙ্গে ব্রীফ কেস থাকত ?'

'হ্যাঁ।'

'ব্রীফ কেসে কী থাকত, সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা করতে পারেন না তো ?'

'না।'

আরও কিছুক্ষণ লিখলে লেপ্‌স্কি, তারপর মুখ তুলে হাসলে।

'ব্যাস, হয়ে গেছে, মিস ডিভন। একবার পড়ে বরং দেখে নিন, কিছু ভুল লেখা হলো কি না। ঠিক থাকলে, একটা সই করে দেবেন তলায়?' নোটবইটা ইরার দিকে বাড়িয়ে ধরল। ইতস্ততঃ করে, নিলে ইরা।

'কী ব্যাপার বলুন তো?' মেল ডিভন-এর গলাটা একটু চড়া শোনাল। 'নোরিনা তো স্বীকারোক্তি বা বিবৃতি দেয়নি, তা হলে সুধু-সুধু সই করতে যাবে কেন?'

অমায়িক হাসল লেপ্‌স্কি।

'নতুন পুলিশি নিয়ম, মিঃ ডিভন। তেমন কিছু নয়। রেকর্ডটা পাকা করে রাখা আর কি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইরার দিকে ফিরলেন ডিভন। হেসে তাকে অভয় দিলেন। 'তা হলে পড়ে দেখে সইটা করেই দাও।'

খুদে-খুদে পরিচ্ছন্ন লেখাগুলো পড়তে লাগল ইরা। মনের মধ্যে কোথায় একটা বিপদের ঘণ্টা বাজছে, শুনতে পেলে। একটা কালো জাল একটু একটু করে চারিদিক থেকে গুটিয়ে আসছে, বুঝতে পারলে, কিন্তু কিসের বিপদ, তার হদিস পেলে না।

'হ্যাঁ, ঠিকই আছে।' লেপ্‌স্কির বল-পয়েন্ট কলমটা দিয়ে পাতার তলায় সই করে দিলে ইরা।

উঠে দাঁড়িয়ে নোট বইটা ফেরৎ নিলে লেপ্‌স্কি। ইরাকে ধন্যবাদ দিলে।

মেয়েটার চোখে বিলকুল কোনও গোলমাল নেই। তার মানে কী?

'ও হো, আর একটা প্রশ্ন, মিস ডিভন। ইরা মার্শ বলে কোনও মেয়ের নাম শুনেছেন?'

চেয়ারের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল ইরা। মুখখানা এত সাদা হয়ে গেল যে, মেল তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন।

'না···না···কখনও শুনিনি।'

টেবিলের ওপাশ দিয়ে ইরার কাছে এসে ব্যাগ্রকণ্ঠে ডিভন বললেন, 'নোরিনা! শরীর খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ, বাপি। ভীষণ খারাপ লাগছে। কাল রাত্তিরে খাবারের বোধ হয় কিছু গোলমাল হয়েছে—বাড়ি চলে যাব? একটু শুয়ে থাকতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

লেপ্‌স্কির দিকে চেয়ে ডিভন বললেন, 'আপনি এবার যান বরং। দেখছেন তো কী কাণ্ড হলো!'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লেপ্‌স্কি; চোখদুটো খুশিতে জ্বলজ্বল করছে।

ডিভন বললেন, 'কাউকে বলি, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিক। খুব খারাপ লাগছে। দেখ দিকিনি কী বিচ্ছিরি হলো। যাই হোক, চিন্তা কোর না···'

'মিছি-মিছি ব্যস্ত হয়ো না তো!' সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ইরা। 'কাউকে সঙ্গে দেবার দরকার নেই। একাই যেতে পারব···মরে যাব না, ভয় নেই!' ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অবাক চোখে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন ডিভন।

টুলের ওপর বসে ছিল এড্রিস। খেঁটে-খেঁটে পাদুটো শূন্যে লটপট করছে, মুখে ঘামের প্রলেপ, চঞ্চল দৃষ্টি ঘড়ির

দিকে থমকে দাঁড়াচ্ছে বার বার। দুসারি টেবিলের মাঝখানের ফালি জায়গাটা দিয়ে এগিয়ে আসছে ইরা—নিশ্চিন্ত আলস্যে, কোনও তাড়া নেই। এড্রিস-এর চোখের সামনে সেই প্রথম দিনের ছবিটা ভেসে উঠল হঠাৎ: দুর্দম, দৃঢ়সঙ্কল্পিত, ইস্পাতের মতো কঠিন, নিউ ইয়র্কের বস্তির মেয়ে, ইরা মার্শ! মুখের ঘাম মুছল এড্রিস। টেবিলের ওপর দুহাতের ভর রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ইরা, নীল চোখদুটো চকচক করছে।

ইরার এই আকস্মিক পরিবর্তনের কোনও হদিস করতে পারছে না এড্রিস, মনে মনে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছে। অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বললে, 'পেয়েছ?'

'এখন থেকে আমারই প্রশ্ন করার পালা।' দৃঢ়কণ্ঠে বলতে লাগল ইরা, 'দিদিকে তুমিই মেরেছ, তাই না?'

সারা মুখখানা বীভৎস হয়ে উঠল এড্রিস-এর। বিস্তৃত ঠোঁটের ফাঁকে ঝিকিয়ে উঠল দুপাটি দাঁত। 'তার সঙ্গে কী সম্পর্ক? মরতেই বসেছিল তোমার দিদি। একে কি খুন করা বলে? আমি শুধু এগিয়ে দিয়েছি একটু। আর, তাই নিয়ে তোমারই বা অত মাথাব্যথা কিসের? বল, পেয়েছ!'

'আত্মহত্যার স্বীকারোক্তিটা? তুমিই লিখেছিলে?'

'হ্যাঁ···কী হয়েছে তাতে? ফ্ল্যাটে আর যেসব চিঠিপত্র পেয়েছিল পুলিশ, সেগুলোও আমার লেখা, তাই হাতের লেখা মিলে গিয়েছিল। তাতে হয়েছেটা কী? টাকাটা পেয়েছ কি না বল না ছাই!'

'দিদির মনের মানুষটিকেও তুমিই খুন করেছ। তাই না?'

'আঃ, বাজে কথা ছাড় তো! তা হলে শোন, ওকে খুন

করেছিল ফিল। এমনি করে না-সাজালে চলত না। 'এ দুজনকে সরানো নেহাৎ-ই দরকার হয়ে পড়েছিল।' টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে বসল এড্রিস। 'টাকাটা পেয়েছ?'

'পেয়েছি। ব্যাঙ্কে একজন পুলিশ এসেছে। ইরা মার্শ বলে কাউকে চিনি কি না, জিগ্যেস করল আমায়।'

এড্রিস-এর চোয়ালটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়ল।

খুব নরম শান্ত মেজাজে বলে গেল ইরা, 'হ্যাঁ, পুঁচকেবাবু! বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই, আর দেরি নেই। তোমার সঙ্গে কী করে এ কাজে হাত দিতে রাজি হয়েছিলুম, ভাবলে অবাক লাগে! পাগালামি, বিরাট পাগলামি!···ওরা সব টের পেয়ে গেছে। আর কয়েক ঘণ্টা···তার বেশি নয়।'

টুল থেকে হড়কে নেমে পড়ল এড্রিস।

'টাকাটা দাও! তুমিও চলে এস আমার সঙ্গে। তোমাতে আমাতে একসঙ্গে সটকাতে পারব! এখনও সুযোগ আছে। এস, চলে এস···টাকাটা দাও।'

'সিন্দুকেই ভরে রেখেছি আবার। আর কেন বিপদ বাড়াই? বিদায়, টিকি। আর দেরি নাই। জেলখানায় দেখা হবে আবার।' ঘুরে দাঁড়িয়ে কাফের বাইরে ঝকঝকে রদ্দুরে এসে দাঁড়াল ইরা।

ভাড়া-করা ফোর্ড গাড়িতে স্টিয়ারিং-এ আলতো করে হাত রেখে চুপচাপ বসে ছিল হেস ফার। অবাক হয়ে ইরাকে কাফে থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল।

এক ঘণ্টা হলো গাড়িতে বসে বসে লক্ষ্য রাখছে সে। টিকি এড্রিসকে আসতে দেখেছে। ইরাকে প্রথমবার কাফেতে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসতে দেখেছে। বড় হতাশ্বাস আর নিঃস্ব দেখাচ্ছিল ইরাকে তখন। ইরা ব্যাঙ্কে গিয়ে ঢুকল, তাও দেখেছে।

ভেবেছিল, এড্রিসও বেরিয়ে আসবে, কিন্তু এল না। কিছু বুঝতে পারেনি ফার। অ্যাল্‌জার-এর বদলে এড্রিস কেন? খবরের কাগজ দেখবার কথা মনে হয়নি। খবরের কাগজ কোনও দিনই পড়ে না: কিছুই পড়ে না হেন্স ফার।

সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বসে আবার অপেক্ষা করতে লাগল ফার। পৌনে দু ঘণ্টা কেটে গেল, ভয় করতে লাগল একটু-একটু। এতক্ষণ এক জায়গায় গাড়ি পার্ক করা দেখলে পুলিশ এসে খোঁজ নিতে পারে, তা হলেই চিত্তির। কাজেই, জায়গা বদল করাই শ্রেয়। সেই মুহূর্তে ইরাকে আবার ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল। কাফেতে গিয়ে ঢুকল। ইরাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে এখন। নিউ ইয়র্কের সেই পুরানো ইরা ফিরে এসেছে যেন! ওই চলন···দৃপ্ত, কঠিন ভঙ্গী···টান টান উদ্ধত ভাব! নিশ্চয়ই গার্ল্যাণ্ড-এর টাকাটা বাগিয়েছে। গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে রাখল ফার। কাফেতে মিনিট দুয়েক রইল ইরা। তারপর হন্তদন্ত হয়ে ব্যাঙ্কের পিছনের গাড়ি রাখবার জায়গাটার দিকে চলে গেল। তারপরই খুট খুট করে কাফে থেকে বেড়িয়ে এল টিকি এড্রিস।

ব্যাপার কী? এড্রিস গাড়িতে চড়ে দরজা বন্ধ করতেই,

ফোর্ডটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল ফার। এড্রিস-এর মিনি সীকস্ব-এর দিকে চলতে লাগল। ফার অনুসরণ করলে।

গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ইতস্তত: করছিল লেপ্‌স্কি। একটা ব্যাপারে ফয়শালা না-করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছে না। বেয়ে-চেয়ে দেখবে? যদি না-মেলে, চীফ রেগে যাবেন; যদি মেলে… !

হঠাৎ মন ঠিক করে ফেললে। চট করে গাড়িতে চেপে বসে বড় রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। হাইওয়ে 4A-তে গিয়ে পড়ল সোজা।

হাইওয়ের রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার ভীড় কম। হাতঘড়ির দিকে তাকালে লেপ্‌স্কি। দশটা বত্রিশ। সাড়ে-এগারটায় হেড্‌কোয়ার্টার-এ ফেরবার কথা। তাড়াতাড়ি করা দরকার।

একজন পেট্রল অফিসারকে দেখতে পেল হাইওয়ের ধারে—মোটর সাইকেলে বসে-বসে চলন্ত গাড়ির দিকে লক্ষ্য রাখছে। তারই পাশ ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল লেপ্‌স্কি।

ব্যাগ্রকণ্ঠে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'এই, টিম, ভয়ানক জরুরি ব্যাপার। রাস্তাটা একটু ফাঁকা করে দিতে পারবে, যাতে হু হু করে বেরিয়ে যেতে পারি? মায়ামির গ্র্যাহাম কো-এড স্কুলে যেতে হবে। কাঁটায় কাঁটায় তিরিশ মিনিটের ভেতর পৌঁছনো চাই!'

মোটর বাইকে স্টার্ট দিতে দিতে মুচকি হাসল পেট্রল

অফিসার। 'হবে না। সাড়ে-আটত্রিশ মিনিটে হতে পারে, যদি আমার সঙ্গে সমান তালে চালাতে পার।'

ঘাড় নাড়ল লেপ্স্কি। মোটর বাইকটাকে সামনে এগিয়ে যেতে দিলে। তারপর গাড়ি চালালে তার পিছু-পিছু। মোটর বাইকের সাইরেন বেজে উঠল তারস্বরে। সমস্ত গাড়ি ডান দিকে সরে গিয়ে পথটাকে ফাঁকা করে দিলে। মোটর বাইকের গতিবেগ বেড়ে উঠল।

অ্যাক্সিলেটরের ওপর পা দাবাতে দাবাতে লেপ্স্কি ভাবতে লাগল, হাইওয়ে দিয়ে এই যে, ১২৪ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছে সে এখন, চীফ জানতে পারলে আর রক্ষে থাকত না।

চাকার তলায় রাস্তাটা যেন গলে-গলে মিলিয়ে যাচ্ছে। আশপাশের গাড়িগুলোকে যখন হুস করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, তখন খানিকটা ছাই রঙের তুলির পোঁচ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। একটু ঝুঁকে বসল লেপ্স্কি। হাতদুটো স্টিয়ারিং-এর ওপর চেপে-ধরা, চোখদুটো পেট্রল অফিসারের মোটর বাইকের পিছনে স্থিরনিবদ্ধ। পঞ্চাশ গজের ব্যবধান রেখে চলেছে। গতিবেগের কাঁটা এখন ১৩০-এর ঘরে।

কুড়ি মিনিট পরে হাইওয়ের শেষ বরাবর এসে হাত তুলল পেট্রল অফিসার—গতিবেগ কমাতে বলছে। মায়ামির শহরতলিতে যখন পৌঁছল, তখন গতিবেগ ৭০ মাইল।

আরও ষোল মিনিট পরে গ্র্যাহাম কো-এড স্কুলের চত্বরে ঢুকল নেহাৎ স্বাভাবিক মন্থরতায়।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল লেপ্স্কি। পাদুটো কাঁপছে, তবু পেট্রল অফিসারের দিকে চেয়ে একটু হাসল। 'চমৎকার

টম। আবার আছে। কাজ শেষ হলেই, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে আবার।'

'ঠিক আছে। ফেরবার সময়ে আরও কয়েক মিনিট কমে সারা যাবে। গাড়ির ভিড় কম থাকবে তখন।'

দরজার বেল বাজাল লেপ্‌স্কি। দরজা খুললেন স্বয়ং ডক্টর গ্র্যাহাম।

লেপ্‌স্কি বললে, 'মর্নিং, স্যার। প্যারাডাইস সিটি পুলিশ থেকে আসছি। একটু সাহায্য দরকার। ভেতরে আসব?'

ঘাড় নেড়ে পথ দিলেন গ্র্যাহাম। বসবার ঘরের দিকে যেতে-যেতে বললেন, 'আশা করি বেশিক্ষণ লাগবে না, কারণ একটু জরুরি কাজে বসবার আছে।'

চেয়ারে বসতে বসতে লেপ্‌স্কি বললে, 'বেশি ক্ষণ লাগবার কথা নয়, ডক্টর গ্র্যাহাম। আপনাদের একজন ছাত্রী, নোরিনা ডিভন সম্পর্কে কিছু খবর জানতে এসেছি।'

'ও তো স্কুল ছেড়ে গেছে···'

'জানি। সুধু একটা কথা বলুন তো, ও কি চশমা পরতো? পরতো, না?'

'হ্যাঁ, পরতো।'

'বিনা-চশমায় পড়তে পারতো?'

'একদম না। সব সময়ে পরে থাকতে হতো। কিন্তু, ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে···'

'চশমার ফ্রেমটা কি নীল রঙের প্ল্যাস্টিকের?'

'দেখুন···আপনি বলতে মনে পড়ছে, নীলই বটে···তবে

প্ল্যাস্টিক কি না বলতে পারব না। কিন্তু, কেন জানতে চাইছেন বলুন তো?'

গম্ভীরস্বরে লেপ্‌স্কি বললে, 'কোরাল কোভ-এ যে মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সেটা নোরিনার বলেই সন্দেহ করছি আমরা।'

'সে কী! কী সর্বনাশ। কিন্তু কী করে বুঝছেন যে…'

'আমাকেই প্রশ্ন করতে দিন ডক্টর গ্র্যাহাম।' অ্যাল্‌-জার-এর ফোটোটা বার করলে লেপ্‌স্কি। 'একে দেখেছেন কখনও?'

'নিশ্চয়ই। ইনি হলেন মিঃ টেবেল, নোরিনার মায়ের অ্যাটর্নি।'

'নোরিনা ডিভন-এর কোনও ছবি আছে আপনার কাছে?'

'তা আছে বই কি। গ্রুপ ফোটো আছে, প্রত্যেক বার বছরের শেষে একবার করে তোলা হয়।' উঠে গিয়ে আলমারি খুলে ফাইল ঘেঁটে একটা ফোটো বার করে নিলেন।

ফিরে এসে তুলে দিলেন লেপ্‌স্কির হাতে।

১০

ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে সীকম্ব-এর দিকে গাড়ি চালাতে লাগল এড্রিস। নিজের বিপদের ভাবনায় এমনই বিব্রত যে পিছনের ফোর্ড গাড়িটার কথা খেয়ালেই এল না।

এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলে না এখন। ইতিমধ্যেই পুলিশ হয়তো তার খোঁজ করতে শুরু করে দিয়েছে। জানাশোনা লোক তারও আছে, বললে, মেক্সিকো যাবার ব্যবস্থা করে দেবে।

সীকম্ব-এর কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ একটা গলির মধ্যে বাঁক নিল এড্রিস। রাস্তাটা জাহাজ-ঘাটের দিকে গেছে।

হতভম্ব হয়ে জোরে ব্রেক কষতে হলো ফারকে। ততক্ষণে মোড়টা পেরিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে গলির মুখে গিয়ে দেখলে, এড্রিস-এর গাড়ি আবার ডান দিকে মোড় নিচ্ছে। গাড়ির কাছে ফিরে এসে এবার ধীরে-ধীরে চালাতে লাগল ফার, গলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

যেখানে গাড়ি রাখল এড্রিস, তার পাশেই একটা নোংরা বার, গভীর সমুদ্রের মাছধরা জাহাজের মাঝি-মাল্লাদের আড্ডাখানা। ভিতরে ঢুকল এড্রিস।

খানিক বাদে যখন বেরিয়ে এল, তখন তার পকেটে একটা সাইলেন্সারওলা বন্দুক, মনে অনেকখানি নিশ্চিন্ততা—মেক্সিকো পালাবার বন্দোবস্ত পাকা করে এসেছে।

গাড়িতে উঠে বসে মোড়ক খুলে '৩৮ অটোম্যাটিকটা একবার দেখে নিলে। সাইলেন্সারটা পেঁচিয়ে লাগিয়ে নিলে নলের মুখে, পাশে সীটের ওপর রেখে দিলে বন্দুকটা। টুপিটা চাপা দিলে। স্টার্ট দিয়ে বাসার দিকে এগিয়ে চলল।

একটু তফাতে এগোতে লাগল হেস ফার।

বাসার সামনে পৌঁছে গাড়ির চাবিটা আর খুললে না, টুপিসুদ্ধ রিভলভারটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে যখন দাঁড়াল, তখন হাত-ঘড়িতে এগারোটা-তেতাল্লিশ। সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরের ঘরে ঢুকল এড্রিস।

'ফিল ?'

টুপিটা চেয়ারে ফেলে দিয়ে বন্দুকটা কোমরের পিছনে আড়াল করে বাগিয়ে রাখলে, বাঁ হাতে সদ্যকেনা সেদিনের খবরের কাগজখানা। এগিয়ে গেল এড্রিস।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল অ্যাল্‌জার। হাতে এড্রিস-এর '২৫ বন্দুকটা, চোখে ক্লান্তি, মুখটা উৎকণ্ঠায় থমথমে। এড্রিস-এর দিকে বন্দুক তুলে ধরলে অ্যাল্‌জার।

'টাকাটা পেলে ? বেশি কাছে এগিয়ো না।'

ঘাড় কাৎ করে সহজস্বরে এড্রিস বললে, 'কী হলো হঠাৎ ?' কোমরের পিছনে বুড়ো আঙুল দিয়ে বন্দুকের সেফটি ক্যাচটা খুলে রাখলে।

'তোকে বিশ্বাস নেই, হারামজাদা। টাকা যোগাড় হয়েছে ?'

'হয়েছে বৈ কি, আজকের একখানা কাগজও জোগাড়

হয়েছে সেইসঙ্গে। সামনের পাতায় কেমন সুন্দর একটা ফোটো ছেপেছে তোমার, অ্যালজার-চন্দর।' কাগজখানা অ্যাল্‌জার-এর পায়ের সামনে ছুঁড়ে দিলে এড্রিস। সামনের পাতাখানা খোলা অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে রইল।

আচমকা বে-খেয়াল হয়ে গেল অ্যাল্‌জার, ঘাড় নিচু করে ছবিখানা দেখে গালাগাল দিয়ে উঠল। এরপর আর কোনও শব্দ ওর গলা দিয়ে বেরোয়নি। '৩৮ অটোম্যাটিক তুলে ওর মাথায় গুলি করেছে এড্রিস।

হাঁটু ছমড়ে মেঝেয় পড়ে যাচ্ছে অ্যাল্‌জার। বুকে আর একবার গুলি করল এড্রিস।

হাত-পা ছড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল অ্যাল্‌জার, মুখের পাশ থেকে রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। একবার হাতটা তোলবার চেষ্টা করলে, তারপর মুখাখানা হাঁ হয়ে গেল।

লম্বা করে নিঃশ্বাস টানলে এড্রিস। সাইলেন্সার-এর নলটা খুলে পকেটে ভরলে। অ্যাল্‌জার-এর দিকে আর তাকালে না, শোবার ঘরে ঢুকে বেঁধে-রাখা হোল্ড-অলটা বার করে আনলে।

তারপর অ্যাল্‌জার-এর বখরার টাকাটার খোঁজ করতে লাগল এখানে-ওখানে। মিনিট দশেক বাদে একটা ছবির পিছন থেকে টেনে বার করলে নোটের গোছাটা। গুনে দেখলে, মাত্র ষোল হাজার পড়ে আছে। অ্যাল্‌জার-এর মৃতদেহটার দিকে চেয়ে মুখ ক্যাঁচকালে এড্রিস। বিকৃত মুখখানার চারিপাশে গাঢ় লাল রক্তের একটা বৃত্ত তৈরি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

প্যাণ্টের পিছনের পকেটে টাকাটা গুঁজে রাখলে। নিজের বখরার টাকাটা খামসুদ্ধ কোটের ভিতরের পকেটে ভরে নিলে। দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাটের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ লাগল—ছেড়ে যেতে হবে। হোল্ড-অল তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা খুলল এড্রিস। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে হেস ফার, হাতে উদ্যত রিভলভার।

চোখদুটো একবার সজোরে বন্ধ করলে এড্রিস। আবার তাকালে। হৃদ্‌স্পন্দনটা একবার বন্ধ হয়ে গিয়েই আবার উদ্দাম গতিতে ছুটে চলতে লাগল।

'ঘরে ঢোক।' জানোয়ারের গর্জনের মতো শোনাল হেস ফার-এর গলাটা।

নিদারুণ হতাশ্বাসে পিছন ফিরে বাইরের ঘরে ঢুকল এসে এড্রিস। পিছন-পিছন এসে লাথি মেরে দরজার পাল্লাটা বন্ধ করে দিলে হেস ফার। অ্যাল্‌জার-এর লাশটা দেখে সিঁটিয়ে গেল। এমন অনাড়ম্বর প্রকট মৃত্যু আগে কখনও দেখেনি সে। ভিতরে-ভিতরে শীত করে উঠল তার।

'থলেটা রাখ। পেছন ফিরে দাঁড়াও। মাথার ওপর হাত তোল।'

'একটা কথা বলছি…' ফ্যাকাসে মুখে জোর করে হাসি আনবার চেষ্টা করে বলবার চেষ্টা করলে এড্রিস।

'যা বলছি, কর শুয়ারকা বাচ্চা!' বন্দুক নেড়ে শাসিয়ে উঠল হেস ফার।

উদ্গত কান্নার বেগটা রুখতে প্রাণপণে ঢোক গিললে এড্রিস। থলেটা ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। হাতদুটো মাথার ওপর পুরো তোলেনি তখনও, দু'পা এগিয়ে এসে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথার পিছন দিকে সজোরে আঘাত করলে ফার।

হেড্কোয়ার্টারে ফিরে ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে টেরেল আর বেগ্লার-এর মুখের অবস্থা দেখে ভারি মজা লাগছিল লেপ্স্কির।

শেষের দিকে বলতে-বলতে বাহাদুরির গর্বটা আর গোপন রাখতে পারেনি, ডগ্মগে হয়ে উঠেছে একটু—'আর, এই হলো নোরিনা ডিভন-এর আসল ছবি, চীফ। স্কুল থেকে এনেছি।'

টেরেল আর বেগ্লার হুমড়ি খেয়ে পড়লেন গ্রুপ ফোটোটার ওপর।

লেপ্স্কি বললে, 'বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়···পেছনের সারি।'

চশমা-পরা মেয়েটির ছবির দিকে তাকিয়ে টেরেল বলে উঠলেন, 'খুব এলেম দেখিয়েছ, টম।— কিন্তু, মিঃ ডিভন যাকে মেয়ে বলে ঘরে তুললেন, সে কে তা হলে?'

বেগ্লার বলে উঠল, 'ইরা মার্শ, মিউরিয়েল-এর বোন। নিউ ইয়র্ক পুলিশের রিপোর্ট পেয়েছি এইমাত্র। ইরা মার্শ ১৬ তারিখে নিউ ইয়র্ক ছেড়েছে। তারপর থেকে বেপাত্তা। মিলে যাচ্ছে, চীফ।'

'কিন্তু, কেন?' ভুরু কুঁচকে বেগ্লার-এর দিকে তাকালেন

টেরেল। 'একটা ভীষণ রকমের খটকা থেকে যাচ্ছে এই-খানটায়। নোরিনার বদলে ইরাকে এনে বসাবার দরকারটা কী? কোন উদ্দেশ্যে এটা করল এড্রিস?'

'ইরাই বলতে পারবে। ওকেই ধরা যাক আগে।'

'তাড়াহুড়ো কোর না। মিঃ ডিভন-এর সঙ্গে আগে একবার কথা বলে নিই।' ভুরু কোঁচকালেন টেরেল। 'ওই বামনটা—এড্রিস, মিউরিয়েল-এর শোবার ঘরে ইরার ফোটোটা ও-ই সাজিয়ে রেখেছিল নিশ্চয়ই। ডক্টর গ্র্যাহাম-এর কাছে অ্যাল্‌জারকে পাঠানোটাও ওরই ফিকির।' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন টেরেল, 'এড্রিস-এর খোঁজ কর, জো আগে এড্রিসকে ধর!'

বেগ্‌লার বললে, 'ও তো এখন নিউ ইয়র্কে আছে বলে, খবর পেয়েছি।'

'নিউ ইয়র্ক পুলিশকে খবর দাও। ধোঁকাও হতে পারে, মনে রেখ। কাজেই, প্যারাডাইস সিটিতে যে নেই, জোর করে বলা যায় না। ওর বাসায় একবার খোঁজ নিয়ে দেখ, জো!'

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল বেগ্‌লার।

'টম, এয়ারপোর্টের সবাইকে সতর্ক করে দাও। রাস্তা আটক করে তল্লাশির ব্যবস্থা কর। ওর চেহারাটাই কাল হবে, চোখে ধুলো দিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না। তবু, সাবধানের মার নেই।' উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে গ্রুপ ফোটোটা তুলে নিলেন টেরেল। 'আমি ডিভন-এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল টম লেপ্‌স্কি। মনে মনে

বলতে লাগল, 'এবারেও যদি প্রমোশান না-পাস রে বাচ্চু, জীবনে আর পাবি না।'

লিফ্‌টে চড়ে সোজা নেমে এল হেস ফার। টাকাটা গুণে দেখবার জন্যেও দাঁড়ায়নি। তবে আন্দাজে বুঝতে পেরেছে যা আশা করেছিল, তার চেয়ে বেশিই হবে। ফ্লরিড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়া দরকার—যত তাড়াতাড়ি হয়। ফার্নাণ্ডিয়া-তে গাড়ি রেখে ট্রেনে অ্যাট্‌ল্যাণ্টা চলে যাবে। সেখানে ঘাপটি মেরে দেখবে, হাওয়া কোন্ দিকে বইছে। টাকা সঙ্গে থাকলে কুছ পরওয়া নেই।

উচিত শাস্তিই হয়েছে বামন-ব্যাটার। ইরার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তার বদলা নেওয়া গেল।

ইরার কী হবে? একবার মনে হলো, সন্ধান নেয়। একা-একা এতদূর পাড়ি দেওয়ার চেয়ে, ইরা পাশে থাকলে জমত ভালো। না। না-নেওয়াই ভালো। কবে হয়তো পুলিশে জানাজানি হয়ে যাবে, তখন ইরার সঙ্গে সে নিজেও গাড্ডায় পড়ে যাবে। না। একাই ভালো। অ্যাট্‌ল্যাণ্টায় গিয়ে দেখে-শুনে একটা মেয়ে জোটানো আর শক্ত কী!

মায়ামির দিকে গাড়ি হাঁকাতে লাগল ফার। রাস্তায় বড্ড বেশি গাড়ি। সীকম্ব থেকে বেরুবার রাস্তায় গাড়ি চালাতে হচ্ছে টিকিয়ে টিকিয়ে। সামনে আবার একটা জ্যাম হয়ে রয়েছে। গাড়ির গতি কমাতে-কমাতে ভেবে দেখলে, পুলিশে খবর দিতে সাহস পাবে না এড্রিস। অ্যাল্‌জার খুন হয়ে পড়ে

আছে তার বাসায়। ইরাও জানে না, ফার-এর কাছে এত টাকা! চমৎকার!

সামনের গাড়িগুলো এবার বেশ জোরেই চলতে শুরু করেছে। গীয়ার বদলে অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিলে ফার। একটু দূরে সামনে ট্র্যাফিক লাইট দেখা যাচ্ছে। লাল হবার আগে পার হওয়া যাবে কি না, কে জানে। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? সামনের গাড়িটা হঠাৎ সাঁ করে লাইট পার হয়ে এগিয়ে গেল। এই তো সুযোগ। অ্যাক্সিলেটরে আরও জোরে পায়ের চাপ দিলে ফার। ঠিক সেই মুহূর্তে—মাত্র পাঁচ গজ থাকতে—সিগন্যালে লাল আলো জ্বলে উঠল।

দাঁত কিড়মিড় করে সজোরে ব্রেক চাপলে ফার। ক্যাঁচ করে খানিকটা হড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা—সাদা দাগের গজখানেক ওদিকে। ব্যাক করে পিছিয়ে আসতে গেল, কিন্তু তার আগেই আচমকা একটা মারাত্মক ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্টিয়ারিং-এর ওপর—পিছনের গাড়িটা সজোরে ধাক্কা মেরেছে তার ফোর্ডের বাম্পারে।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পিছন ফিরে তাকাল ফার। কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেল, পিছনের গাড়ির চালকের আসন থেকে মোটা মতোন বয়স্ক এক ভদ্রলোক দরজা খুলে রাস্তায় নামছেন। দেখতে-দেখতে, কানে গেল একটা শব্দ··· বড় ভয়-জাগানো, বুক-কাঁপানো শব্দ··· পুলিশের হুইস্‌ল।

বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ডটা লাফ দিয়ে উঠল হঠাৎ। খুপরির মধ্যে লুকিয়ে রাখবে বলে চটপট বন্দুকটা বার করতে গেল প্যান্টের পিছনের পকেট থেকে, কিন্তু খুপরি পর্যন্ত হাত

পৌঁছবার আগেই ভারী কর্কশ গলায় আওয়াজ এল, 'যেমন আছ, থাক। নড়াচড়া কোর না!'

মুখ তুলে চাইলে ফার। ওপাশের জানলা দিয়ে টকটকে লাল একটা গোব্দা মুখ দেখা যাচ্ছে। পুলিশটা কখন এসেছে, টেরই পায়নি সে। হাতের পিস্তলটা তার ফার-এর দিকেই তাগ-করা।

'রিভলভারটা ফেলে দাও।' গর্জে উঠল পুলিশ সার্জেণ্ট। 'এক্ষুনি।'

প্রচণ্ড ক্রোধে আর নিঃসীম ক্ষোভে গজগজ করতে করতে বন্দুকটা সীটের ওপর ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলল ফার।

এক ঝটকায় দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরলে আর একজন পুলিশ, হিঁচড়ে গাড়ি থেকে নামালে। গাড়ির হর্নের শব্দে কানে তালা ধরে যাচ্ছে। চারদিকে উৎসুক নর-নারীর ভীড়। পুলিশের গলা শোনা গেল, 'ভালো করে নজর রাখ। হাতে বন্দুক ছিল, এইমাত্র ফেলে দিয়েছে!'

লাল-মুখো পুলিশটা মুচকি হেসে সজোরে একটা চড় কষালে ফার-এর গালে। মাথা ঘুরে টলে রাস্তায় পড়ে গেল ফার। তারপর উঠে দাঁড়াবার আগেই টের পেলে, হাতে হাতকড়া পড়ে গেছে।

হঠাৎ বুঝতে পারলে, শার্টের মধ্যে যে টাকার গোছাটা রেখেছিল, সেটা নড়ছে, সেটা চলে বেড়াচ্ছে! কী করবে ভেবে দেখবার আগেই জামার ফাঁক দিয়ে উপছে বেরিয়ে এল নোটগুলো, এলোমেলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল রাস্তাময়।

চোখ বড় বড় করে লাল-মুখো বলে উঠল, 'আরে! কাণ্ডখানা দেখ একবার! লোকটা কি টাকার গাছ না কি, নাড়া দিলেই টাকা পড়ে!'

আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকাল টিকি এড্রিস। মাথার যন্ত্রণায় একটা করুণ কাৎরানি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। চুপ করে পড়ে-পড়ে সমস্ত ব্যাপারটা মনে করবার চেষ্টা করল। একটু-একটু করে মনে পড়ল সবটা।

অনেক ক্ষণের চেষ্টায় বহু কষ্টে উঠে বসল। ছোট্ট-ছোট্ট দুটো হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে রইল চুপচাপ। আস্তে-আস্তে যন্ত্রণাটা সয়ে যেতে, হাঁটুতে ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলে। শেষ পর্যন্ত উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। টলতে-টলতে এগিয়ে গেল দু-এক পা। অ্যাল্‌জার-এর চটচটে রক্তের ওপর পড়ে বাঁ পাটা পিছলে গেল একবার। শিউরে উঠল এড্রিস। কার্পেটে ঘষে ঘষে জুতোটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলে। এগোতে চেষ্টা করলে,—আধঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে যেন আরও পঞ্চাশ বছর বয়সে বেড়ে গেছে তার। আলমারি খুলে কাঁপা হাতে হুইস্কির বোতলটা বার করলে। ছিপিটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে বোতলের মুখটা ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরলে। একটু-একটু করে অনেকখানি খেলে, একটু একটু করে তরল একটা উষ্ণ স্রোত সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, দেহে সাড় ফিরে আসতে লাগল—সচেতনভাবে সেই অনুভূতিটা টের পাবার চেষ্টা করলে।

দম নিতে নিতে বোতলটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে প্যাণ্টের পিছনের পকেটটা থাবড়ে দেখলে এড্রিস। লাভ নেই, জানত। ফাঁকা পকেটটা, টাকা নেই।

কাঁপা-কাঁপা পায়ে কলঘরে গিয়ে মাথা ধুলে, মুখ ধুলে। মনটা বোধ হয় অসাড় হয়ে গেছে। আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলে একবার। আঁৎকে উঠল। মৃত্যুপথযাত্রী একটা জরাজীর্ণ বুড়োর মতো দেখাচ্ছে।

মুখ ঘুরিয়ে বসবার ঘরে ফিরে এল এড্রিস। হুইস্কির বোতলটা তুলে নিয়ে আবার একটু-একটু করে গলায় ঢালতে লাগল। নিজের মাপসই আরাম-কেদারাটায় বসে পা-দানির ওপর পা তুলে দিতে দিতে লম্বা একটা ঢেঁকুর উঠে এল পেট গুলিয়ে।

মনে পড়ে গেল, মেক্সিকো যাওয়া আর হলো না তা হলে। টাকা নেই, টিকি-চন্দর! ডুবলে তুমি দোস্ত!—হোক, যা হবার হোক। পালিয়ে লাভ নেই। আর কোনও মতলব ছকে লাভ নেই কিছু। অনেক, অনেক গভীরে তলিয়ে গেছ ইয়ার, উঠে বেরুনো অসম্ভব।

অ্যাল্‌জার-এর প্রাণহীন দেহটার দিকে একবার তাকাল এড্রিস। ঘৃণায় কুঁচকে উঠল সারা মুখখানা।

শুদ্ধু অকম্মার ধাড়ি ওই মড়াটার জন্যে, ওই মাথামোটা শুয়োরের বাচ্চাটার জন্যে শুধু—হারামজাদাটা কুঁড়েমি করে ভালো মতোন গর্ত খুঁড়ে লাশটাকে চাপা দেয়নি বলে—শুদ্ধু এই জন্যে! ব্যস, তাইতে এমন চমৎকার দাঁওটা মাঠে মারা গেল!

আরও খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢাললে এড্রিস। এবার নেশা ধরেছে; নেশা আর নিজের জন্যে গভীর সমবেদনা। এড্রিস এবার কাঁদছে। বিকৃত মুখের কোঁচকানো চামড়া বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে, আর খেঁটে-খেঁটে হুটো হাতে আস্তে-আস্তে তাল দিয়ে যাচ্ছে।

মিনিট কুড়ি বাদে বেগ্‌লার আর ফ্রেড ঘরে ঢুকে ওই অবস্থাতাতেই দেখতে পেল তাকে। তখনও চুপচাপ বসে বসে কাঁদছে আর আপন মনে হাতে তাল দিয়ে যাচ্ছে।

যাবার সময়ে কোনও গোলমাল করলে না। লাভ কী? সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে সেই কথাই ভেবেছে এড্রিস। কিসেই বা কী লাভ আর এখন? বুদ্ধি খরচ করে মতলব করলে, ঠিকঠাক চাল দিলে—একটা বুদ্ধু এসে পণ্ড করে দিলে সব।

গাড়িতে ওঠবার সময়ে বিড়বিড় করে আপন মনে বলে উঠল একবার, 'বেশি করে ফুল ফোটাতে গেলে এমনি করেই পাপড়িগুলো ঝরে পড়ে যায়।' তারপর নেশার ঝোঁকে স্থান-কাল পাত্র সব কিছু ভুলে গিয়ে হুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল টিকি এড্রিস।

প্রিয় মেল,

তোমাকে বাবা বলে সম্বোধন করা আর শোভা পায় না আমার। পায়? কিছু নয়, কেবল বিদায় নেওয়ার জন্যে এই চিঠি, আর সেই সঙ্গে তোমায় জানানো যে, আমি ক্ষমা চাই।

বিশ্বাস করবে, এমন আশা করি না, তবু অকপটে জানিয়ে যেতে চাই, তোমার মেয়েকে খুন করা হয়েছে, এ কথা আমি জানতাম না। আমায় বলেছে, সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মরেছে সে।

জানি, তার জায়গায় নিজেকে বসানো উচিত হয়নি আমার, কিন্তু এই ক বছরের জীবনে কটা উচিত কাজই বা করা হলো! তোমার সঙ্গে থেকে এই কটা দিন অনেক সুখ পেয়েছি···অদ্ভুত এক রকমের সুখ, যা আমার কপালে সইবার নয়—বরাবরই জানতুম।

এবার আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছি। যতক্ষণ পারব, সাঁতার কেটে যাব; তারপর, এমন একটা সময় আসবে, যখন আর পারব না। এতে খানিকটা ঝামেলা তোমার কমবে—এইটুকুই সান্ত্বনা থাক আমার। কল্পনা করতে ভালো লাগছে, আমার জন্যে সামান্য একটু মন কেমন করবে তোমার! জয়-এর ব্যাপারে আমি খুব খুশি; তোমায় ও সুখী করবে, সে সুখ তোমার পাওনা।

এবার বিদায় নিই, আর একটা অনুরোধ করি: দয়া করে বিশ্বাস করতে চেষ্টা কোর যে, নোরিনার আসল কথাটা জানতে পারলে কখ্খনও এ কাজ করতাম না।

ভালোবাসা।

ইরা।

বল-পয়েন্ট কলমটা নামিয়ে চিঠিখানা আগাগোড়া পড়লে ইরা। বীচ ক্যাবিনের ঘরে চানের পোশাক পরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে।

অত্যন্ত শান্ত এবং নিরুদ্বেগচিত্তে চিঠিখানা মুড়ে একটা খামে ভরলে, তার পর ফুলদানির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলে।

ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে একবার, তারপর বাইরের ঝলমলে রোদের মধ্যে বেরিয়ে গেল।

অনেক দূরে স্নানার্থীদের ভীড় দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে। ওকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। স্বচ্ছন্দ দীর্ঘ পদক্ষেপে জলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ইরা—মাথা উঁচু করে হাঁটছে, চোখে জল নেই, ঠোঁট দুটো সঙ্কল্পে দৃঢ়বদ্ধ। জলে নামল। সাঁতার কাটতে লাগল। সবল হাতে জল ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল। একটু একটু করে সরে যেতে লাগল তীর থেকে, সরে যেতে লাগল সংসার থেকে, সরে যেতে লাগল জীবন থেকে—নোতুন-করে খুঁজে-পাওয়া-জীবন, যা কিছুতেই তার হবার নয়।